অখণ্ড সংহিতা

বা

অষ্টাদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীস্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

অষ্টাদশ খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ, ১৪১৪

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, সাক্ষা, বারাণসী-১০

(মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

ধর্ম্মার্থ শুল্ক : আশি টাকা

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২০৭৬

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২৩১০৭১০

দি মান্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

অষ্টাদশ খণ্ডের

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩৫০ সালে (ইংরাজি ১৯৪৩) "অখণ্ড-সংহিতা" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ-বাণীর পবিত্র সঙ্কলন-স্বরূপ এই মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ-কালে এই আশা নিয়াই আমরা পরম দুঃসাহসে ভর করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম যে, ইহার অন্ততঃ আটখানা খণ্ড হইলেও প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমাদের আশ্রম অযাচক, ভিক্ষা করে না, চাঁদা তোলে না, সুতরাং গ্রন্থের প্রথম আট খণ্ড পাইবার জন্য যাঁহাদের অন্তরে প্রবল আগ্রহ জাগিয়াছিল, এমন ভক্তিমান্ পাঠক-পাঠিকাবর্গের সঙ্ঘশক্তিকে সম্বল করিয়া প্রতিটি খণ্ডের দুই হাজার করিয়া পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহযোগী দুই হাজার আগ্রহী ব্যক্তির মধ্যে বন্টিত হইয়া যায়। সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষ পর হইতে উক্ত আটটী খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হয়। সম্প্রতি এই মহাগ্রন্থের সপ্তদশ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া যাইবার ফলে আজ আমরা ইহার অষ্টাদশ খণ্ডটী সর্ব্বসাধারণের হস্তে সমর্পণের সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রসূত এই উপদেশ-বাণী-সমূহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড-সমূহ যে ভাবে ভাবুক, প্রেমিক, কর্ম্মী ও মনীষীদের সমাজে সমাদৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান খণ্ডও তদ্রূপ সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

"অখণ্ড-সংহিতা" গ্রন্থখানা মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা পাইবার বারো বৎসর পূর্ব্ব হইতে হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি-রূপে আশ্রমকর্ম্মীদের দ্বারা গ্রামে গ্রামে পঠিত ও শ্রুত হইয়া আসিতেছিল, ইহা "অখণ্ড-সংহিতা"র এক বিরাট কৌলীন্য। বৃটিশের অন্নদাস পুলিশের, সর্ব্ব-সংস্কৃতিনাশক উইপোকার এবং অপ্রত্যাশিত বন্যার জল প্রভৃতির কৃপা লাভের পরেও যে এই মহাগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ সশরীরে বাঁচিয়া রহিয়াছে,—ইহা "অখণ্ড-সংহিতার" আর একটি বিস্ময়কর ইতিহাস। আমরা এই গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া হইলেও উপযুক্ত প্রকাশকের দ্বারা ইহার প্রকাশের চেষ্টায় বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, আমরা দুই হাজার বহি বিক্রয় করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও নামী প্রকাশকের সহানুভূতি পাই নাই। তৎসত্ত্বেও আজ এই বিরাট গ্রন্থের অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিল,—ইহা "অখণ্ড-সংহিতার" আর একটী গৌরবজনক অধ্যায়। প্রথম দিকের অধিকাংশ খণ্ডগুলিরই যে সময়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে, সেই সময়ে যুগপৎ অষ্টাদশ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ মুদ্রণে সমর্থ হইয়া আমরা পরম-কারুণিক পরমেশ্বরকে বারংবার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

"অখণ্ড-সংহিতা" অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ। এমন এক মহাপুরুষের ইহা উপদেশ সঙ্কলন, যাঁর ধ্যানে, ধারণায়, কর্ম্মে, চিন্তায়, আচরণে বা দৃষ্টিভঙ্গীতে সাম্প্রদায়িকতার ছায়া মাত্র নাই, যিনি বিশ্বের প্রতিটি মতবাদী ব্যক্তির প্রচারিত মতকে ও

প্রতিটি পথচারী ব্যক্তির অবলম্বিত পথকে সমান নিরপেক্ষতার সহিত দর্শন করেন। তথাপি এই গ্রন্থ তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণের নিকটে নিত্যস্বাধ্যায়ের একমাত্র অবলম্বন। এই হিসাবে গ্রন্থখানা আলাদা একটী সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াছে। যাঁহাদের স্বাধ্যায়-সেবার জন্য এই গ্রন্থের বিশেষ প্রকাশ, তাঁহারা ইহার প্রতি যোগ্য ভাবে আগ্রহী ও আসক্ত হইলে তাঁহাদের জীবন ধন্য হইবে। শত শত সহস্র সহস্র লোক কি জানি কেন আসিয়া দল বাঁধিয়া যাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছেন, দৈনিক স্বাধ্যায়ের সময়ে যদি তাঁহারা এই মহাগ্রন্থের সদ্ব্যবহার না করেন, তবে তাহার চেয়ে পরিতাপের কথা আর কি হইতে পারে?

কিন্তু অগণিত জনসাধারণ, যাঁহারা আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে কদাচ চাক্ষুষ ভাবে দর্শন করিতেও সুযোগ পান নাই, এমন সহস্র সহস্র সজ্জন ও মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশ-বাণী পাঠের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী জানিয়া আমরা এই মহাগ্রন্থের যে-কোনও একটী খণ্ড প্রথম প্রকাশের কালে প্রধান প্রধান নির্ব্বাচিত অংশ আমাদের প্রচারিত "প্রতিধ্বনি" পত্রিকাতেও পুনর্মুদ্রণ করিয়া দিয়া থাকি। ইহার ফলে প্রতি মাসে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের বহু উপদেশ-বাণী প্রায় এক লক্ষ লোক পাঠ করিবার সুযোগ পান। "প্রতিধ্বনি" প্রতিমাসে আঠারো হইতে বিশ হাজার করিয়া ছাপানো ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রতিখানা পত্রিকা মাসে পাঁচ ছয় জন করিয়া লোকে

পাঠ করিলেও, উহা দ্বারা এই সকল উপদেশ-বাণী প্রায় এক লক্ষ পাঠক-পাঠিকার নিকট নিশ্চয়ই পৌঁছে।

"অখণ্ড-সংহিতা" পাঠের প্রকল্প দ্বারা নানা স্থানে অখণ্ড-মণ্ডলী-সমূহকে চালু রাখিবারও একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। "অখণ্ড-সংহিতা" নবম খণ্ডের নিবেদন হইতে আমরা নিম্নে কতক পংক্তি এতদুপলক্ষ্যে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"১। অখণ্ড-মণ্ডলী যেখানেই গঠিত হউক, তাহার শাশ্বত-মণ্ডলেশ্বর অর্থাৎ স্থায়ী সভাপতিরূপে শ্রীশ্রীবাবামণিই বিরাজমান রহিবেন।

"২। স্থানীয় উৎসাহী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি গৃহীত হইবেন।

"৩। "অখণ্ড-মণ্ডলী" কোনও প্রকার রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনাপূর্ণ কার্য্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আত্মনিয়োগ করিবেন না।

"৪। ওঁকারই মণ্ডলীর উপাসনা-মন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ থাকিবেন এবং এই বিগ্রহকে সম্মুখে রাখিয়াই "অখণ্ড-সংহিতা" পাঠের, "সমবেত-উপাসনার" এবং "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইবে।

"৫। "অখণ্ড-মণ্ডলীর" অনুষ্ঠান-সীমায় কেহ পাদুকা নিয়া প্রবেশ করিবেন না বা তাম্বুল-চর্ব্বণ, ধূমপান প্রভৃতি করিবেন না।

"৬। সদাচার পরিরক্ষণে ও পরিবর্দ্ধনে ইচ্ছুক যে-কোনও ব্যক্তি "অখণ্ড-মণ্ডলীর" সভ্য বা কর্ম্মী বা নেতা হইতে পারিবেন। সাম্প্রদায়িক সাধনের পার্থক্যহেতু বা বিভিন্ন গুরুর উপদিষ্ট বিধায় কেহ বর্জ্জনীয় বলিয়া গণ্য হইবেন না।"

ইহার অতিরিক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির অনুমোদিত আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা অখণ্ড-মণ্ডলী সম্পর্কে লিখিতেছি যে,—

১। সাপ্তাহিক 'সমবেত-উপাসনাটীকে' অটুট ভাবে চালু রাখাই প্রত্যেক অখণ্ডমণ্ডলীর প্রধান কাজ।

২। সমবেত উপাসনার প্রারম্ভে বা শেষে কোনও সভা-সমিতি, বক্তৃতা বা বিশৃঙ্খলার ব্যবস্থা হইতে বিরত হওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

৩। সমবেত-উপাসনা-কালে প্রতিজনকে ব্যক্তিগত অহমিকা বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে, এই কথাটী প্রতিজনের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

৪। সমবেত অখণ্ড-উপাসনা, অখণ্ড-সংহিতা-পাঠ-প্রকল্প বা হরিওঁ-নগরকীর্ত্তনাদি অথবা উদয়াস্ত হরিওঁ-কীর্ত্তন, উদয়াস্ত নীরব জপ-যজ্ঞ, উদয়াস্ত ব্রহ্মগায়ত্রী গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া একমাত্র "অখণ্ড-সংহিতা" হইতেই সুনির্ব্বাচিত ও কালোপযোগী অংশ-সমূহ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৫। উপাসনার স্তোত্র-কীর্ত্তনের সুর বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা, সুরজ্ঞতা ও অসুরজ্ঞতা নিয়া বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা ও তর্ক প্রভৃতি হইতে বিরত থাকা, কে "অখণ্ড-সংহিতা" পাঠ করিবেন,

কে করিবেন না, ইহা নিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরিবেশ বিষাক্ত করা হইতে বিরত থাকা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

৬। "অখণ্ড-মণ্ডলী"র কাজকর্ম উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠাকে বৈষয়িক লাভ ও সুযোগে পরিণত করার চেষ্টা হইতে প্রত্যেককে বিরত থাকিতে হইবে।

যেমন যেমন অখণ্ড-মণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িতেছে, তেমন তেমন নানা স্থানের নানা মণ্ডলীতে নিত্য নূতন লোকের সমাবেশ-হেতু নূতন নূতন সমস্যারও সৃষ্টি হইতেছে। দেশ-বিতাড়িত ইহুদীদের মতন দেশ-বিতাড়িত বাঙ্গালীরা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নিত্য নূতন সমস্যায় পড়িতেছে এবং নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টিও করিতেছে। যাহাতে নিত্য নূতন চরিত্রের লোকদের আগমনের ফলে "অখণ্ড-মণ্ডলী" গুলির নিজস্ব মানবিক চিত্রটী যুদ্ধমান শত্রুদের শিবির-সন্নিবেশনের ফল-স্বরূপ অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি না করে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন আজ অনুভূত হইতেছে বিধায় শ্রীশ্রীবাবামণি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, যেখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে মণ্ডলীর মহনীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ রক্ষা করিয়া কাজ করা যাইবে না, সেখানে নিত্য কলহের অশান্তি হইতে বাঁচিবার জন্য যেন মণ্ডলী তুলিয়া দেওয়া হয় এবং স্থানান্তরে অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত হয়।

যে কোনও স্থানে অখণ্ডমণ্ডলী হইলে সেই মণ্ডলীকে শ্রীশ্রীবাবামণির বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তের লিখিত অনুমোদন প্রতি বৎসরই নিতে হইবে।

অখণ্ড-মণ্ডলী-আন্দোলন নিজেদের সঙ্ঘের অনুবর্ত্তী শিষ্য-শিষ্যাদের সংখ্যাবৃদ্ধির আন্দোলন নহে, পরন্তু সকল মতের সকল পথের সাধকদের সম্ভাবিত এক নিরুপদ্রব মিলন-ক্ষেত্র নির্ম্মাণের আন্দোলন। এই ধ্যানময় সদ্‌বস্তুটীর ব্যাপক আবির্ভাব সম্ভব করিবে যেই সৎসাহিত্য, তাহারই নাম "অখণ্ড-সংহিতা"। পরমেশ্বর করিলে আমরা এই মহাগ্রন্থের আরও বহু খণ্ড ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতে পারিব বলিয়া অন্তরে আশা পোষণ করিতেছি। শ্রীভগবানের পুণ্যময় নামের জয় হউক। ইতি— আষাঢ়, ১৩৮১

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট
বারাণসী-১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(অষ্টাদশ খণ্ড)

—ঃ (*) ঃ—

১৭ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(২রা জুলাই, ১৯৩৫)

ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য্য

অপরাহ্ন তিনটা চল্লিশে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সন্ধ্যা ছয়টা একুশে শিয়ালদহ (কলিকাতা) পৌঁছিলেন। একই ট্রেণ হইতে একজন ত্রিদণ্ডধারী সাধু নামিতেছিলেন। জনৈক সহযাত্রী জিজ্ঞাসা

করিল,—ত্রিদণ্ডের মানে কি? একটা দণ্ড ধারণ কর্লেই ত' চলতে পারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানে আছে বৈ কি? তোমার বা আমার একটা দণ্ডও হাতে না থাক্‌লে চল্‌তে পারে কিন্তু এই সাধুটীর তা' চলে না। কারণ, ত্রিদণ্ড একটা বিশেষ সঙ্কল্পের প্রতীক। দণ্ড শব্দের মানে এঁর কাছে সংযম। ত্রিদণ্ড-ধারণ মানে এঁর কাছে ত্রিবিধ সংযম পালন। বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ড বা সংযম ইনি পালন কর্ব্বেন ব'লে সঙ্কল্প করেছেন। হস্তধৃত দণ্ড সেই দণ্ডের বা সংযমের স্মারক। বাগ্‌দণ্ডের মানে বাক্‌সংযম, মানে ইনি দূষ্য কথোপকথন কর্ব্বেন না, নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ বাক্যালাপ বর্জ্জন কর্ব্বেন। মনোদণ্ড মানে মানসিক সংযম, অর্থাৎ ইনি অসৎ, অশুভ, অশুচি, অসুন্দর, অনৈতিক ও অনর্থক চিন্তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলবেন, শুভদ, শুচিশুদ্ধ, সুন্দর, নীতিসম্মত ও সার্থক চিন্তারই যে চর্চ্চা কর্ব্বেন, এই সৎসঙ্কল্পটী ইনি করেছেন। কায়দণ্ড মানে, শারীর কর্ম্ম-সমূহকে সংযত রেখে চলার প্রতিজ্ঞা ইনি করেছেন, স্থির করেছেন যে, এমন কাজ কর্ব্বেন না, যাতে শরীর কোন অশোভন, অনর্থকর, অশান্তিপ্রদ, নীতিবিগর্হিত, ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা সদাচার-বহির্ভূত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তে পারে। তাঁর ত্রিদণ্ড এতগুলি সৎসঙ্কল্পের প্রতীক। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, ইনি যদি নিজ সঙ্কল্পানুযায়ী চলেন, তবে শুধু এঁর নিজেরই লাভ নয়, লাভ সমগ্র সমাজের, দেশবাসী যাবতীয় নরনারীর।

শিব-পার্ব্বতী সম্পর্কে গণমানস

শিয়ালদহ ষ্টেশান হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি দক্ষিণ কলিকাতার একটী পল্লীতে আসিলেন। গৃহস্বামী তরুণ যুবক, গৃহস্বামিনী তরুণী যুবতী।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ষ্টেশান থেকে সোজা তোমাদের এখানেই সর্ব্বাগ্রে এসেছি কেন জানো? শিব-পার্ব্বতীকে দেখ্‌তে। ভারতবর্ষের গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ হচ্ছেন শিব এবং পার্ব্বতী। তাঁরা স্বভাব-ব্রহ্মচারী। একে অপরের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলেমিশে রয়েছেন, তবু তাঁদের কাম-চাঞ্চল্য নেই। তাঁরা কার্ত্তিকের ও গণেশের জনক-জননী, তাঁরা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর পিতা ও মাতা, কিন্তু কাম যেন কখনো তাঁদের স্পর্শমাত্রও করে নি, সাধক মাত্রেই তাঁদের প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকান। গ্রাম্য-ভাবাপন্ন কবিরা শিবপার্ব্বতীর সুরত-লীলা বর্ণনা ক'রে অনেক অনুষ্টুপ্ আর অনেক পয়ার লিখেছেন কিন্তু তাতে শিব-পার্ব্বতীর জীবন-মহিমার উন্নত স্তরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা যায় নি। শিবপার্ব্বতীর নাম ক'রে অনেক গুপ্ত-ধর্ম্মসম্প্রদায় নানা প্রকারের বীভৎস প্রথাকে নরনারীর মধ্যে প্রচারিত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও শিব শিবই রয়ে গেছেন, পার্ব্বতী পার্ব্বতীই রয়ে গেছেন, এদেশের মানুষ শিবকে আর পার্ব্বতীকে ইন্দ্রিয়-গ্রামের ক্রীতদাস সাধারণ দম্পতী ব'লে ধারণা কর্ত্তে সুযোগ পায় নি। তার একটী কারণ এই যে, এ দেশের সাধারণ মানুষের সুন্দর একটী শুচি মন, একথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে। কিন্তু আর

একটী কারণ এই যে, শিব এবং পার্ব্বতী আর্য্য দেবতাই হোন আর অনার্য্য দেবতাই হোন, এদেশের মানুষের মনে পূজা পাওয়া শুরু করার পূর্ব্ব থেকেই দুইটী উৎকৃষ্ট আদর্শের প্রতীক, যে আদর্শবাদ পৃথিবীর কোনও দেশের আদিম মানুষের মনে কখনো দানা বেঁধেছে ব'লে ইতিহাস বল্‌তে পারবে না। সেই আদর্শটী হচ্ছে একপরায়ণতার। শিব পার্ব্বতী ছাড়া আর কাউকে চান না, পার্ব্বতী শিব ছাড়া আর কাউকে চান নি।

রাম ও সীতার একপরায়ণতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতা সম্পর্কেও ঐ একটী কথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে। এঁদের জীবনে বহুপরায়ণতার স্থান নেই। সীতা রামচন্দ্র ছাড়া আর কাউকে কখনো কামনা করেন নি, রামচন্দ্র সীতা ছাড়া অন্য রমণীকে ক্ষণকালের জন্যও অভিনিবেশ দেন নি। এই অবস্থাটা মানুষের আদিম যুগের চিত্র নয়। অথচ পণ্ডিতেরা বল্‌ছেন যে, মহাভারতের ঘটনাবলি বরং ঐতিহাসিক ব্যাপার হ'তে পারে কিন্তু রামায়ণের ঘটনাবলির নাকি ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। রামায়ণের মধ্যে মহাভারতের ঘটনাবলির অনুল্লেখ এবং মহাভারতের মধ্যে রামায়ণের ঘটনাবলির উল্লেখ স্পষ্ট ক'রে প্রমাণিত কচ্ছে যে, রামায়ণের যুগ মহাভারতের যুগের অনেক আগেকার জিনিষ। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে একপরায়ণ দেখ্‌তে পাচ্ছি না, অর্জ্জুনকে না, ভীমকে না, এমনকি

দ্রৌপদীকেও না। বহুপরায়ণতাই আদিম যুগের স্বাভাবিক চিত্র। সে যুগে যে যত বলশালী, সে তত বহুবল্লভ। মহাভারতের যুগ এক হিসাবে ভারতের পার্থিব উন্নতির চরম অবস্থার যুগ, সেই যুগেও আদর্শ পুরুষেরা একগামী নন, বহু নারীর সন্তোষ-বিধায়ক। অথচ তার অনেক আগেকার যুগের হ'য়েও রামায়ণের আদর্শ কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই একপরায়ণতার অনুগামী। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, ভারতের মৃত্তিকার স্বাভাবিক প্রতিভা সেই অসাধারণ বস্তুটীকে জন্মদান করেছিল, যা' শুধু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একপরায়ণতা বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর একপরায়ণতা আখ্যা পেলেই নিঃশেষ হ'য়ে যায় না, যার মানে এই যে, একজন আর একজনের কাছে নিজেকে সম্যক্ সমর্পণ ক'রে দিয়ে নিজের জীবনের পরম কৃতার্থতা ও ইহপরকালের চরম চরিতার্থতা অর্জ্জন ক'রে ধন্য হয়েছে। আইনের বলে দাম্পত্য একপরায়ণতা য়ুরোপ, আমেরিকাতেও হয়েছে এবং নবজাগ্রত তুরস্কেও হচ্ছে, কিন্তু ভাবগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ভারতীয় একপরায়ণতার আদর্শের পূর্ণচন্দ্রমার কাছে তা' একটী নিষ্প্রভ জোনাকীর মতই মনে হবে।

ভারতীয় জীবনের উপরে রামায়ণের মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রামায়ণের বৃত্তান্তগুলির নাকি কোনো ঐতিহাসিক পটভূমিকাই নেই, অথচ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার

যে, সংস্কৃত-ভাষা-শাসিত আর্য্যাবর্ত্তে, দ্রাবিড়-ভাষা-প্লাবিত দক্ষিণ ভারতে, অধুনা-মুসলমান-অধ্যুষিত যাবাদ্বীপে, বলি দ্বীপে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য অনেক অঞ্চলে রাম-সীতার কাহিনী ছাড়া কাহিনী নাই, রাম সীতার গান ছাড়া গান নাই, রাম-সীতার যাত্রাভিনয় ছাড়া নাচ-গান-যাত্রা কিছুই নাই। ইণ্ডোনেশিয়ার দ্বীপ ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানগুলিতে এই ভারতবর্ষ থেকেই রাম-সীতার কাহিনী গিয়েছিল। কিন্তু এ এক পরমাশ্চর্য্য জিজ্ঞাসা যে, শ্রীরাম আর সীতা হিমালয়ের তরাই থেকে সুরু ক'রে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত এত বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাষাভাষী আর্য্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে এমন ভাবে প্রচারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'লেন কি ক'রে? তবে কি আর্য্য এবং দ্রাবিড়দের মধ্যে পরস্পর দেখাদেখি এবং মুখামুখি হবার বহু পূর্ব্ব থেকেই এই ভারতের মাটিতে রাম আর সীতার একনিষ্ঠার আদর্শটী গোড়াপত্তন ক'রে বসেছিল? রামায়ণ ভারতের আদি কাব্য হ'য়ে থাকুক, আর না থাকুক বাল্মীকি ভারতের আদি কবি হ'য়ে থাকুন আর না থাকুন, রাম আর সীতার একনিষ্ঠার আদর্শ ভারতের আর্য্য ও দ্রাবিড় উভয় সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটার অনেক আগে থেকেই এই দেশের জাতীয় সভ্যতার প্রমাণ-স্বরূপ বা এই দেশের জাতীয় প্রতিভার পরিচয়-রূপে বিদ্যমান ছিল। আর্য্য-দ্রাবিড়ে কত সংঘাত ঘটেছে কিন্তু আর্য্যভূমি ও দ্রাবিড়ভূমি উভয় ভূমিতে রাম ও সীতার সমান সমাদর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রামায়ণের কাহিনী এই উভয়বিধ নরগোষ্ঠীর

একাধারে সমান গৌরবাবহ ঐতিহ্য। রাম এবং সীতা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে, আর্য্যেরা আর দ্রাবিড়েরা দুই নয়, তারা এক এবং অভিন্ন। ভাষার বিভিন্নতায় বা আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতায় কিছুমাত্র যায় আসে না, আদর্শের দিক দিয়ে আমরা উভয়ত্রই রাম ও সীতার জীবন-দৃষ্টান্তের অনুগত। ভারতীয় জীবনের উপরে রামায়ণের মাহাত্ম্য এইখানেই সার্থক।

দাম্পত্য জীবনে সংযম অসম্ভব নয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা দুটী জীব, এক স্বামী আর এক স্ত্রী, পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমানুগত হ'য়েও যে দৈহিক উত্তেজনাকে বা মানসিক আবেগকে জয় ক'রে তোমাদের সংযম-ব্রতের বিনাশ সাধন না ক'রে থাক্‌তে পাচ্ছ, এটা এজন্যই একটা অসাধ্য ব্যাপার নয়। তোমাদের পক্ষে এই সংযমের জীবন খুবই প্রশংসনীয়, কারণ চারিদিকের শত শত দম্পতী কামাবেগের তাড়নায় মুহুর্মুহু ভোগাকৃষ্ট হ'য়ে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অকারণ বহু সন্তানের জনক-জননী হ'য়ে সংসারে দারিদ্র্যকে অবিরাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দু-এক বছর সংযম পালন করার পরেই তোমরা দেখতে পাবে যে, একে অন্যকে প্রাণ ভ'রে ভালবেসেও দৈহিক ভোগসুখের ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে পারা যায়। দাম্পত্য জীবনে সংযম-পালনকে অসম্ভব বলে তারা, যারা সংযম-পালনের জন্য কখনো উপযুক্ত চেষ্টা করে নাই। পারস্পরিক সংযম-চেষ্টার ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর

প্রতি স্ত্রীর গভীর অনুরাগ কখনো কমে না, বরং বর্দ্ধিতই হয়। দেহ যখন দেহকে সম্ভোগ করে, তখনও এক প্রকারের অনুরাগ বাড়ে এটা সত্য, কিন্তু দেহ দিয়ে দেহকে আস্বাদন না ক'রে আত্মা দিয়ে আত্মাকে আস্বাদন আরও বড় কথা, আরও বেশী সুখাস্বাদনের জনক।

বিবাহের পার্থিব উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেকটী দম্পতীকে চির-জীবন সংযম-পালন ক'রে চলতে হবে, এমন কথা ত' কেউ কাউকে বলছে না। যাঁরা এই বিষয়ে দম্পতীদের উপদেশ-পরামর্শ দেন, সেই উপদেশ যে সাময়িক ভাবে প্রতিপালিত হবে, তাঁরা এই কথা জেনেই উপদেশ দেন। কেউ এক বছর, কেউ দুই বছর, কেউ বা ততোধিক কাল দাম্পত্য সংযম পালন ক'রে তারপরে পুত্রকন্যার জনক-জননী হ'লে সেই পুত্রকন্যারা বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক কতকগুলি সম্পদ নিয়ে জগতে আবির্ভূত হয়। বিবাহের পার্থিব উদ্দেশ্য সুসন্তানের জন্মদান।

সংযম-সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয় তুমি প্রশ্ন কত্তে পার, এমন দিন কি কখনো হবে, যখন জগতের প্রত্যেকটী নরনারী বিবাহের পরই সুদীর্ঘকালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে আগ্রহী হবে? সকলে হবে, এমন আশা করা বাতুলতা। অনেকে হবে, এ আশা

কত্তে বাধা নেই। কথাটা যারা বুঝবে, তারা এ পথে আসবে। কিন্তু বিষয়টা এমন নয় যে, ঘটা ক'রে এ সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালানো যেতে পারে। সদ্ব্যক্তিরা সচ্চিন্তার শক্তিতে দিকে দিকে মানুষের মনে সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ সাধন কর্বেন এবং তার ফলে কিছু কিছু ভাগ্যবান্ দম্পতী সংযম-সাধনার পথে আকৃষ্ট হ'য়ে আসবে। জগতের একটা লোকও যদি সৎপথে চলে, তবে তারই ফলে শত শত লোক আপনা আপনি প্রভাবিত হবে এবং এভাবে ক্রমশঃ জনমত সৃষ্ট হবে। অতীত কালে জনমত সৃষ্ট হ'ত গুরুগৃহে বিদ্যার্থী বালকদের মাধ্যমে, তাদের জীবন-চর্য্যা দিয়ে, তাদের স্নাতকোত্তর জীবনে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের মধ্য দিয়ে। এখন ত' কিছু কিছু ছেলেমেয়ে স্কুলে-কলেজে ভর্ত্তি হবার অনেক আগেই যৌন কদাচারগুলি শিক্ষা ক'রে নেয়। এখন জনমত সৃষ্টির জন্য অন্য কৌশলের প্রয়োজন। সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি নিশ্চয়ই আবশ্যক। তোমার, আমার এবং আরও দশজনের ব্যক্তিগত চিন্তাধারাই আস্তে আস্তে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হ'তে হ'তে এই বিষয়ে আবশ্যকীয় জনমত সৃষ্টি ক'রে নেবে। আশা এবং ধৈর্য্য নিয়ে প্রতীক্ষা কত্তে হবে।

২৫শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৪২
(১০ই জুলাই, ১৯৩৫)

একটী অবিবাহিত বয়স্ক-যুবক কলিকাতা বেলেঘাটায় শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথা কইবার আমার সময়ের অভাব। কারণ, এখনি

আমাকে কাঁকুড়গাছিতে নূরজাহান নার্শারীতে যেতে হবে, পেয়ারার কলমের জন্য টাকা দিতে।

যুবকটী বলিল—আমি সঙ্গে যাব।

বিনামূল্যে বিতরণের ফলাফল

নূরজাহান নার্শারিতে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি তিনটী মিষ্টি আম্রড়ার চারা, তিনটী কামরাঙ্গার চারা এবং ষাটটী পেয়ারার কলমের অর্ডার দিলেন। মালগুলি রেলে মহুদা ষ্টেশানে সহকারী গুড্স ক্লার্ক শ্রীদোলগোবিন্দ রায়ের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং তিনি লোকমারফৎ পুপুন্‌কী আশ্রমে খবর দিলে তবে আশ্রম-কর্ম্মীরা কলমের বাক্‌স মহুদার দোলগোবিন্দ বাবুর বাড়ী হইতে নিয়া যাইবেন।

নার্শারীর মালিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি ব্যবসায়ের জন্য কলম নিচ্ছেন?

—কিসের ব্যবসায়?

—কলমের বা ফলের?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিচ্ছি প্রকৃত প্রস্তাবে দানের জন্য। তবে আদত কলমগুলি কাউকে দান কর্ব্ব না, এই কলমে যখন ফল হবে, তারপর থেকে অসংখ্য কলম বাঁধব আর চারদিকের লোককে বিনামূল্যে বিতরণ কর্ব্ব। বিনামূল্যে বিতরণ কর্লে সেই বিতরণে খুব সুফল কিছু হয় না। কিন্তু মানভূম দেশটার প্রকৃতিই এমন যে, ওখানে পয়সা দিয়ে ফলের কলম কেনার লোক পাওয়া ভার হবে। সুতরাং ব্যবসা করার বুদ্ধিকে মনের কোণেও ঠাঁই দিতে চাই নে।

নার্শারীর মালিক বলিলেন,—আপনার বাগানে কলম তৈরী করারও ত' একটা খরচ নিশ্চয়ই আছে। অন্ততঃ সেই খরচাটাও নেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নেওয়া যে উচিত, তা' আমিও বুঝি। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্ম্মপুস্তক এত সস্তা দরে বিক্রী করেন যে, তাতে ছাপা-খরচ ত' দূরেরই কথা, কাগজের দামটাও ওঠে না। তবু একটা দাম তাঁরা ধরেন এই জন্য যে, পয়সা দিয়ে জিনিষটা কিনলে সঙ্গে সঙ্গে তার অপব্যবহার কত্তে পার্ব্বে না। কিন্তু মানভূম বড় কঠিন দেশ। লোকের ঘরে গাছ পুঁতে দিয়ে আসার পরে যদি মাসে মাসে গৃহস্থকে দু-একটী ক'রে টাকা দেওয়া না হয়, তা' হ'লে সেই গাছটীকে বেঁচে থাক্‌বার সাহায্য কয় জনে কর্ব্বে, বলা কঠিন। এত অসুবিধার ভিতরেও আমি প্রতি বৎসর হাজার হাজার বৃক্ষ-সৃষ্টির জন্য সেখানে প্রাণপাত ক'রে যাচ্ছি পরিশ্রম, আর সাধ্যাতীত ক'রে যাচ্ছি অর্থব্যয়। আশা, একদা আমি যখন সশরীরে আর থাকব না, বা আমার আশ্রম যখন ওদেশে হয়ত থাকবে না, অন্ততঃ তখনও কারো না কারো মনে বৃক্ষরোপণের, ফলসৃজনের আগ্রহ জেগে উঠ্‌বে।

বৃক্ষরোপণ ও আরণ্যক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ যখন বীজ-বপন শিখ্‌ল আর বৃক্ষরোপণ শিখ্‌ল, তখন যে সে কত দ্রুত ধাপের পর ধাপ অতিক্রম ক'রে সভ্যতার উন্নততর স্তরে উঠ্‌তে লাগল, তা'

ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। মানব-সভ্যতার প্রথম স্ফুরণ ভিন্ন মানুষকে আত্মীয় করার চেষ্টার মধ্য থেকে আর নিশ্চিন্ততার প্রথম স্ফুরণ কাষ্ঠের সঙ্গে কাষ্ঠ ঘর্ষণ ক'রে অগ্নি-উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার থেকে। মানুষের পরবর্ত্তী নিশ্চিন্ততা এল বন থেকে গাভী ধ'রে এনে প্রতিপালনের দক্ষতা লাভ থেকে। তার সভ্যতার দ্রুত বিস্তার সুরু হ'ল সেই দিন, যেদিন সে বন্য-ঘোটককে বশীভূত ক'রে এনে দূরত্বকে করল জয়। কিন্তু বীজ-বপন আর বৃক্ষরোপণ যতদিন তার মজ্জাগত কর্ম্মশৈলী না হ'ল, ততদিন সে প্রকৃত সভ্য হ'তে পারে নি। যে-কোনও দেশে বৃক্ষ-সৃষ্টির আন্দোলন সফল হ'লে এক সঙ্গে তাদের বহু সমস্যার সমাধান আপনা আপনি হ'য়ে যেতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল অরণ্য থেকে হিংস্র পশু বেরিয়ে এসে মানুষকে হনন করেছে, আর স্বহস্ত-রোপিত সহস্র পাদপে পরিবেষ্টিত তপোবন থেকে তত্ত্ব ও দর্শনের আরণ্যক-সমূহ আবির্ভূত হ'য়ে মানুষকে অমৃতত্বের পথ দেখিয়েছে। বৃক্ষসৃষ্টির আন্দোলন কেবল সুভক্ষ্য ফলবৃদ্ধির আন্দোলনই নয়, মানব-সভ্যতায় শান্তি আনয়নেরও আন্দোলন।

সমাজের পরম সর্ব্বনাশকর শত্রু

কাঁকুড়গাছি নূরজাহান নার্শারী হইতে ফিরিবার পথে রৌদ্রতপ্ত হওয়াতে বিশ্রামার্থ শ্রীশ্রীবাবামণি পথ-পার্শ্বস্থ একটী ছায়া-বহুল বৃক্ষতলে বসিলেন। সঙ্গীয় যুবকটীকে বলিলেন,—দেখ, এই বৃক্ষটী এমন এক উত্তপ্ত মুহূর্ত্তে আমাদের পক্ষে কেমন

প্রীতিপ্রদ, প্রাণপ্রদ, সুখপ্রদ আশ্রয়। এই বৃক্ষটীকে যদি কেউ কেটে ফেলে, তবে নিশ্চয়ই সে অনেকের সুখে বাদ সাধবে। অর্থাৎ সে মানবের শত্রুতা সাধন কর্ব্বে। তাই নয় কি?

যুবকটী বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা সত্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক এমনি ভাবে জান্‌বে স্বামীতে অনুরক্তা একনিষ্ঠ-পতিব্রতা সাধ্বী সতী নারী সংসারের এক শান্তিদায়ক আশ্রয়। সে আছে ব'লে তার পুত্রকন্যাগুলি নিতান্ত দরিদ্রতার মধ্যে থেকেও বিমল মাতৃস্নেহ পেয়ে ধন্য হয়, পুষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যদি হঠাৎ এসে এই পতিব্রতার সতীত্ব নাশ করে, তবে সে কেবল ঐ রমণীরই শান্তিটুকুর সর্ব্বনাশ করে না, তাকে আশ্রয় ক'রে সংসারের যতগুলি প্রাণী সুখ-সাধনের কামনা করে, তাদের প্রত্যেকের সর্ব্বনাশ করে। বল, এমন কুকাজ যে করে, জাতির, সমাজের ও সভ্যতার এমন নিদারুণ শত্রু আর কেউ আছে কি?

যুবক মাথা নত করিল। কিছু বলিল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লোকজনের সমক্ষে বা তোমার নিজ পিতামাতার চখের উপরে থেকে একটী স্ত্রীলোকের প্রতি তুমি কদাচ যে-ভাবের ব্যবহার কত্তে সাহস পাবে না, একাকিনী পেয়ে তুমি হঠাৎ তার গায়ে সেই ভাবেই হাতটী দিয়ে বস্‌লে। তার পরেই ভাণ করলে যেন হঠাৎ একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে, যেন ইচ্ছা ক'রে তুমি কিছু কর নি। আর মেয়ে-মানুষটীও নিজের লজ্জা গোপন কর্ব্বার জন্য ভাণ করল যে, সে কিছুই বুঝতে

পারে নি, তোমার আচরণটা যেমনই হোক, তার মধ্যে কোনো মন্দ উদ্দেশ্য আছে ব'লে সে ধরতে পারে নি। সে হয়ত কিছুটা আঁচ কত্তে পেরেছে কিন্তু নেহাৎ লজ্জাবশতই প্রতিবাদ কত্তে পারে নি বা তোমাকে ধমকে দিতে সাহস পায়নি। এর ফলে তোমার দুঃসাহস বেড়ে গেল। যতদিন দেরী করলে প্রথমোক্ত ঘটনাটী মেয়েটী হয়ত ভুলে যাবে, ততদিন প্রতীক্ষা করার পরে তুমি হঠাৎ আবার আর একটা এমন আচরণ কর্ল্লে, যা' লোকজনের সামনে স্ত্রীলোকটীর উপরে তুমি কত্তে কখনো পার্ত্তে না। যেহেতু মেয়েটী প্রথম বারেই তোমাকে ধমকে দিতে পারে নি, সেই হেতু এবারও তার পক্ষে আর প্রতিবাদ করার সাহস হ'ল না। এই দুর্ব্বলতার দরুণ কত বড় একটা মহাযুদ্ধে সে যে হেরে যাচ্ছে, এই খেয়াল তার আদৌ নেই বা এই কথাটুকু বুঝে নেবার মতন শিক্ষা তাকে কেউ কখনো দেয় নি। ফলে ছোট্ট ছোট্ট আদর, ছোট্ট ছোট্ট স্নেহ, ছোট্ট ছোট্ট সোহাগ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বা একত্র ভ্রমণ, একত্র সিনেমা দর্শন বা একত্র যাদুঘর বা পশুশালা পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে তুমি আস্তে আস্তে তার সরমের বাঁধনকে আল্‌গা ক'রে দিতে লাগ্‌লে, তার কোমরের বন্ধনী ঢিলা হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। একদিন হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে কল্পনাতীত একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে, নির্জ্জনতার পৃষ্ঠপোষকতায় তুমি মেয়েটীকে আক্রমণ ক'রে বস্‌লে, তাকে কাবু কর্ল্লে, তার সঙ্গে তোমার যেরূপ ব্যবহার সে প্রাণ গেলেও কখনো অনুমোদন কত্তে পারে না, এমনকি, যেরূপ ব্যবহারের

কথা সে কদাচ কল্পনায়ও আনতে পারে নি, ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই তুমি কর্ল্লে। তখন শুধু কাঁদা ছাড়া তার আর উপায় কিছু রইল না। দুষ্ট ও লম্পটেরা অধিকাংশেই যে অল্প অল্প ক'রেই অগ্রসর হয়, দীর্ঘকাল ধ'রে পা টিপে টিপে সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে একটী নিরাপদ মুহূর্ত্তে দুঃসাহস ক'রে বসে, তা' ত' এই সরলপ্রাণা মেয়েটী জানে না বা ভাবে নি। লজ্জা-বশে গোড়ায় যে সে তোমাকে বাধা দেয় নাই, এখন সে আর বাধা দিলেও তোমার মতন হিংস্র রক্তপিপাসু পশুর সঙ্গে পার্ব্বে কেন? কিন্তু বল্‌তে পার, তুমি সমাজের কত বড় শত্রু?

যুবকটী দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তৎপরে একটী বিরাট বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। সে চেষ্টা করিল বুঝাইতে যে, যুবতী এক পরস্ত্রী, সে আস্তে আস্তে তাহাকে অধিকার ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিল বলিয়াই সে অধঃপাতের অন্ধকূপে ডুবিয়াছে, বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও ঐ যুবতীর স্বামীকে নিয়া কোনও সুখ ছিল না, যুবকটী পরোপকার-প্রবৃত্তি-বশেই যুবতীটীর ইচ্ছা পূরণ করিয়া আসিতেছে। একথা সত্য যে, যুবতীটী অনেক বাধাও দিয়াছে, কিন্তু যুবকটীর মনে হইয়াছে যে, এ বাধা লোকদেখান বাধা মাত্র, এজন্যই সে ঐ বাধাকে গ্রাহ্য করে নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—বাধাদান তার লোক-দেখান বাধা মাত্র, তাই তুমি তার বাধাকে গ্রাহ্য কর নাই, এই যে কথাটা তুমি বলছ, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যার উপরে

তোমার সত্যিকারের কোনো অধিকার নেই, তার বাধা অগ্রাহ্য করারও তোমার অধিকার নেই। তুমি কৌশলে বা গায়ের বলে তাকে বশীভূতা কত্তে পেরেছ ব'লেই তার বাধাগুলি ভাণমাত্র, একথা মনে করা ভুল। স্ত্রীলোকেরা মনে মনে ইচ্ছুকা বলেই লম্পটেরা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একথা বিশ্বাস করবে পাগলে। তবে একথা সত্য যে, আপত্তিজনক পাপ বারংবার অনুষ্ঠিত হ'তে থাকলে বিবেকের ধার ক'মে যায়, তখন লজ্জা, অনুতাপ, হিতাহিত-বোধ সবই নষ্ট হ'য়ে যায়। যা' তা' একটা ব্যাখ্যা দিয়ে পাপকে সমর্থন তখন বড়ই সোজা হ'য়ে পড়ে। কিন্তু অন্যে তোমাকে সুযোগ দিয়েছিল ব'লেই তুমি পাপ করেছ, এযুক্তি ধোপে টিকবে না। তুমি পাপ কত্তে মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলে ব'লেই অন্যে তোমার পাপাচারকে শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, এই ব্যাখ্যাটাই সঠিক ব্যাখ্যা হবে। এতকাল যা' করেছ, আজ থেকেই তা' ছেড়ে দাও এবং যার সঙ্গে পাপাচারের দ্বারা হয়েছে সংশ্রব, তার কাছ থেকে লক্ষ যোজন পথ দূরে সরে যাও।

নিশ্চয়ই উদ্ধার আছে

যুবকটী বলিল যে, দূরে সরিবার উপায় নেই। কারণ, যুবকটীর পিতামাতা অনেক দূরে সাজাহানপুরে থাকেন, যুবকটী অবিবাহিত, চাকুরী পাইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছে, কলিকাতার বাড়ীটীর তারাই মালিক, সংশ্লিষ্ট যুবতী ও তাহার

স্বামী এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া। আপাততঃ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মেয়েটীকে স্পষ্ট ক'রে বল যে, এতদিন যা' করেছ, ভুল করেছ, এ ভুলের পুনরাবৃত্তি আর চলবে না। মানুষ, একবার ভুল করেছে ব'লেই জীবন ভ'রে ভুলের বীজ বুনবে আর ভুলের ফসল তুলবে, তা' হ'তে পারে না।

যুবকটী বলিল,—এ আসক্তি বড়ই মারাত্মক। এখন আসক্তি দুই দিক্ থেকেই সমান প্রবল। যুবতীর স্বামী সব টের পেয়ে গেছেন, তবু আসক্তি কারো কমছে না। আমি যখন ভাল থাকতে চাই, তখন যুবতীটী আমাকে নিয়ে টানাটানি করে। যুবতীটী যখন ভাল থাকতে চায়, তখন আমি টানাটানি না ক'রে পারি না। আমরা সমুদ্রের জলে ডুবে গেছি। আমাদের আর উদ্ধার নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আরে হতভাগা তবু ত' বুদ্ধি ক'রে আমার কাছে এসেছিস্। উদ্ধার নিশ্চয়ই আছে।

যুবকটী বলিল,—আপনি যদি দৈববলে উদ্ধার করেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কোনো দৈববল নেই। কিন্তু আমি পরমেশ্বরে বিশ্বাসী। তিনিই তোমার বিপদ কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে, দূরে স'রে পড়ার সুযোগ পাওয়া মাত্র সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কর্ব্বে।

কাজ করি ভবিষ্যতের জন্য

অপরাহ্নে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—কাল ত' আপনি যাচ্ছেন রংপুর। এদিকে ষাটটী পেয়ারার কলম যাচ্ছে পুপুন্‌কী আশ্রমে। রোপণের কি ব্যবস্থা হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি। বন্ধুর মৃত্তিকা খনন ক'রে কাঁকর বেছে ভাল মাটির সঙ্গে সার মিশিয়ে গর্ত্ত ক'রে রাখা ছিল ছয় কি আট মাস আগে। এবার গিয়ে সমগ্র স্থানটী কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখে এসেছি। অবশ্য, চোরের যা' উপদ্রব, কাঁটা-তারগুলি কদিন থাক্‌বে, তা' পরমেশ্বরই জানেন। ভবিষ্যতে ওখানে হয়ত কিছুই থাক্‌বে না বা সম্পদের অধিকাংশই হস্তচ্যুত হবে, কিন্তু তা' জেনেও কাজ ক'রে যাচ্ছি পাকাপোক্ত ভাবে। যে কাজ আগামী কাল হবে, তার জন্যে আমি ব্যবস্থাপনে হাত দেই দুই বৎসর আগে থেকে। চিরকাল বেঁচে থাক্‌ব না, কিন্তু প্রতিটি কাজ ত' কচ্ছি সুদূর ভবিষ্যতের পানে চেয়ে।

তিব্বতী যোগ

একজন তিব্বতী যোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। নিকটেই ট্যাংরাতে কে একজন মহাপুরুষ, আসিয়াছেন, তিনি বেশ কতকগুলি দম্পতিকে নিয়া নাকি তিব্বতী যোগ শিক্ষা দিতেছেন। স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের বাছ-বিচারের বালাই নাকি ইহাতে নাই। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-মিলন আছে, যোগ-

প্রভাবে জড়-দেহটী একটী চৈতন্যময় সত্তায় পরিণত হয় এবং তখন সাধকের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তিব্বতী যোগ সম্পর্কে যে কথাগুলি প্রসিদ্ধ, তা' হচ্ছে এই যে, ভোগ্য বস্তু সম্মুখে আছে, খাদ্য আছে, মধুর পানীয় আছে, স্পর্শ সুখদায়ক ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-বিধায়ক সর্ব্বপ্রকার আয়োজন বা আড়ম্বর আছে, তথাপি সাধকের মন সেদিকে ধাবিত হচ্ছে না, তার মন তার ঐকান্তিক জীবন-লক্ষ্যের দিকেই প'ড়ে আছে, তার দেহেরও বিকার নেই, মনেরও বিকার নেই। এর মধ্যে যৌন-সম্ভোগ বা ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-যুক্ত আচরণের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। তবু যদি কেউ, ইন্দ্রিয়-সুখ-প্ররোচক ব্যবস্থাদি ক'রে তাকে তিব্বতী যোগ ব'লে ব্যাখ্যা করে, তবে অন্যের কি বল্‌বার থাক্‌তে পারে? তিব্বতীই হোক্ আর তান্ত্রিকীই হোক, সর্ব্বপ্রকার যোগেই ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা সৎ-সাধকদের দ্বারা বিগর্হিত আচরণ ব'লে বর্ণিত হয়েছে। তোমরা ওসব হুজুগে মাত্‌বে না। যৌন ব্যাপারের চর্চ্চা বা গবেষণা কত্তে হয় ত' স্বামী আর স্ত্রীতে মিলে নিজের ঘরে ব'সে যা' কর্‌বার কর। যোগ-সাধনার নাম ক'রে সর্ব্বজনীন ইন্দ্রিয়-চর্চ্চায় কেউ অভিনিবেশ দিও না।

যোগশক্তি ও ম্যাজিক

প্রশ্ন হইল যোগশক্তি সম্পর্কে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিন্তা এক মহতী শক্তি। যে-কোনো লোক যদি যে কোনও একটী

চিন্তাকে বেছে নিয়ে ঐ চিন্তাতেই নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে দেয়, তাহ'লে ঐ চিন্তাতে তার সিদ্ধি অর্জ্জিত হয়। তখন ঐ একটী বিষয়ে সে অলৌকিক কাণ্ড সব কত্তে পারে। চিন্তার এই অলৌকিকী শক্তি সম্পর্কে অতি প্রাচীন বা অতি আদিম কালের মানুষেরও সম্যক্ জ্ঞান ছিল এবং চিন্তার এই শক্তির উপরে নির্ভর ক'রে এক একটা মানুষ এক এক রকমের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে তৎকালের অসংখ্য নরনারীকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। এই থেকেই পৃথিবীতে ম্যাজিক বা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি। আদি কালের ঐন্দ্রজালিক বা ম্যাজিক-বিশারদদিগকে তৎকালের সমসাময়িক লোকেরা দৈববলে বলীয়ান ব'লে মনে কত্ত এবং তারই ফলে ঐ সব শক্তিশালী লোকেরা যখন যা' বলে যেত, লোকে তাকেই পরম ধর্ম্ম বা অলঙ্ঘনীয় ধর্ম্মকার্য্য ব'লে জ্ঞান কত্ত। অনেকের মতে, জগতে ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং প্রসার ঠিক এই ভাবেই হয়েছে। এই উক্তিটা যদিও যথার্থ বা সম্পূর্ণতঃ সত্য ব'লে মেনে নেওয়া চলে না, তবু মান্‌তেই হবে যে, এই অনুমানের ভিতরেও যথেষ্ট সত্য বিদ্যমান্।

ম্যাজিক ও ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের স্বভাবই এই যে, একজনের প্রতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই কোনও কারণ বশতঃ আস্থা, বিশ্বাস, ভক্তি বা শ্রদ্ধা এসে পড়্‌লে তারপরে সেই সকল নির্ভরশীল মানসিক সদ্‌বৃত্তিগুলি অকারণেও বাড়তে থাকে।

ম্যাজিকওয়ালাদের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে যে স্থলে স্বাভাবিক কারণ রয়েছে, সেই সকল স্থল ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও স্বভাবতই আস্থাশীলদের আস্থা ক্রমশঃ বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। কেউ যদি কোনও ব্যাপারে কারো আস্থার যোগ্য না হ'য়েও বিনা শ্রমে আস্থার অধিকারী হয়, তাহ'লে সে যা' পাবার সত্যি সত্যি অধিকারী নয়, এমন অনেক ব্যাপারে আস্থা-অর্পণকারীদের কাছ হ'তে জোর ক'রে প্রাপ্যের চেয়ে শত গুণ বশ্যতা আদায় ক'রে নেবার জন্য প্রলুব্ধ হবে, এটীতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নেই। ফলে, ম্যাজিক থেকে ক্রমশঃ অত্যাশ্চর্য্য সব জীবন-চর্য্যার নির্দ্দেশ আসতে আরম্ভ কর্ল্ল, যা' অন্ধের মতন বাধ্যতা নিয়ে অনেক লোকে পালন ক'রে যেতে লাগল। এভাবেও যে ধর্ম্মের উৎপত্তি বা বিকাশ ঘটতে পারে, এটা আধুনিক কালের অধিকাংশ পুরাতত্ত্বানুসন্ধানী বিজ্ঞানীদের অভিমত।

ম্যাজিকটাই ধর্ম্ম নয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ম্যাজিকটাই যে ধর্ম্ম নয় বা ধর্ম্মটা যে ম্যাজিক নয়, এই কথা বলার লোকও চিরকাল দুচারজন মিলেছে। আধুনিক কালের শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মজগতের অত বড় ভাস্কর হয়েও কিন্তু বারংবার ব'লে গেছেন, "খুব ত' তপস্যা ক'রে বিনা নৌকায় নদী পার হবার বিদ্যা শিখে এলি কিন্তু মাত্র এক পয়সা খেয়ার কড়ি দিয়ে যে নদীটা পার হওয়া যায়, তাকে মন্ত্রবলে পার হবার কৌশল শেখার জন্য জীবনের

বারো বৎসর পরমায়ু তপস্যায় কর্ত্তন ক'রে কি লাভ হ'ল?"— অতীব সঙ্গত প্রশ্ন। তপস্যা ক'রে কেউ হয়ত এমন সিদ্ধাই অর্জ্জন করেছেন যে, কুচবিহারে ব'সে এক হাঁড়ি বাগবাজারের রসগোল্লা শূন্যপথে এক মিনিটের মধ্যে আনিয়ে বড় বড় ব্যারিষ্টারদের খাইয়ে দিয়ে তাঁর যোগশক্তি প্রদর্শন ক'রে সবার তাক্ লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু সঙ্গত ভাবেই এই প্রশ্নটাও করা চলে যে, এতে বৃহত্তর জনসমাজের কি লাভ হ'ল? ঐ শহরেই সেই দিন কি কমপক্ষে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ জন ক্ষুধার্ত্ত মানুষ আহারীয়ের অভাবে বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রে কেবল ছটফট করে নি? তাদের উদরে ক্ষুধার অন্ন দিয়ে দেবার জন্য তোমার যোগশক্তি ব্যবহৃত হ'ল না কেন? আর, হ'ল নাই যদি, তবে তোমার এই অলৌকিকী শক্তি-অর্জ্জনের কোন্ সার্থকতা হ'ল? একটা মাত্র তুড়ি দিয়ে তুমি সমস্ত ঘরখানাকে দিব্যগন্ধে বা পূতিগন্ধে পূর্ণ ক'রে দিয়ে তোমার যোগশক্তির বাহাদুরী দেখালে কিন্তু প্রত্যেকেরই জিজ্ঞাস্য এই হবে যে, মানুষের আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণের পক্ষে এই যোগশক্তি কোন্ কাজে এল? মানুষের ক্লেশ-লাঘবের কাজে যা' লাগ্‌ল না, তোমার যদি অশেষ তপস্যার ফলে তেমন যোগশক্তি কিছু আয়ত্ব হয়েই থাকে, তবে তাকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের সুফল ব'লে বর্ণনা করব কোন্ যোগ্যতায়? এগুলি ধর্ম্ম নয়। এগুলি ধর্ম্মের লক্ষণও নয়। এগুলি ধর্ম্মীয় ব্যাপারও নয়। এগুলি প্রকৃত ধার্ম্মিকের কাছে আদরণীয়ও নয়।

প্রকৃত ধর্ম্ম ম্যাজিক-নিরপেক্ষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মের উদ্ভব বিস্ময় থেকে। সে বিস্ময় অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় এক মহাশক্তির আশ্চর্য্য লীলা দেখে। আকাশের অরুণিমা বেদের ঋষিদিগকে ধর্ম্মের চেতনা দিয়েছিল। সংঘবদ্ধ-ভাবে উৎপীড়িত ইহুদীদিগকে ধর্ম্মের প্রেরণা জুগিয়েছিল, উদ্ধারের আশা। যীশু খ্রীষ্টকে ধর্ম্মের প্রেরণা দিয়েছিল, মানুষ মাত্রকেই ঈশ্বর-প্রেমের অধিকারী করার দিব্য-চেতনা। হজরত মহম্মদকে ধর্ম্মের প্রেরণা দিয়েছিল, পরমেশ্বরের একত্ব ও মহত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গকে ধর্ম্মের প্রেরণা দিয়েছিল, পরমদয়িতে পরমমধুর প্রেমের অফুরন্ত পিপাসা। এর মাঝখানে ম্যাজিক তার স্থান ক'রে নিতে পারে নি। এঁদের কারো কারো জীবনবৃত্তান্তের অংশ-বিশেষে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা দেখা যায় বটে, কিন্তু সেই অবতারণা ত' তারা করেছে, যারা তাঁদের পরবর্ত্তী কালের লোক। অলৌকিক ঘটনা এঁদের কারো ধর্ম্মমত প্রচারের, প্রসারের, বিস্তারের, বিকাশের বা পূর্ণতায় পরিণমনের অপরিহার্য্য কারণ বা উপসঙ্গ নয়। যীশু অনেক অলৌকিক কাণ্ড করেছেন, এটা সত্য হ'তে বাধা নেই। কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছে তাঁর প্রেমে।

ধার্ম্মিককে চিনিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঝোঁক তোমাদের যে, একজন ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে তোমরা বুঝতেই পার

না, যদি তাঁর জীবন-সম্পর্কিত এক ডজন অত্যদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী তোমাদের কাছে পরিবেশিত না হয়। একজন লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে তোমরা জান্‌তেই পার না, যদি তাঁর দূরদর্শন, দূর্‌শ্রবণ, সূক্ষ্মদেহে আকাশ-মার্গে বিচরণ প্রভৃতি কাহিনী তোমাদের কাছে না বলা হয়। তোমরা ম্যাজিককে ধর্ম্ম ব'লে জ্ঞান ক'রে প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগকে ম্যাজিক-বিশারদ-রূপে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছ। এর ফলে ধার্ম্মিক-রূপে যাঁর যশোলিপ্সা এসেছে, তিনি গণ্ডায় গণ্ডায় অলৌকিক কাহিনী নিজের সম্পর্কে প্রচার ক'রিয়ে বাজার দখল কত্তে চাচ্ছেন। কেউ কেউ কুড়িতে কুড়িতে আর ঝুড়িতে ঝুড়িতে অলৌকিক কাহিনী নিজ শিষ্যদিগের দ্বারা প্রচার করাবার জন্য সুকৌশল চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন। এই যেখানে ধর্ম্মজগতের অবস্থা, সেখানে কি ক'রে তোমরা ধর্ম্মকে চিনবে আর প্রকৃত ধার্ম্মিককে জানবে? ধার্ম্মিককে জানবার উপায় তাঁর অকপট জীব-হিতৈষণা, ধর্ম্মকে চিনবার উপায় তার জীবহিতে প্রেরণা দানের সামর্থ্য। আসল লক্ষণকে বাদ দিয়ে যদি নকল লক্ষণ নিয়ে টানাটানি কর, তা' হ'লে জহরতের ব্যবসায়ী হ'য়েও জীবন ভ'রে শুধু কাচ আর মূল্যহীন পাথরের টুকরোই সংগ্রহ ক'রে মরবে। ঝোল্‌না তোমার পুরু হবে, বোঝা তোমার বাড়বে, কিন্তু সম্পদ কিছুই আহরণ কত্তে পার্ব্বে না।

প্রকৃত ধর্ম্মান্দোলন

প্রশ্ন হইল,—অনেক মহাপুরুষ-নামে-খ্যাত মানুষদের যে নিজ নিজ অলৌকিকত্ব সম্পর্কে নানা কথা প্রচার করতে এবং

করাতে উৎসাহ দেখা যায়, তা' কি তাহ'লে সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরেই ভিত্তিমান্?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অলৌকিকের ব্যাপারে কার প্রচার সত্যের উপরে ভিত্তিমান্ আর কার প্রচার মিথ্যার উপরে স্থাপিত, তার বিচার করার ভার আমাকে কেউ দেয় নি যে, আমি সেই বিষয়ে মাথা ঘামাব। আমি এক কথায় ধরে নিচ্ছি যে, সব কথাই সত্য, মিথ্যা কিছুই নয়। কিন্তু একথা তার চেয়েও সত্য যে, অসাধারণ মানুষদের অলৌকিকত্ব দিয়ে জগতের কোনও বিরাট বা দারুণ সমস্যার সমাধান হবে না, সমাধান হবে সাধারণ মানুষদের লৌকিক জীবনের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এই জন্যই আমি সেই আন্দোলনকেই প্রকৃত ধর্ম্মান্দোলন ব'লে আখ্যা দেই, যেই আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষ নিজ নিজ জীবনে অসাধারণ চরিত্রবল অর্জ্জন ক'রে সকলের মৈত্রী, প্রীতি ও ঐক্যের মাধ্যমে জগদ্ব্যাপী বড় বড় নিদারুণ সমস্যাগুলির সমাধান-কর্ম্মে হয় সাহস-সহকারে উদ্যত। এই দৃষ্টিতে অনেক সময়ে জগতের বহু রাজনৈতিক আন্দোলনও আমার কাছে ধর্ম্মান্দোলন ব'লে সম্মান পায়। আন্দোলন কি তোমাকে আত্মবিশ্বাস দিল? দিল কি তোমাকে যৎসামান্য পরিমাণেও ত্যাগের সামর্থ্য? আন্দোলন কি তোমার ভোগের প্রবৃত্তিকে শাসন ক'রে সঙ্কুচিত ক'রে দিতে পারল? আন্দোলন কি তোমাকে বিশ্ববাসী সকলের দুঃখকে নিজের দুঃখ ব'লে বরণ কত্তে প্রেরণা দিল? দিল কি সে তোমাকে ক্ষিপ্রতা ও উন্মার্গগামিতা পরিহার

ক'রে সকলের প্রতি সমান প্রেমবুদ্ধি সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হবার গতি, বুদ্ধি এবং বল? তাই যদি দিয়ে থাকে তবে জান্‌বে, তোমার আন্দোলন যে বিষয় নিয়েই হোক, এ আন্দোলন ধর্ম্মের, এ আন্দোলন ধর্ম্মোপেত, এ আন্দোলন সত্যিকারের ধর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করার শক্তি নিয়ে সঞ্জাত। লোভ এবং মিথ্যা থেকে যার জন্ম, তাতে দিবারাত্রি "ধর্ম্ম" শব্দটা জপ কর ব'লেই তাকে ধর্ম্মান্দোলন বলা চলবে না।

নিজের কাছে ছোট হইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, ধর্ম্মান্দোলন পরিচালন কচ্ছি, এই কথাটা ব'লে যাঁরা নানা রূপ কাজ কচ্ছেন বা করাচ্ছেন, তাঁদের সবাই শুধু মেকী সোণারই কারবার করছেন ব'লে একটী উগ্র সন্দেহ মনের ভিতরে পোষণ ক'রে রাখার কোনো সার্থকতা বা প্রয়োজন নেই। সন্দিগ্ধতা একটা বায়ুরোগ। সন্দিগ্ধতা থেকে নিজের মনই অশুচি হয়, অন্য কোনও লাভ হয় না। অন্য মতের অন্য পথের লোকেরা ভুল কচ্ছে, না পাপ কচ্ছে, তার অনুসন্ধিৎসায় প্রবেশ ক'রে তোমরা নিজেদের চরিত্রটুকুকে কলঙ্কিত ক'রো না। তোমাদের নিজেদের কাজ এই সৎ-সঙ্কল্প নিয়ে তোমরা ক'রে যেতে থাক যে, তোমাদের কাজে যেন ফাঁক না থাকে, ফাঁকী না থাকে, পাপ না থাকে, দুর্ব্বলতা না থাকে, ভাণ না থাকে, দোষ না থাকে। সবল মনে, সবল প্রাণে, সরল মনে আর সরল প্রাণে নিজেদের কাজ নিজেরা

ক'রে যাও। কাজ যতটুকু করেছ, তার দশগুণ করবে প্রচার, এ কোনো কাজের কথা নয়। নিজেদের মাহাত্ম্য নিজেরা প্রচার ক'রে জগতের কোনো সেবা কত্তে পার্ব্বে না, জগদ্বাসীকে ভালবেসে পারবে প্রকৃত কাজ কত্তে। প্রকৃত ভালবাসায় বাখানিও থাকে না, বাহাদুরিও থাকে না। নিজের কাছে নিজে সৎ থাক, অটুট থাক, আত্ম-প্রতারণা ক'রে কখনো নিজের কাছে নিজে ছোট হ'য়ো না।

ধর্ম্মের ব্যবসায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে যত রকমের ব্যবসায় আছে, তার মধ্যে ধর্ম্মের ব্যবসায় সব চেয়ে বেশী ফলাও। এমন বহু-বিস্তারিত সহজ ব্যবসায় জগতে বোধ হয় কমই আছে। রাজনীতিরও একটা ফলাও কারবার আছে কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে। ধর্ম্মের কারবারে ঝুঁকি খুব কম ব'লেই বুদ্ধিমান অযোগ্য ব্যক্তিরা এই ব্যবসায়ের দিকে অত্যধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। বিশ জনে যদি ব্যবসায়ে নামে, তবে কম পক্ষে দশ জন ত' সফল হবেই হবে। দশজন যদি সফল হয়, তাহ'লে ব্যবসায়িক গিল্ডের মতন এদের মধ্যে আবার বোঝাপড়া হ'য়ে যায়। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীকে সহায়তা করে এবং পারস্পরিক সহযোগের মধ্য দিয়ে মানুষের মনকে আকৃষ্ট ক'রে যার যার সুবিধামতন মানব-গোষ্ঠীকে নিজ নিজ সংস্থার দিকে আকৃষ্ট করার কাজ চলতে থাকে।—এই যে অভিযোগটী আজকাল

চারদিকে কলস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে, তার সবটাই যে মিথ্যা বা কল্পনা, একথা মনে করা চলে না। মানুষের যুক্তিবাদী মন সুযোগ পেলে কাউকে ছেড়ে কথা কইবে না। সুতরাং তোমরা যারা আমার পথে চল্‌ছ, তারা হুশিয়ার থেক যে, লোক-প্রবঞ্চনা কোনো অবস্থাতেই করা হবে না, করা চলবে না।

বগুড়া জেলার চন্দনবাইশা-নিবাসী প্রসিদ্ধ ফকীর-বংশীয় শাহ্ আব্বাস আলি সাহেব দিন তিনেক হয় শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎকারের আশায় কলিকাতা আসিয়াছেন। সেখানকার নাওখিলা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় শাহ্ আব্বাস আলি সাহেবের শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধনের কতকগুলি ইতিবৃত্ত দিয়া একটী পত্রও দিয়াছেন। বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের কতিপয় শিক্ষকের সুব্যবস্থায় ঐ স্কুলেই শাহ্ আব্বাস আলি সাহেবের থাকিবার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং প্রত্যহই তাঁহারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত অল্পাধিক আলোচনা করিতেছেন। অদ্য তাঁহারা দেশে ফিরিবেন।

বিদ্বেষের ফলাফল

প্রসঙ্গক্রমে আব্বাস আলি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,— আপনি যখন আমাদের দেশে গিয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকল লোক আপনাকে দেখবার জন্য, আপনার শ্রীমুখের বাণী শোনবার জন্য পাগল হয়েছিল। এমনকি,

পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকেরাও যাতে আপনাকে দেখতে পারে, তার জন্য আমরা আপনাকে আমাদের আদবাড়িয়া গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে পদধূলি দিতে বাধ্য করেছিলাম। আমার ছেলে আবদুর রহমান আপনার কৃপায় মস্তিষ্ক-রোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'রে সর্ব্বদা কেবল আপনার কথাই বল্‌ছে। যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন সুন্দর, তখন আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি, গ্রামে গ্রামে গোপনে গোপনে আত্মনাশী ও সর্ব্বনাশকর সাম্প্রদায়িক চেতনাকে জাগিয়ে তোল্‌বার পদ্ধতিবদ্ধ চেষ্টা চল্‌ছে। আমরা জানি, এর ফল কখনো ভাল হতে পারে না কিন্তু কিছুই যেন নিবারণ করা যাচ্ছে না। এই সাম্প্রদায়িকতার প্রতীকার কি? হিন্দু-মুসলমানের মিলন কবে হবে? বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলাফল কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিদ্বেষের ফল বিদ্বেষ, আক্রোশের ফল আক্রোশ, হিংসার প্রতিফল প্রতিহিংসা। যারা মনে করে, "আমি যে বিদ্বেষ কচ্ছি, তার প্রতিবিদ্বেষ আর কতটুকু হবে", তাদের আর বিদ্বেষ-দমনের ইচ্ছাই আসে না। যারা মনে করে, "আমি যে আক্রোশ দেখাচ্ছি, তার প্রতিফল আরও নিদারুণ আক্রোশ-রূপে আত্মপ্রকাশ কখনই কর্ত্তে পারে না", তাদের পক্ষে নিজেদের আক্রোশ দমনের চেষ্টা জাগে না। যারা মনে করে, "আমি যে হিংসার অনল জেলে দিলুম, তাতে হিংসিত লোকেরাই পুড়্‌বে এবং মরবে, এই আগুনের হল্‌কা বায়ুর বেগে উল্টো দিকে প্রবাহিত হ'য়ে অধিকতর বিক্রমে

আমার ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা, গরু-ভেড়া, মানুষ ও তৈজসপত্রকে পুড়ে ছারখার করবে না", তারা নিশ্চিন্তে এই জগতে হিংসা ক'রে বেড়ায়। একটী মানুষ অপর মানুষের প্রতি সামাজিক অন্যায় ক'রে যখন কোনও শাস্তি বা শাসন পায় না, তখন সে বেপরোয়া হ'য়ে একই অন্যায় বারংবার কত্তে থাকে। সে আর কারো তোয়াক্কা রাখে না। সাধারণ জগতে হিংসা-বিদ্বেষের এটাই প্রকৃতি। সুতরাং এই রকম যুক্তি অনেকেই দিতে আসবেন যে, মুসলমানেরা যখন হিন্দুদের এমন ঠেঙ্গানো ঠেঙ্গাবে যে, তাদের দেশবাড়ী ছেড়ে বিদেশে বিভূঁয়ে গিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রতপ্ত আকাশের তলে বাসা বাঁধতে হবে, তখন হিন্দুরা আর মুসলমানকে হিংসা-বিদ্বেষ কর্ব্বে না। আবার এই রকম যুক্তিও অনেকে দেবেন যে, হিন্দুরা যখন মুসলমানদের এমন অত্যাচার করবে যে, ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাবুলে না তেহ্‌রাণে, বসোরায় না বাগ্‌দাদে, কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজতে হবে, তার ঠিকানা থাকবে না, তখন মুসলমানেরা আর হিন্দুদের উপর অত্যাচার কর্ব্বে না। বিদ্বেষের এটাই স্বাভাবিক ফলাফল।

প্রকৃত মানুষ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বিদ্বেষের পথে মিলন আসবে না, আসতে পারে না, জগতে কোথাও কখনো আসে নি। অতীত ঘাটতে গেলেই নূতন নূতন বিদ্বেষের সূত্র আবিষ্কৃত হবে, অতীতকে উদ্ধার কত্তে গেলেই পুরাতন ক্ষতগুলি নূতন

ক'রে রক্ত ঝরাতে লেগে যাবে। বিদ্বেষ কখনো মিলনের পথ প্রশস্ত করে না, করে বিচ্ছেদের পথকে প্রশস্ত। সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা এবং রক্ষণশীলতার মোহ অতিক্রম ক'রে একদিন মানুষ-হিসাবে মানুষের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হবেই হবে। আজ যারা সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে নানা অকল্পনীয় আন্দোলনের কল্পনা কচ্ছে, ঘটনাবলির তাড়নে তাদের মুখ থেকে সহস্র কণ্ঠে এই বাণী উচ্চারিত হতে পারে,—"না, আর সাম্প্রদায়িকতা নয়, এবার আমরা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে মেপে দেখ্‌ব, কে কোন্ সম্প্রদায়ের, সেই বিচারে আমাদের কোনো কাজ নেই।" স্বেচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, প্রাণের তাগিদে হোক্ বা অবস্থার ফেরে হোক্, ঠিক এই অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিমূলে এসে অধিকাংশ মানুষকে দাঁড়াতে হবে। বর্ত্তমানের ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্বেষ এমন পর্য্যায়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিকে ঝঞ্ঝাতাড়িত বৃক্ষপত্রের মত নিয়ে ঠেলে ফেলে দেবে, যেখানে রক্তগঙ্গার প্রবল স্রোতের মাঝে লক্ষ লক্ষ সদ্যঃছিন্ন নরমুণ্ড বিকট অট্টহাসি হাসতে হাসতে ভাস্‌তে থাক্‌বে আর বলতে থাক্‌বে, সমগ্র জীবৎ-কালটাই আমরা ভুল বুঝে এসেছিলাম, আজ মৃত্যুর পরে স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি যে, প্রকৃত মানুষ সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক চিন্তার ঊর্দ্ধে থাকে, সম্প্রদায়-বুদ্ধি মানুষকে উন্নততর সভ্যতার স্তরে ওঠ্‌বার বিন্দুমাত্রও সহায়তা আর কর্ব্বে না।

ব্রহ্মচর্য্যই মনুষ্যত্ব-লাভের পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মিলন বাঞ্ছনীয় মানুষে আর মানুষে। পশুর সাথে পশুর মিলন কখনো ঘটলেও তা' হবে ক্ষণভঙ্গুর, সাময়িক। মানুষের সঙ্গে মানুষের শাশ্বত মিলনের পথ আবিষ্কারই ছিল প্রাচীন কালের ঋষিদের এবং ঋষিতুল্য মহাপুরুষদের অন্তরের একমাত্র আকিঞ্চন। এই লক্ষ্য নিয়েই তাঁরা এক এক জনে এক একটা ধর্ম্মমতকে প্রচার করেছেন। কিন্তু পুকুরে যেমন পানা ও কচুরী দল বাঁধ্‌লে জল পঙ্কিল হয়, ঠিক তেমনি ধর্ম্ম জগতেও দল বাঁধলে দলগত সঙ্কীর্ণতা থেকে কতকগুলি পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়। কারো পঙ্কিলতা পরের উপরে জোর-জুলুমের প্রশ্রয় দেয়, কারো পঙ্কিলতা অপরকে ঘৃণা কত্তে প্ররোচনা যোগায়। তাই থেকে একদল আর এক দল লোকের উপরে হয় খাপ্পা এবং বংশানুক্রমে চলতে থাকে হিংসা আর প্রতিহিংসার বিচিত্র খেলা, অপরাধ যে কে কর্ম্ম, তার ঠিকানা নেই, অথচ নির্দ্দোষ নিরপরাধ লোকেরা হিংসার তাণ্ডবে প'ড়ে লাঞ্ছিত, নির্জ্জিত, ধর্ষিত ও উপদ্রুত হতে লাগ্‌ল। এই দুরবস্থার একমাত্র প্রতীকার, নিজেদের পশুত্বকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা এবং মানুষ হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। মানুষের প্রথম পরিচয় সত্যে, দ্বিতীয় পরিচয় চরিত্রে, তৃতীয় পরিচয় সরলতায়, চরম পরিচয় পরার্থে আত্মোৎসর্গে। এই জন্যই আমি সর্ব্বত্র নির্ব্বিচারে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছি। কেউ গ্রহণ করুক আর না করুক, ব্রহ্মচর্য্যই পশুকে মানুষ করার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, ব্রহ্মচর্য্যই

মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী সাধকের চরম ও পরম অবলম্বন, ব্রহ্মচর্য্য এলেই সত্যের উপরে আসে সহজ অধিকার, ব্রহ্মচর্য্য পালিত হ'লেই মনের কুটিলতা ঘুচে যায় এবং মানুষ হয় সরল, সুহাস এবং সুন্দর।

ব্রহ্মচারী দর্শনেও লাভ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃত ব্রহ্মচারীকে শুধু চখে একবার দেখ্‌লেও অনেক লাভ। তাঁর মুখের উপদেশ নাই বা মিলল, তাঁর হাতের লেখা চিঠি নাই বা পাওয়া গেল, চর্ম্মচক্ষে একবার যে তাঁকে দেখা গেল, তাতেই প্রাণে প্রাণে প্রেরণার সঞ্চার হয়। এজন্যই শাস্ত্র বলেছেন,—ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।

কোন্ গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান করিব

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি পর পর সাত জন গুরু করেছি। প্রত্যেকেই বলেছেন, ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ,—অর্থাৎ ধ্যান জমাতে হ'লে গুরুমূর্ত্তি ধ্যান কত্তেই হবে। আমি কি করব? কার মূর্ত্তিটী ধ্যান কর্ব্ব?

বহুমন্ত্র পরিত্যাগ কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার সাত জন গুরুই তোমাকে সাতটী আলাদা আলাদা মন্ত্র দিয়েছেন ত'? খুব ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু ধর্ম্মজগতের ছাদ মাত্র একটা স্তম্ভের উপরেই থাকে, সাধারণ পাঞ্চভৌতিক প্রাসাদের মতন তার ছাদ

অনেকগুলি স্তম্ভের উপরে থাকে না। সুতরাং সমস্যার প্রকৃত সমাধান কত্তে হ'লে তোমাকে সাতটা মন্ত্রের মধ্যে ছয়টা মন্ত্র পরিত্যাগ কত্তে হবে এবং সাতটার মধ্যে মাত্র একটা মন্ত্রকে নিয়ে কাজে লাগ্‌তে হবে। যাঁর দেওয়া মন্ত্রটী তোমার একমাত্র অবলম্বন হ'ল, গুরুমূর্ত্তি যদি ধ্যান কত্তেই হয়, তবে তাঁরই ধ্যান করা সঙ্গত হবে।

পুনঃ পুনঃ দীক্ষাগ্রহণ

প্রশ্ন হইল,—একজনের দীক্ষিত শিষ্যকে আবার আর একজন নূতন গুরু এসে দীক্ষা দেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এর কারণ অনেক হ'তে পারে। একজনের বিবাহিত স্ত্রীকে আবার আরেক জন এসে বিবাহ কত্তে পারেন কি? সঙ্গত ভাবে পারেন না। তবু এমন বিবাহ জগতে কখনো কখনো হয়। সমাজ এমন ব্যভিচার সহ্য কত্তে রাজী হয় না, তবু এমনটা হয়। সবাই জানে যে, কাজটা ভাল নয়, তবু হয়। ঠিক তেমনি একজনের দীক্ষিত শিষ্যকে আরেক জন গুরু এসে নূতন ক'রে একটা দীক্ষা দিয়েছেন, এরূপও হয়। যুক্তি দেখান হয় যে, লোকটার আগের দীক্ষায় ভুল ছিল, অসম্পূর্ণতা ছিল। এরূপ যুক্তিও দেখান হয় যে, লোকটী আগে দীক্ষামন্ত্রই নিয়েছে, শিক্ষামন্ত্র ত' নেয়নি, সুতরাং কেন আমি তার আর একটা কাণে আর একটা শিক্ষামন্ত্র ফুঁকে দেব না? যুক্তি দেখান হয় যে, আগের গুরু মরে গেছেন, সুতরাং আমাকে

আবার গুরু হ'য়ে নূতন একটা মন্ত্র দিতে হ'ল। যেন, কারো আগের স্বামী ম'রে গেলে একজনকে এসে নূতন ক'রে তার স্বামী হ'তেই হবে। সাধারণতঃ এসব যুক্তি প্রায় ক্ষেত্রেই কুযুক্তি। ওতে কর্ণপাত কত্তে নেই। প্রায়ই ত' লোকে হুজুগে প'ড়ে দীক্ষা নেয়, তাই এসব ঘটছে।

গুরুর সাধন-সিদ্ধ মন্ত্রই শিষ্যকে প্রদেয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেকের পক্ষে লোককে দীক্ষাদান একটা ব্যবসায় মাত্র। তবে ব্যবসায়টা খুব রেখে ঢেকে চতুরতার সহিত চালিয়ে যেতে হয়। ব্যবসায়ী দীক্ষাদাতাদের জীবনের নির্দ্দিষ্ট কোনও "মিশন" বা লক্ষ্য থাকে না। তাই তাঁরা যাকে যে মন্ত্র দিলে খুশী করা যায়, তাকেই সেই মন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং নিজেদের এই আচরণের সমর্থনে বলেন যে, দেখ, আমার মন কত উদার, যে যা চায়, তাকে তাই দেই, আমার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা নেই। কিন্তু দীক্ষাদাতার প্রকৃত কর্ত্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে এমন মন্ত্রটী দেওয়া, যেটীর তিনি নিজে সাধন করেছেন এবং আমরণ ক'রে যাবেন। গুরুর সাধন-সিদ্ধ মন্ত্র পেলে শিষ্যের যে কল্যাণ, শিষ্যের মনরাখার জন্য প্রদত্ত মন্ত্রে সে কল্যাণ কখনো হতে পারে না। এমন গুরুও আছেন, যিনি শিষ্যের মন রাখবার জন্য তিন সময়ে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র দান করেন এবং শিষ্যটীকে হাতের তালুতে আটক করেন। গুরু যেখানে শিষ্যের বন্ধন কাটবার সহায়তা কর্ব্বেন না, সেখানে তার গুরুত্ব বড়ই লঘু।

শিষ্য, গুরু ও পরমেশ্বর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সদ্‌গুরু শিষ্যের নিত্যসঙ্গী। সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রতিটী অভাবের পরিপূরক। সদ্‌গুরু শিষ্যের কেবল পথ-প্রদর্শক নন, তিনি শিষ্যের প্রকৃত স্বরূপ। শিষ্য যদি সদ্‌গুরুর ধ্যান সত্যই করে, তবে যেন সদ্‌গুরুই যে তার নিত্যস্বরূপ, সদ্‌গুরুই যে তার নিজস্ব অস্তিত্বে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, এই বোধে উদ্দীপিত হ'য়ে তাঁর ধ্যান করে। প্রায় সব গুরুদেবেরাই ত' বলছেন, আমাকে ধ্যান কর্, আমাকে পূজা কর্। কিন্তু শিষ্যের প্রকৃত মূরতিটী যে সদ্‌গুরুর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত অভিন্ন, এই বোধে পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে ধ্যানে বসতে বলছেন কৈ? শিষ্য, গুরু ও পরমেশ্বর ত' একটী নিত্যসৎ বস্তুরই তিনটী অবস্থা বা বিভাবের নাম।

হঠাৎ দীক্ষা নেওয়া পাগলামী মাত্র

সমাগত যুবকদের মধ্য হইতে একজনে প্রশ্ন করিল,—মনে করুন, আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিয়েছি। কিন্তু পরে দেখ্‌লুম, বড্ড ভুল ক'রে ফেলেছি। আপনার চেয়ে বড় মহাপুরুষ আমার পক্ষে অলভ্য নয়। সেই সময়ে আমার কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে জান্‌লে না, বুঝলে না, দেখ্‌লে না, বিচার ক'রে মূল্যায়ন কর্‌লে না, হঠাৎ দীক্ষা নিয়ে বস্‌লে। এটা ত' হবে একটা পাগলামী মাত্র। আর, দীক্ষা নিবার

পরে উপদেশানুযায়ী সাধন কর্‌লে না, খুঁজতে লাগ্‌লে যে দীক্ষাদাতা মহাপুরুষের চেয়ে আরো বড় মহাপুরুষ কোথায় মিলতে পারে, এ ত' হ'ল আর একটা পাগলামী। কিন্তু সত্য সত্যই যদি অভয়দাতা সেই মহান্ পুরুষকে পেয়ে যাও, যিনি তোমার সর্ব্ব-ভয়-বিদূরণকারী, সর্ব্ব-শঙ্কার বিনাশকারী, সর্ব্বত্রাসের অপহর্ত্তা এবং সর্ব্বাবনতির প্রতিরোধক পরম বান্ধব, তবে আমার জন্য আবার মায়া রাখ্‌বে কেন হে? আমাকে অযোগ্য ব'লে মনে হ'লে ছেঁড়া চটিজুতোর মত পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্কোচে চলে যাবে এবং এর পর থেকে আমার কথা বারংবার স্মরণ করার কদভ্যাসটী সযত্নে পরিহার কর্ব্বে। কারণ, এর পরে আমাকে আবার স্মরণ কত্তে গেলে ত' মনের মধ্যে নূতন নূতন দ্বন্দ্ব এবং ধোঁকার সৃষ্টি হবে। জীবনের পরম কৃতার্থতাই তোমার প্রকৃত লক্ষ্য হোক্, আমার পায়ের সঙ্গে তোমার টিকিটা বেঁধে রাখবার কোনো আবশ্যকতা নাই। আমার যে শিষ্য হয়েছে, তাকে আমার সংসর্গ পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবার অধিকার আমি দিয়েই রেখেছি। অবিশ্বাসী মন নিয়ে, অসন্তুষ্ট চিত্ত নিয়ে, অতৃপ্তির দুর্ব্বলতা নিয়েও তুমি জোর ক'রে আমার সঙ্গেই আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে, তোমাকে এমন একটী জড়-পদার্থ হ'তে আমি দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তুমি প্রয়োজন-বোধে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে পার।

প্রয়োজন হইলে কাটিয়া পড়

অন্য একজন প্রশ্ন করিলেন,—গুরুত্যাগী হওয়াতে তার অপরাধ হ'ল না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেই মুহূর্ত্তে গুরুতে অবিশ্বাস এল, অসন্তোষ এল, সেই মুহূর্ত্তে শিষ্যের শিষ্যত্ব কেটে গেল, গুরুর গুরুত্ব সরে গেল। সেই মুহূর্ত্ত থেকে এই দুজন ত' দুটী সাধারণ মানুষ, যাদের মধ্যে স্থায়ী কোনো বন্ধনই নেই। সুতরাং তখন শিষ্য যদি স'রে পড়ে, তবে এটা গুরুর পক্ষে এক মহাভাগ্য বলতে হবে। কেটে পড়ার অধিকার শিষ্যকে আমিই ত' দান কচ্ছি। সে গুরুত্যাগের অপরাধে অপরাধী হবে কেন? অন্য গুরুদেবেরা হয়ত এতে অপরাধ আবিষ্কার কত্তে পারেন, কিন্তু আমি তা' করি না। সমুদ্রের মত বিরাট আমার হৃদয় নিজের চলোর্ম্মিমালাতেই নিজে নন্দিত, দুজন দশ জন শিষ্য আমাকে ত্যাগ ক'রে জীবনের উৎকৃষ্টতর পথ বেছে নেবার চেষ্টা করেছে দেখলে আমি চঞ্চল হব কেন? প্রয়োজন হ'লে কেটে পড় না, আপত্তির কি আছে?

বেলেঘাটা
২৬শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
(১১ই জুলাই, ১৯৩৫)

রাম বল, বাঁচা গেল

গতকল্যকার যুবকটী পুনরায় শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে

আসিয়াছেন। রংপুর রওনা হইবেন বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত, তাই, কথা কহিবার অবসর বড় কম। যুবকটী নিজের সম্পর্কিত কথা বলিল। বিবরণটী এই যে, গতকল্য রাত্রে সে টেংরা অঞ্চলে সমাগত জনৈক সাধুর কাছে তিব্বতী যোগ শিখিতে গিয়াছিল। সাধু তাহাকে যোগের উপদেশ না দিয়া অন্যরূপ উপদেশ দেওয়াতে সে ঘরে ফিরিয়া আসে। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে দেখিতে পায় যে, সমস্ত বস্তি জুড়িয়া আগুন লাগিয়া গিয়াছে। যদিও যুবকটীর নিজের বাড়ী খড়ের বা খোলার তৈরী ছিল না, তবু চতুর্দ্দিকের আগুনের তাপে বাড়ীটীর সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এখন আর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া ভাড়াটের আর উপায় নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—রাম বল, বাঁচা গেল। যাদের সঙ্গ কিছুতেই ছাড়তে পাচ্ছিলে না, এবার তারা নিজেরাই অন্য পাড়ায় গিয়ে বাড়ী ভাড়া করবে। আর কিন্তু তাদের সঙ্গে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা ক'রো না। ভগবান এভাবে নিষ্ঠুর দয়া খুব কম স্থলেই ক'রে থাকেন। আর একটী কথা। তিব্বতী যোগ শিক্ষার নাম ক'রে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টাটি আর ক'রো না। একটা আপদ থেকে রক্ষা পেয়ে আবার সেধে গিয়ে আর একটা আপদে পড়বে কেন?

যুবকটী বলিল,—তাহার কাছে আরও গুরুতর একটী দুঃসংবাদ আছে। সাজাহানপুর হইতে তাহার বাবা টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, তাহার মাতৃদেবী গুরুতর পীড়িত। তাকে দ্রুত কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে।

নূতন বিপদ ডাকিয়া আনিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—প্রার্থনা করি, তোমার মা দ্রুত সুস্থ হউন। তবে আশ্চর্য্য হ'য়ে স্বীকার কত্তে হয় যে, ভগবান্ তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন। আশক্তির আধারভূতা স্ত্রীলোকটীর সংশ্রব ত্যাগ কত্তে পাচ্ছিলে না, কিন্তু ভগবান্ অগ্নিকাণ্ড দিয়ে তাদের সরালেন। তথাপি অন্তরের ভিতরে যৌন কামনা নানা ছলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে স্ত্রী সংশ্রব-যুক্ত সাধন-বিশেষের প্রতি কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলে, ভগবান্ তোমাকে সাজাহানপুরে রওনা করিয়ে দিচ্ছেন। এখন হ'তে শক্ত ক'রে কোমর কাছ, যেন সেখানে গিয়ে আবার আর একটা উপলক্ষ ক'রে যৌন চর্চ্চাতেই না ভিড়ে পড়। ভগবান নিজ হাতে অনেক সময়ে পতনের পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে আনেন কিন্তু বৃথা কৌতূহল, অকারণ ঔৎসুক্য প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য ক'রে মূর্খ মানুষগুলি আবার নূতন বিপদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানচর্চ্চা কচ্ছি, ধর্ম্মাচরণ কচ্ছি বা পরোপকার কচ্ছি ব'লে মনকে প্রবোধ দিয়ে কত জনে দিবারাত্রি শুধু কামচর্চ্চাই যে কচ্ছে, তার তারা হিসাবও রাখে না।

কাম শুধুই রিপু নয়, সে শক্তিও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাম তার সর্ব্বশক্তি নিয়ে মনুষ্য-শরীরের প্রত্যেকটা জীবকোষের মধ্যে, প্রত্যেকটা অণুপরমাণুতে নিজ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা অনুক্ষণ ক'রে যাচ্ছে। তার

উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষটীর সর্ব্বনাশ হোক। কামের উদ্দেশ্য শুধু এই মাত্র যে একটী মানুষ সহস্র মানুষ-রূপে আত্মপ্রকাশ করুক, কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিত্য নূতন জীবে ভ'রে যাক্। নীরব একাকিত্বের মাঝে কামের তৃপ্তি নেই, কাম চায় দিকে দিকে নব নব জনতার নব নব কলরব। অর্থাৎ কাম হচ্ছে পরমেশ্বরের সৃজনী-শক্তি। এই শক্তিকে তুচ্ছ ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে প্রত্যাহৃত ক'রে এককেন্দ্রিক কত্তে পারলে তপস্যার ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে, তার আলোকে জগজ্জোড়া অন্ধকার চিরতরে দূর হ'য়ে যাবে, জন্ম-মরণ-দুঃখের ঘূর্ণিপাক নিবারিত হবে। কাম তখনি রিপু, যখন তুমি তার অধীন, সে তোমার প্রভু। কাম তখনই প্রচণ্ড এক শক্তি, যখন সে তোমার অধীন, সে তোমার ইচ্ছানুসারী ভৃত্য। কামকে ভয় করবার কিছু নেই কিন্তু অকারণে তার চর্চ্চা করো না। এই ব্যাপারে সাবধান হ'য়ে যাও।

রংপুর

২৭শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৪২

(১২ই জুলাই, ১৯৩৫)

রায়-বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুষ্পবাটিকাতে শ্রীশ্রীবাবামণির স্থিতিস্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

রুগ্ন মনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ

প্রাতে প্রায় নয়টার সময়ে একজন যুবক আসিয়াই ঘরে ঢুকিল এবং বিনা আড়ম্বরে কথারম্ভ করিয়া দিল। বলিল,—শুনেছিলাম, আপনাকে দেখলেই মানুষের মনে ভক্তির ভাব

আসে। কৈ আমার ত' তা' এল না। আপনি রংপুরে আসবেন শুনে কাল রেলষ্টেশানে আপনাকে দেখবার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু রাত্রিকাল ব'লে ঠিক মত দেখতেও পাই নি, আর আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যে সব হোমরা-চোমরা লোকেরা গিয়েছিলেন, তাঁদের ভীড় ঠেলে কাছেও যেতে পারলুম না। কিন্তু মশায়, আজকে আপনাকে দেখে কিন্তু আমার একটুকুও ভক্তিভাব এল না। কেন বলুন দেখি, লোকে আপনার সম্পর্কে এত মিথ্যা কথা প্রচার করে? আপনাকে দেখ্‌লেই নাকি মনপ্রাণ আপনা আপনি শীতল হ'য়ে যায়। কৈ, আমার ত' মন প্রাণ শীতল হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকটিকে সাদরে বসিতে দিলেন। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—তোমার অন্তর-ভরা জ্বালা আর বেদনা। প্রাণে তোমার স্বস্তি নেই। কোথাও তুমি সুখের আশ্বাস পাচ্ছ না। অভিলষিত বস্তু কিছুতেই লাভ কত্তে পাচ্ছ না ব'লে তোমার মনে ক্ষোভের অন্ত নেই। যার অন্তরে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, সে মানুষকে দেখে ভক্তিভাবে আপ্লুত হ'তে পারে না ত'। তার মনে কেবলি সন্দেহ জাগে, তবে ত' অন্য মানুষগুলি কেবল লোক ঠকিয়েই খাচ্ছে। বল, তাই কি না!

যুবকটী একটু নড়িয়া চড়িয়া চেয়ারখানার উপরে বেশ শক্ত হইয়া বসিল। বলিল,—হাঁ, আমরা জানি যে, আপনারা খুব ভাল ভাল মুখস্থ-করা বুলি বলতে পারেন এবং ঐ সকল বচনের

মাধুরী দিয়ে সরল-প্রাণ লোকদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খান। আপনাদের ভক্তি করা চলে না। আপনাদের প্রতি ভক্তিভাব আসা অসম্ভব। আমি কি ভুল বল্‌ছি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার কথা মিছে নয়। তুমি ভুলও বল্‌ছ না। তবে একটা কথা ভুলে যাচ্ছ যে, তোমরা আমাকে ভক্তি করবে, এটা আমার লক্ষ্য নয়। তোমাদের প্রত্যেককে আমি ভালবাসতে পারব, স্নেহ কত্তে সমর্থ হব, এটাই আমার লক্ষ্য। তোমার প্রতি স্নেহ পোষণ কত্তে গিয়ে যদি আমাকে গালমন্দ খেতে হয় হাসিমুখে খাব। তোমার কাছ থেকে ভক্তি আদায়ের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে দেখতে ত' পাচ্ছ যে, আমি অনেকক্ষণ ধ'রে এক তাড়া চিঠির জবাব দিতে বড়ই ব্যস্ত। আমাকে এখন নিজের কাজটী কত্তে দিতে হবে। তুমি মিনিট কুড়ি নীরবে ব'সে অপেক্ষা কর, আমি হাতের কাজটুকু সেরেই আবার তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ব।

এমন সময়ে দেখা গেল, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ব্যস্ততার সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—অরুণ, তুই এখানে এসেছিস্ পালিয়ে!

ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিতেই সমাগত ভদ্রলোক বলিলেন যে, তাঁর নাম মণিভূষণ তালুকদার, তাঁর ছেলেটী মস্তিষ্ক-রোগগ্রস্ত বিধায় ছেলেকে শিকল বাঁধিয়া ঘরে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল, কাল সন্ধ্যার সময়ে সে কি করিয়া পলাইয়া যায়, সারারাত্রি তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই, এবং নানা

স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া এই পথ দিয়া ঘরে ফিরিবার মুখে শরৎ বাবুর পুষ্পবাটিকায় ছেলেকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া নিতে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আমি মস্তিষ্ক রোগেরই চিকিৎসক। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই ভাল হবে, ভাব্‌বেন না।

যুবকটী গৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যে সব উক্তি করিয়াছিল, তাহারই পুনরুক্তি করিয়া যাইতে লাগিল। যুবকের পিতা বলিলেন,—থাম্, থাম্। কার সঙ্গে এসব অসদুক্তি কচ্ছিস, জানিস্ না। পায়ে পড়্, ক্ষমা চেয়ে নে।

ভদ্রলোক নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া নিজেই বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা ও লজ্জাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতেই এত লজ্জা অনুভব কচ্ছেন। দিন এল ব'লে যখন মাতা, পিতা, গুরুজন, শিক্ষক, আচার্য্য, সাধু, সজ্জন এদের কেউ যুবকদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। যে ভাবে পাশ্চাত্য শক্তিবাদ পাশব উন্মত্ততার পরিপোষক-রূপে আস্তে আস্তে এদেশে ছড়াচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতের যুবকেরা বিদেশের ইঙ্গিতে স্বদেশের সবকিছু ভাল জিনিষ নষ্ট ক'রে দেবার জন্য তাণ্ডব সুরু কর্ব্বে। আজ আমরা নিজেদিগকে ইংরেজের অধীন ব'লে কত হেয় জ্ঞান করি, কাল বা পরশু বা তারও কিছু পরে আমরা হয়ত বিদেশের চিন্তাশীল নায়কদের মননশীলতার ক্রীড়নক হ'য়ে নিজেদের হাতে

নিজেদের সর্ব্বনাশ কর্‌ব। আমাদের চোখের সামনে আমাদের মায়ের সম্মান, বোনের সম্মান নষ্ট হ'লে হয়ত তখন কাঁদব না, বল্‌ব—বিশ্বমানবতার জয় হোক্। উদ্ধত বিশ্বমানবতা তখন পশুশক্তির অধিকারীদের অন্যায় অত্যাচারগুলি চোখের উপরে দেখে সহ্য ক'রে নেবে আর মানবিকতার স্বাভাবিক আবেদনকে চোখ বুজে অগ্রাহ্য করবে। সমস্যাটা এক জনের জন্য নয়, একটা সমাজের জন্য নয়, একটা মাত্র জাতির জন্য নয়, সমস্যাটা সমগ্র পৃথিবীর। কিন্তু এ উন্মত্ততা একদিন নিশ্চয়ই থাম্‌বে এবং তা' থামাবার মন্ত্র আমাদের প্রাচীন ঋষিরা উপনয়ন-কুটীরে ব'সে নবাগত শিষ্যের কর্ণে লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ঢেলেছিলেন, পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি—এগুলিই রুগ্ন মনের বিকার বিদূরণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

উপবীত প্রাচীনের অবদান

ইতিমধ্যে আর একজন ভদ্রলোকও শ্রীশ্রীবাবামণির কুটীরে আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—উপবীত ধারণ করাটা কি সমাজের মধ্যে বিভেদ-বুদ্ধি সৃষ্টির একটা শক্তিশালী হাতিয়ার নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঋষিনন্দনেরা প্রথম যুগে যখন গুরুগৃহে গিয়ে স্কন্ধে উপবীত ধারণ করেছিলেন, তখন এ চিন্তা তাদের ছিল না যে, "আমরা একটা নূতন জাতি হ'লাম। এখন আমরা অন্য জাতিগুলির উপরে কর্ত্তৃত্ব ক'রে বেড়াব।" তাঁদের

লক্ষ্য ছিল পরম জ্ঞান আর তা' লাভের উপায় ছিল প্রধানতঃ ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয়তঃ স্বাধ্যায়, তৃতীয়তঃ বিদ্যার অনুশীলন, শেষতঃ গুরুগৃহে বাস-কালে নিজেদের অন্ন নিজেরা অর্জ্জন। সমাজ-জীবনে কার কি স্থান বা অধিকার হবে, সেই চিন্তা ত' গুরুগৃহ ত্যাগ ক'রে গার্হস্থ্যে প্রবেশের পর। একদা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করা হয়েছিল, উপবীত তার চিহ্ন বা স্মারকসূত্র মাত্র। সমাজ জীবনে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার ছাড়পত্র বা লাইসেন্স এটি নয়। এই কথাটুকু মনে রাখলে, ভারতের পরবর্ত্তিকালে রাষ্ট্রনৈতিক দুর্গতির দিনগুলির অবস্থা কতকটা বুঝা যাবে। একদল নিতান্ত গোঁড়া লোক সর্ব্বপ্রকার বিপত্তির সম্ভাবনার মধ্য দিয়েও এই ক্ষুদ্র কয়েকটী কার্পাসের সূত্র স্কন্ধে ধারণ ক'রে এসেছিল ব'লেই আজ আমরা অতীতের অনেককালের পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের নবতম ধ্যান-ধারণাগুলির একটা সম্বন্ধ খুঁজে বের কত্তে পাচ্ছি। বৌদ্ধ প্রচারকেরা যেমন ক'রে কোনো কোনো প্রান্তে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে উপবীতহীন কত্তে পেরেছিলেন, ভারতের সব প্রান্তে যদি তদ্রূপ সফলতা তাঁরা অর্জ্জন কত্তেন, তাহ'লে সমগ্র ভারতেই এমন এক অনুশীলন ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত হ'য়ে যেত, যাদের মূলানুসন্ধান ক'রে কিছুই পাওয়া যেত না প্রাচীন ভারতের অবদান-রূপে। অতীব প্রাচীন এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ভারতবর্ষ তার প্রাচীনত্ব থেকে বিচ্যুত হ'ত। ব্রাহ্ম-প্রচারকেরা ব্রাহ্মণের উপবীতকে ভয় পেয়েছেন, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখেছেন

কিন্তু ঐ তিনদণ্ডী সূতোর ভিতরে আমি প্রাচীন গঙ্গার, প্রাচীন যমুনার, প্রাচীন সরস্বতীর জলধারাকে আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীনের জল-কল্লোলের কুলুকুলু সঙ্গীত তার মাঝে শুনতে পাচ্ছি। তারই জন্য আমি জাতিভেদ-প্রথার সমর্থক না হয়েও উপবীত ধারণের প্রথাটীর উপরে শ্রদ্ধান্বিত। কয়েকজন ভট্টাচার্য্য আর চক্রবর্ত্তী শিরশ্ছেদের ভয় অগ্রাহ্য ক'রেও উপবীত টুকুকে আঁকড়ে ধ'রে মরিয়া হ'য়ে প'ড়ে প'ড়ে মার খেয়েছিলেন ব'লেই আজ আমরা প্রাচীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহচ্চিন্তাগুলি যে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের অবদান, তা বুঝতে পাচ্ছি, তা' স্বীকার কচ্ছি, তাতে গর্ব্ব ও গৌরব বোধ কচ্ছি। যাদের বংশের মধ্যে উপবীত ধারণ একটা প্রথা-রূপে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে, এই জন্যই তাদের আমি বলি না যে পৈতে ছিঁড়ে ফেল, এই জন্যই তাদের বরং বলি, প্রথাটা এত প্রাচীন, যে যুগের অনেক সত্য এখন আঁধারে আবৃত, কিন্তু এত প্রাচীনতা সত্ত্বেও সমগ্র আঁধার-পুঞ্জ ভেদ ক'রে যজ্ঞসূত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে বলছে, "আমি প্রাচীন আমি আছি, আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস, আমি ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাই নি।" সুতরাং যাদের উপবীত গ্রহণের প্রথা আছে, তারা সেই প্রথাটুকুর সম্মানই করুক। যাদের মধ্যে এই প্রথাটুকুর চল নেই, তারাও কখনো উপবীত গ্রহণ ক'রে ব্রহ্মচর্য্য-পালনকে জীবন-ব্রতের মূলদেশে স্থাপন কর্ব্বে কিনা, তা' সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের নিজ নিজ সমাজের সামূহিক আন্দোলন ও মঙ্গলেচ্ছার উপরে। নূতন প্রবর্ত্তন আমার কাজ নয় কিন্তু যা-

কিছু পুরাতন, তাকেই বিনা বিচারে বিনষ্ট করাও আমার কাজ নয়।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রলিখনে মনোনিবেশ করিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা ও শত্রুতা

দিনাজপুর জেলান্তর্গত বিরল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি সকল মানুষের প্রতি সমান দরদী। আমার চোখে সাম্প্রদায়িক চশমা নাই। সাম্প্রদায়িকতার সর্ব্বপ্রধান দোষই হইল এই যে, সকলের স্রষ্টা পরমেশ্বরের চেয়েও মানুষের সৃষ্ট সম্প্রদায় অনেক সময়ে বড় বলিয়া অনুভূত হয় এবং সাম্প্রদায়িকতার তাড়নে পরমেশ্বরের সৃষ্ট জীবকে নিরর্থক ক্লেশে ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত করা হয়। জগতে সম্প্রদায়-সমূহ চিরকালই থাকিবে, কারণ সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে ইচ্ছানুশীলনেরও একটা ব্যাপক সুফল আছে। অনেকে মিলিয়া এক মতে এক পথে চলে বলিয়াই ত' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। জনে জনে ভিন্ন মতে ভিন্ন পথে চলিলে জগতে কদাচ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সম্ভব হইত না। একটা ভাবের, একটা আদর্শের, একটা প্রশংসিত সংপন্থার লোকেরা একত্র হইয়া নিজেদের চিন্তা, কর্ম্ম ও সেবার সঙ্ঘবদ্ধ অনুশীলন সুরু করিয়া দিলেই দেখিতে না দেখিতে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিয়া যায়। সম্প্রদায় একটা গণ্ডী, গণ্ডীবদ্ধ হইবার ভিতরে আত্মরক্ষার সচেতনতা থাকে বলিয়াই এই গণ্ডীর

প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু গণ্ডী যখন মানুষকে মানুষের শত্রু করে, তখন ইহার কোন্ সার্থকতার কথা কলকণ্ঠে প্রচার করিব? নানা সম্প্রদায়ের জগতে নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, নতুবা এত সম্প্রদায় হইতে পারিত না কিন্তু এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের শত্রুতা করিবেই করিবে, ইহা আরণ্য বর্ব্বরতারই পরিচায়ক। উদ্যানে নানা বৃক্ষ থাকে, প্রত্যেকটী অপরগুলির সৌন্দর্য্য বাড়ায়, অরণ্যে বহু বৃক্ষ-লতাকণ্টকগুল্ম থাকে কিন্তু এক এক সময়ে এক একটা শত শত প্রতিবেশী বৃক্ষের বা লতার অহিত সম্পাদন করিয়া নিজেকে বাড়ায়।"

পিতৃমাতৃ-সেবায় উদাসীন থাকা পাপ

রাজশাহী জেলান্তর্গত দুর্গাপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পিতৃমাতৃসেবা করিবে না, দেশের সেবা করিবে, জগতের সেবা করিবে, এই জাতীয় বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিব না। জগদ্‌বাসীর সেবা, স্বদেশের সেবা অবশ্যকরণীয় কিন্তু সাধ্যমত পিতৃমাতৃসেবাও করিতে হইবে। ইহা বর্জ্জনীয় নহে। পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার অভাব সন্তানের পক্ষে এক প্রকারের পশুত্ব। যে সন্তানের জীবন-কর্ম্ম যাহাই হউক, পিতৃমাতৃ-সেবাকে সাধ্যমত মর্য্যাদা দিয়াই চলিবার চেষ্টা আবশ্যক। এমন সকল অবস্থা অবশ্য আছে, যে সময়ে সন্তান পিতামাতাকে সেবা করিতে চাহিলেও সেবা সেখানে গিয়া পৌছে না, কিন্তু সেই সকল অসাধারণ অবস্থার কথা ছাড়িয়া দাও। তুমি স্ফূর্ত্তি করিয়া,

বাবুগিরি করিয়া বিলাসিতা করিয়া পয়সার অপচয় করিবে আর বলিবে, মাকে বাবাকে খাইতে দিবার আমার কোন্ দায়িত্ব, ইহা হৃদয়হীন বর্ব্বরের উক্তি বলিয়া মনে করিতে হইবে। দেশকে, জাতিকে, জগৎকে যে সেবা দান করিবে, তাহা পরোক্ষ ভাবে পিতামাতার কাছেও পৌঁছিবে কিন্তু পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে সেবা দিবার যেখানে প্রয়োজন, সেখানে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও উদাসীন থাকা পাপ।"

মানুষের মত মানুষ

চাঁপাপুর (বগুড়া)-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আশীর্ব্বাদ করি, মানুষের মত মানুষ হও। মানুষের মত মানুষ অপর মানুষকে অবজ্ঞা করে না, ঘৃণা করে না, দুর্ব্বলকে পদদলিত করে না, অক্ষমকে নিষ্পেষণ করে না, নিজে কুকার্য্য করে না, অন্যকে কুকার্য্যে উৎসাহিত করে না। এইগুলি তাহার নিষেধাত্মক গুণ। তার পক্ষে অবশ্যমেব পালনীয় কর্ত্তব্য হইতেছে, নিয়ত নিঃস্বার্থ থাকিয়া পরোপকারে ব্রতী হওয়া, পরনিন্দা বর্জ্জন করা, নিন্দকের ও পরদূষকের সঙ্গ বর্জ্জন করা, মানবের অন্তরের শুচিতা ও পবিত্রতা বর্দ্ধনের কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং সর্ব্বজীবকে ভালবাসা। জোর করিয়া এই ভালোবাসা আনা যায় না এ ভালবাসা আসে নির্ভেজাল ঈশ্বর-প্রেম হইতে। ভগবান্ সম্পর্কে তোমার দার্শনিক চিন্তাধারা যাহাই হউক, স্মরণ, মনন ও অনুধ্যানের দ্বারা তাঁহার প্রতি তোমার অন্তরের প্রীতি বর্দ্ধিত

হইবে। ভগবানকে ভালবাসিলে ত' দেখিতে পাইবে বিনা চেষ্টায় তোমার ভালবাসার ভাণ্ডার অফুরন্ত হইয়াছে এবং প্রতি জনে এই ভালবাসা আপনা-আপনি ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাহাকে ভালবাসিলে, তাহাকেই আপন করিয়া পাইলে। বিশ্বময় যাহার ভালবাসা, সমগ্র বিশ্ব তাহার আপন। সমগ্র বিশ্ব যাহার আপন, সে-ই মানুষের মতন মানুষ। চরিত্রকে অক্ষত রাখিতে চেষ্টা করিও, পুরুষকারের পক্ষে যতটা সাধ্য, ততটা চেষ্টা করিয়া চলিও নিজেকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য। কুসঙ্গ আর কুচিন্তা তোমাকে যাহাতে কদাচ গ্রাস না করিতে পারে, তাহারই জন্য তোমাকে ভগবৎ-প্রেমিক হইতে হইবে। ভগবানের নামে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিলে শরীর ও মনের সকল অপরিচ্ছন্নতা তোমাকে সভয়ে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। যেইটুকু শক্তি ও চিন্তাশীলতা দ্বারা অসৎ বিষয়ে বারংবার অভিনিবেশ প্রদান করিতেছ, তাহার দশগুণ শক্তি ও চিন্তাশীলতাকে তোমার গতিকে ঊর্দ্ধমুখী করিবার জন্য প্রয়োগ কর। হতাশা ও আত্ম-অবিশ্বাসকে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ কর। সমগ্র মানবজাতির প্রতি তোমার সুমহৎ কর্ত্তব্য-সমূহ আজও অসম্পাদিত অবস্থায় রহিয়াছে। সেগুলির সুসম্পাদন সম্ভব করিবার জন্যই তোমাকে সরল, সবল, দৃঢ় ও ধৈর্য্যশীল হইয়া প্রতি পদে কেবল আগাইয়া যাইতে হইবে। তুমি মানুষের ঘরে জন্মিয়াছ, তোমাকে প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে। পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধতায় ক্ষণকালের জন্যও হতোদ্যম বা নিরুৎসাহ হইও না।"

মিলিয়া কাজ কর, কাজ করিয়া মিলিত হও

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত ডেম্‌রা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকলে মিলিয়া কাজে লাগিলে কাজে সফলতা না আসিয়া পারে না। এই জন্যই জাতি-ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়াইয়াও মানুষকে অন্য লোকদের সহিত পরিচয়, সহযোগ ও আদান-প্রদান সৃষ্টি করিতে হয়। কত মানুষের সঙ্গে আমার বা তোমার কতগুলি বিষয়ে কি রকম পার্থক্য রহিয়াছে, সেই চিন্তা ও বিচার ছাড়িয়া দিয়া, তোমার আর আমার মধ্যে মিলনের সেতুটী কোথায়, তাহা খুঁজিতে হয়। মিলন-সূত্র যতই ক্ষীণ হউক, যদি তাহাকে ছিন্ন হইয়া যাইবার সুযোগ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিবাজীর ইন্দুর-বাহিত সূত্র একটী দড়িতে পরিণত হইতে এবং সাধারণ দড়ি শক্ত ও মোটা কাছিতে পরিণত হইতে অধিক সময় লাগিবে না। * মানুষের সহিত মানুষের মিলন-সূত্রগুলি খুঁজিয়া লইতে

---

* কথিত আছে শিবাজী কোনও পার্ব্বত্য দুর্গ জয় করিবার প্রয়োজনে একটী ইন্দুর বা নেউলের পায়ে সূক্ষ্ম সূত্র পরাইয়া তাহাকে শত্রুর দুর্গে প্রেরণ করেন এবং সূক্ষ্ম সূতার সহিত মোটা সূতা, মোটা সূতার সহিত দড়ি, সাধারণ দড়ির সহিত কাছি বাঁধিয়া ঐ কাছি বাহিয়া দুর্গে প্রবেশ করেন এবং দুর্গ জয় করেন।

চেষ্টার ত্রুটি করিও না। আর একটী কথা এই যে, কেবল হৈ-চৈ করিয়া কাজ হয় না; সকলকে সত্য সত্যই কাজে নামিতে হয়। সকলেই যদি আসল কাজে উদাসীন থাকে অথবা সকলেই যদি কেবল কথার দাপটে দুনিয়া উড়াইতে থাকে, তাহা হইলে কাজ হয় না। কাজ করিতে হইলে পরিশ্রম করিতে হয়। সেই পরিশ্রম কেবল কণ্ঠের নহে, রসনার নহে, দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, চিত্ত, বুদ্ধি, শুভাশুভ-জ্ঞান, নিত্যানিত্যবিবেক—সব কিছুরই পরিশ্রম। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশক্তি নিয়া সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বরকে প্রীত করিতেছ, এই ধ্যান রাখিয়া সকলে মিলিয়া কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। আমি একাই সব করিব, একথা হয়ত কোন্ এক সত্য যুগে খাটিলেও খাটিতে পারিত। এই কলিযুগে, সকলে মিলিয়া কাজের অনুশীলনে না লাগিতে পারিলে কর্ম্মসিদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। সকলে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস আয়ত্ত না করিলে নিজেদের মধ্যে প্রকৃত সহযোগ-বুদ্ধির উদয় হয় না এবং এই অবহেলার ফলে মানুষ কেবল কথা কহিয়া কহিয়া খুব-কিছু করিয়া ফেলিল বলিয়া মিথ্যা আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিবার ফাঁকা চেষ্টা করে। মিলিত হইয়া কাজ কর, কাজ করিয়া মিলিত হও। একক কাজ শুধু ব্যক্তিগত ঈশ্বর-সাধনায়, অন্য সকল স্থানে মিলনেরই জয়-জয়কার।"

নিবিড় ঐক্য, মহৎ লক্ষ্য ও চরিত্র

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত মির্জ্জাপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পর্কে প্রতি জনে সদা সর্তক থাকিবে। সকলের শক্তি যদি নিবিড় ঐক্যের মধ্য দিয়া কোনও মহৎ লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয়, তবে তাহার সাফল্য কেহ কদাচ রুদ্ধ করিতে পারে না। ঐক্য হইবে নিবিড়, লক্ষ্য হইবে মহৎ,—এই দুইটী সর্ত্তই পূরণ করিতে হইবে। লক্ষ্য হইল অসৎ আর ঐক্য হইল নিবিড়,—ইহাতে অনর্থেরই সৃষ্টি হইবে। ঐক্য হইল শিথিল ও নির্ভরের অযোগ্য, আর লক্ষ্য হইল মহৎ,—ইহা কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে বিঘ্নজনক হইবে। কি তোমার লক্ষ্য, ইহা আগে স্থির করিয়া লও। লক্ষ্যহীন মানবের হস্তপদের আস্ফালন শুধুই ক্লান্তি সৃষ্টি করে, আর কোনও লাভ ইহাতে নাই। সকলের লক্ষ্য যখন এক হয়, তখনই কর্ম্ম-সংসিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত ঐক্য আসিতে পারে। সাময়িক উত্তেজনায় একলক্ষ্য ব্যক্তিরা অনেক বড় বড় আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটাইয়া দেয় কিন্তু তাহাদের ঐক্য চরিত্র-বল-ভিত্তিক না হইলে, লক্ষ্য-লাভের পরক্ষণেই সমগ্র সংগঠনে ঘুণের আক্রমণ সুরু হইয়া যায়। ঐক্য যতই নিবিড় হউক, লক্ষ্য যতই মহৎ হউক, তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে চরিত্রের বনিয়াদে। চরিত্র আদর্শচ্যুত হইতে বাধা দেয়, চরিত্র বিশ্বাসঘাতক হইতে দেয় না, চরিত্র মেরুদণ্ডকে সরল রাখে, চরিত্র বাঁকা পথে পাদচারণা রুদ্ধ করে।"

রংপুর
২৮শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৪২
(১৩ই জুলাই, ১৯৩৫)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্য

স্থানীয় একটী জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক আসিয়া ধরিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণিকে একটী বক্তৃতা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখন বক্তৃতা দান চল্‌বে না। হাজারিবাগেই ডাক্তার আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানে সে কথাটা রাখতে পারি নি। দেখ্‌লাম শ্রোতা হয় না। জিদ চেপে গেল। শেষটায় ত' শ্রোতা শ্রোতায় জনারণ্য হ'য়ে গেল। কিন্তু তার পরেই ঠিক করেছি যে, আগামী ২৮শে জুলাই ১০ই শ্রাবণের আগে কোনো বক্তৃতা দেওয়া হবে না।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি বাবা ততদিন এখানে থাক্‌বেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—থাকাই সম্ভব। শরৎ বাবুর আতিথ্য এমন আন্তরিক যে, এখানে একমাস কেন, এক বছর থাক্‌তেও বোধ হয় কারো অনিচ্ছা হ'তে পারে না। সরল, অনাড়ম্বর সব সুব্যবস্থা, এমন কি আমার চিঠি লিখবার খাম-পোষ্টকার্ড পর্য্যন্ত টেবিলের উপরে থরে থরে সাজানো রয়েছে। একদিকে তাড়ার পর তাড়া চিঠি শেষ হচ্ছে, অন্য দিকে তাঁর লোক ডাকঘর থেকে দশ বিশ টাকার খাম-টিকিট আনি এনে

হাজির ক'রে দিচ্ছে। এমন আতিথেয়তা সত্যই দুর্ল্লভ। আমাকে খেতে দিলে যে আনন্দ, ডাকটিকিট দিলে তার শতগুণ আনন্দ।

ভদ্রলোক বলিলেন,—থাক্‌বার জায়গাটীও বড় চমৎকার।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চারিদিকে কেবল ফুল আর ফুল, কত গোলাপ, কত গন্ধরাজ, কত রজনীগন্ধা আর কত বেলী ফুল। মনটা আমার যেন মৌমাছির মতন ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি যদি কবি হ'তাম, তা' হ'লে এখানে ব'সে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখে মনটার আশা মিটাতাম।

কথার কবিতা নয়, কাজের কবিতা

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনি যে একজন কবি, একথা কিন্তু আমাদের অজানা নয়। আপনি এ শহরে আসার অনেক আগে আপনার লেখা গান এ শহরে পৌঁছে গেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—পৌঁছে গেছে?

ভদ্রলোক বলিলেন,—হাঁ, পৌঁছে গেছে। আপনার "মা হ'য়ে তুই আয়", "ওঙ্কারে বীণা বাজে রে", "নমামি মাতৃভাষা", "অনেক কিছু চাইনি প্রভু" এসব গান এই শহরের বহু গানের মাষ্টার তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত শেখাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু কথার কবিতা কবিতাই নয়। প্রকৃত কবিতা হচ্ছে কর্ম্মের কবিতা। সে কাজগুলি কোথায়,

যেগুলি দেখ্‌লে মানুষ অবাক্ হ'য়ে ব'লে বস্‌বে, বাঃ এ যে কবিতা, এ যে কাব্য, এ যে প্রেমমধুময় অজানার বারতা? কাজের কাজ কিছু কর্‌লুম না, কেবল দুটী গান লিখলুম, আর আমি কবি হ'য়ে গেলুম?

দুগ্ধ দ্বারা চরণ-ধৌতি

এই সময়ে একটী ভদ্রমহিলা গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইনি রাস্তার ওপারে রায় বাহাদুরের অন্তঃপুরে প্রথমে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে শরৎ বাবুর সহধর্ম্মিণী নির্ম্মলাদেবী তাঁহাকে সোজা পুষ্প-বাটিকায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। মহিলাটী প্রণাম করিয়া বলিলেন, বাবা, আমি আপনার চরণ-যুগল দুগ্ধ দ্বারা ধৌত করব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না মা, তা' হতে পারে না। এতে আমি রাজি হ'তে পারি না।

মহিলাটী বলিলেন,—আমি যে আশা ক'রে এসেছি বাবা। আমাকে নিরাশ কর্ব্বেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না মা, তা' হয় না। যে দেশে হাজার হাজার শিশু পানীয় দুগ্ধের অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করে, সে দেশে ধর্ম্ম-কর্ম্মের নাম ক'রে তোমরা আমাদের চরণ ধৌত কর্ব্বে দুগ্ধ দিয়ে, এ হ'তে পারে না। বরং এই দুধটুকু নিয়ে কোনো মাতৃহীন শিশুকে পান করাও, তাতে তোমার পুণ্য বেশী হবে। সাধুকে সম্মান করার জন্য যদি দুগ্ধ ঢেলে আমার

পদসেবা করার তোমার আগ্রহ হ'য়ে থাকে, তবে জানবে, তোমার প্রদত্ত সম্মান আমি প্রাপ্যের অতিরিক্ত পেয়ে গেছি। আর পুণ্য লাভের জন্য যদি এ সঙ্কল্প করে থাক, তবে জানবে মাতৃহীন শিশুকে বা অনাথ দুর্ব্বল রোগীকে এই দুগ্ধটুকু পান করালে শতগুণ পুণ্য তোমার হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি অনামিকা দ্বারা দুগ্ধটুকু স্পর্শ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা নিজ ভ্রূমধ্যে একটী টিপ দিলেন এবং দুগ্ধটুকুকে মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিয়া মহিলাটীর হাতে তুলিয়া দিলেন।

নেতৃত্ব ও অহঙ্কার

নিলফামারি হইতে তিনটী যুবক আসিয়াছিলেন। প্রথম যুবকের কিছু জিজ্ঞাস্যের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— তোমার যোগ্যতা আছে, সাহস আছে। নেতৃত্ব ছেড়ে দিও না। তবে, সেবকের মনোভাব নিয়ে কাজ কর্ব্বে, কাজ কর্ব্বে বিনয়নম্র বুদ্ধি নিয়ে। জনসাধারণ অনেক সময়ে নিজেদের কর্ত্তব্য বুঝে উঠতে পারে না। এই জন্যই মাঝে মাঝে ভগবান্ তাদের মধ্যে দু-একজনকে নেতৃত্ব-শক্তি দিয়ে পাঠান। তারা যদি সেবাবুদ্ধি না হারায়, তাহ'লে সত্য সত্যই তারা দেশ, সমাজ ও জগতের অসংখ্য লোককে সুদীর্ঘকাল নিজেদের সহকর্ম্মী-রূপে পেয়ে বিরাট, ব্যাপক ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অশেষ কল্যাণসাধন কর্ত্তে পারে। সেবাবুদ্ধি ছেড়ে দিলেই অহংবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আর অহঙ্কার এলেই প্রতি কাজে ভুল, ত্রুটি, দোষ, অসম্পূর্ণতা,

অসঙ্গতি এবং দম্ভ প্রকাশ পেতে আরম্ভ হয়। তখন একটী ভুলকে ঢাকতে গিয়ে দশটী ভুলকে স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দিতে হয়, নিজেরা নীতিবাদী সচ্চরিত্র পুরুষ হ'য়েও নেতারা অসচ্চরিত্র ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদিগকে কেবল কার্য্যোদ্ধারের প্রয়োজনে সহকর্ম্মী-রূপে গ্রহণ কর্ত্তে বাধ্য হন। দুচার দিন গায়ের জোরে বা বুদ্ধির বলে নেতৃত্ব বজায় থাকে কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত দেশে ও জাতির জন্য নূতন নূতন দুঃখ, নূতন নূতন অপমান, নূতন নূতন নির্য্যাতন সৃষ্টি ক'রে দিয়ে এসব নেতারা চিরকাল সকলের কেবল ধিক্কারের পাত্র হ'য়ে থাকেন। বেশী যশের লোভে যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাঁরা বেশী কলঙ্কের, বেশী নিন্দার, বেশী ঘৃণার ভাজন হন। সুতরাং দর্প, দম্ভ, অহংকার সম্পর্কে সাবধান থেকো।

নেতৃত্ব ও নৈতিক চরিত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অহংবুদ্ধিকে পায়ের তলায় চেপে রেখে বিশুদ্ধ সেবাবুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে, শুধু এইটুকুই আমার বক্তব্য নয়। তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রও হ'তে হবে। নেতা যত যোগ্য, ক্ষমতাবান্ বা প্রতিভাশালীই হোন, চরিত্রাংশে যদি তিনি হীন হন বা ঊন হন, তাহ'লে তাঁর সহকর্ম্মীরা মনে মনে তাঁকে ঘৃণা করে। আর, সহকর্ম্মীদের মধ্যে যারা তাঁকে ঘৃণা কর্ত্তে পারে না, তারা আস্তে আস্তে এই নেতার গুপ্ত জীবনের

কদর্য্যাসক্তিগুলির অনুকরণ করে। শেক্স্‌পীয়ার মদ খেতেন, মাইকেল মদ খেতেন, আমার নেতাও মদ খান, আমি খেলে আর কি দোষ হবে? অমুক কবির চরিত্রদোষ ছিল, অমুক দার্শনিক বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় অতুলনীয় হ'লেও নিজে বাঁধা ছিলেন ইন্দ্রিয়-নিচয়ের কুৎসিত আবেগের চরণতলায়, আমার নেতাটীও ভিতরে ভিতরে একটী দুশ্চরিত্রতার দৃষ্টান্ত,—তবে আমি আমার গোপন লালসা অবৈধ পথে লোকচক্ষুর আগোচরে চরিতার্থ ক'রে গেলে তাতে কি দোষ হবে? এসব কুযুক্তি শেষোক্তদের মনকে আচ্ছন্ন করে। ডিরোজিও মদ খেতেন, অতএব নব্যবঙ্গের রেনেসাঁসপন্থীরা মদ খেয়ে সব মাতাল হ'তে লাগ্‌লেন, এটা ত' মাত্র অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু আগের কথা। বড় বড় নেতারা যদি চরিত্রবান্ না হন, তাহ'লে তাঁহাদের জীবনের অপদৃষ্টান্তের অনুসরণে হাজার হাজার ক্ষুদে নেতারা, তাঁদের জীবনের ভাল অংশের অনুসরণ কত্তে পারুক আর না পারুক, মন্দ অংশের হুবুহু অনুকরণ কত্তে থাকে। তাই নেতাকে নিজ চরিত্রের দিকে খরদৃষ্টি রাখতে হবে।

নেতার জীবনের দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নেতার জীবনে এমন দৃষ্টান্তও থাকা উচিত নয়, যার ভিতরে পাপ হয়ত কিছুই নাই কিন্তু যাকে

বাহিরের লোকে পাপ বা কলঙ্ক ব'লে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পায়। কালকে আমাকে রায় বাহাদুর শরৎ বাবু একটা ঘটনার কথা বল্‌ছিলেন। তিনি এখানকার শুধু জেলা-বোর্ডেরই চেয়ারম্যান নন, তিনি এ জেলার সরকারী উকিলও। তিনি একটা বাজে কথা বল্‌তে পারেন না। কয়েকজন বিপ্লবী যুবককে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কোথাও খুঁজে তাদের পাওয়া যাচ্ছিল না। একদিন শেষ রাত্রিতে এক বাড়ীতে ঘেরাও ক'রে পুলিশ তল্লাসী সুরু ক'রে দিল। পেল দুটী যুবককে তিনটী নিঃসম্পর্কিতা কিশোরীর সঙ্গে এক বিছানায় নিদ্রিত অবস্থায়। এখনো এদেশের বিপ্লববাদীরা গীতা পড়ে, চরিত্রের সাধনাকে অত্যাবশক জ্ঞান করে। সুতরাং ধরে নিতে কোনো অসুবিধা নাই যে, এই যুবক দুইটী নিশ্চয়ই অসদুদ্দেশ্যে তরুণী কিশোরীদের সঙ্গে এক শয্যায় ঘুমুতে যায় নি। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্তের কুব্যাখা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সুতরাং যুবকদ্বয় যদি নিজেদের নিশাকালে লুকিয়ে রাখবার জন্য অন্যতর কৌশল অবলম্বন কত্ত, তবে তা' নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত-হিসাবে ভাল হ'ত। নেতা হয়ত বিপুল অর্থ অর্জ্জন করেন এবং সে কাজটা করেন অসৎ পথে। তারপরে তিনি সেই অর্থ অকাতরে তার দলের কাজে ব্যয় করেন। কিন্তু এরও বিষময় ফল আছে। দলের সব লোক না হোক্, অনেক লোক, অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করাকে একটী কর্ত্তব্য কার্য্য

ব'লে জ্ঞান করা সুরু কর্ব্বে। নেতা হওয়া সহজ নয়। কিন্তু নেতৃত্বের দায়িত্ব যোগ্য ভাবে পালন তার শতগুণ কঠিন কাজ।

পরোপকার ও তাহার উপায়

দ্বিতীয় যুবকটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, পরোপকার করবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—নিজেই একটু ভেবে দেখ না কেন কি উপায়ে পরোপকার করা যায়?

প্রশ্নকর্ত্তা।—কেবল পরোপকারই কত্তে চাই, খুব ক'রে কত্তে চাই কিন্তু উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি এবার খুব হাসিলেন। বলিলেন,—আমি জল খাব আমি জল খাব বলে চীৎকার কর্ল্লে কি জল তোমার কণ্ঠনালীর ভিতরে ঢুকবে বাবা? হাতটা বাড়িয়ে জলের গ্লাসের কাছে এগিয়ে দিতে হয়। পরোপকার কর্ব্ব, এই ব'লে কেবল চিৎকার কর্ল্লে আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর্ল্লেই পরোপকার করা যাবে না। পরের যেখানে দুঃখ, পরের যেখানে ক্লেশ, পরের যেখানে অভাব, সেখানে একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে এগিয়ে যেতে হবে এবং নিজের সাধ্যমত যতটুকু সম্ভব কাজেও লাগ্‌তে হবে।

প্রশ্নকর্ত্তা।—কি ভাবে কাজে লাগ্‌ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আগে ছোট ছোট কাজগুলি ধর্ব্বে। যেটা ধর্ব্বে, তাকে সুসম্পন্ন ক'রে আসার নিয়ম এবং অভ্যাসটী আয়ত্ত

কত্তে হবে। ধরি আর ছাড়ি, এই নীতি চল্‌বে না। এই অভ্যাসটী একেবারে মজ্জাগত হওয়া চাই যে, কাজ একবার ধ'রে তাকে আর ত্যাগ করা হবে না। কাজ শেষ ক'রে তবে ছাড়বার প্রশ্ন। অতএব, আগে ছোট ছোট কাজই ধর্ব্বে। ছোট ছোট কাজ সুচারু-রূপে কত্তে কত্তে চরিত্রের ভিতরে এক অসামান্য দৃঢ়তার বিকাশ ঘট্‌বে, যা' তোমার পরবর্ত্তী প্রত্যেকটি কাজে সহায়তা দেবে, উৎসাহ যোগাবে, কৃতিত্ব ও যোগ্যতা দেবে, সাফল্য দেবে।

ছোট ছোট সৎ-কর্ম্মীদের খোঁজ নাও

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—আরও একটী কাজ কর্ব্বে। বড় বড় আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট কাজগুলি সম্পর্কে তত নয়, যতটা মনোযোগ তোমাকে দিতে হবে, চারিদিকে সৎ-কর্ম্মান্বিত সফল কর্ম্মীদের ছোট ছোট সৎকর্ম্মের সাফল্যের ইতিহাস সংগ্রহের দিকে। ছোট্ট কাজটীকে কি ক'রে একজন সাধারণ কর্ম্মী কত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে, কত ধৈর্য্যের বলে কত পরিশ্রম ক'রে, কি কৌশলে সফল ক'রে তুললেন, সেইটী জান্‌বার আগ্রহে চারদিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ কত্তে থাক। এর ফলে বহু সৎ-কর্ম্মীর একত্র মিলনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে এবং একদা তারই ফলে জগতে বড় বড় কাজ সুসাধ্য হবে। তোমাদের ধনবল কম, তার জন্যই ত' জনবলের মূল্য তোমাদের কাছে

খুব বেশী। কিন্তু সৎক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা যদি না মিলিত হ'য়ে কেবল যদি অসৎক্রিয়ান্বিতেরাই দলবদ্ধ হয়, তবে ত' নরক হবে গুলজার আর দেশটা যাবে গোল্লায়। সৎলোক সংখ্যায় চিরকালই কম থাকে, সৎকর্ম্মান্বিত লোক সংখ্যায় তার চেয়েও কম। কিন্তু যশোমঞ্চের একেবারে আড়ালে থেকে নীরবে যাঁরা কাজ ক'রে যাচ্ছেন, তেমন নিষ্ঠাবান্ সাধারণ কর্ম্মীরাই দেশের আশা এবং দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁরা কে কোথায় কেমন অবস্থায় থেকে কি কি সৎ কাজ ক'রে যাচ্ছেন, অবিরত তার খোঁজ নাও। এই অনুসন্ধান-কার্য্যটা তোমার পক্ষে জীবনীয় রসায়নের,—অর্থাৎ টনিকের,—কাজ করবে।

বন্ধু চিনিবার উপায়

তৃতীয় যুবকটী তাহার বক্তব্য নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বন্ধু চিন্‌তে পাচ্ছ না? যারা ভালবাসতে শেখায়, তারাই বন্ধু। যারা দ্বেষ কত্তে শেখায়, তারা শত্রু। যারা স্নেহ, মমতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথে টেনে নেয়, তারাই বন্ধু। যারা ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধ ও অধৈর্য্যের দিকে টেনে আনে, তারা শত্রু। যারা সংযম সাহস, শৌর্য্য দেয়, তারা বন্ধু। যারা অসংযত, ভীরু, দুর্ব্বল করে, তারা শত্রু। যারা সত্যের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনে প্রেরণা দেয়, তারা বন্ধু। যারা মিথ্যার সঙ্গে আপোষ কত্তে প্রবৃত্তি দেয়,

তারা শত্রু। যারা একের সাথে দশকে, দশের সাথে সহস্রকে, সহস্রের সাথে কোটিকে মিলিত হবার আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, প্রেরণা, প্রবৃত্তি ও রুচি দেয়, তারা বন্ধু। যারা বিচ্ছেদ, বিভেদ, অবান্তর কলহের প্ররোচনা দেয়, তারা শত্রু। প্রকৃত বন্ধুদের চিনে নিতে তোমরা কখনো ভুল ক'রো না।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু যদি আমার অগঠিত ও অপরিণত বিচার-বুদ্ধি আমাকে সঠিক ভাবে বন্ধু চিনিয়ে দিতে অক্ষম হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হ'লে আকুল প্রাণে অকপট চিত্তে সরল মনে ভগবানের শরণাপন্ন হও এবং প্রার্থনা জানাও, হে প্রভু, আমাকে তুমি চিনিয়ে দাও আমার প্রকৃত বন্ধু কে। মিলন-সৃষ্টির ছল ক'রেও বিচ্ছেদ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক চতুর ব্যক্তি তোমার কাছে আসতে পারে, যাদের ভাণ ও ছদ্মবেশ ধ'রে ফেলা তোমার হয়ত অসাধ্য। সেই স্থলে পরমেশ্বরের সহায়তা লও, তাঁর নিকটে আকুল প্রাণে প্রার্থনা জানাতে জানাতে যে বিমল প্রজ্ঞা জেগে উঠবে, তার আলোকে ঠিক ক'রে সব অচেনাকে চিনে নাও।

ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর পরিচয়

অপরাহ্নে রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ড্রাইভার আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—যদি বেড়াতে ইচ্ছুক হন, তা' হ'লে গাড়ী প্রস্তুত।

এমন সময়ে শরৎ বাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—আমিও প্রস্তুত। কেবল আপনার আদেশ হ'লেই হয়।

মোটর কার জেলা-বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ছুটিল।

অনেক দূর গিয়া গাড়ীটী একটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে থামিল। গাড়ী হইতে নামিয়া সকলে কতকটা স্থান পায়ে হাটিয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরটী একটী সাধুর আশ্রম।

সাধুজী কাহারও আগমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ছুটিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন,—শুভ্রবস্ত্রধারী কে আপনি আমি জানি না কিন্তু আপনাকে দেখেই আমার প্রাণে সাড়া জেগেছে যে, আপনি প্রণম্য।

রায় বাহাদুর শরৎ বাবু শ্রীশ্রীবাবামণির পরিচয় প্রদান করিলেন।

সাধুজী খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—ব্রাহ্মণের সন্তান আমি, স্কন্ধদেশে যজ্ঞোপবীতই মাত্র ধারণ কর্‌ম্লাম কিন্তু ব্রাহ্মণ হ'তে পার্‌ম্লাম না। সন্ন্যাসীর শিষ্য আমি গৈরিক বস্ত্রই শুধু ধারণ কর্‌ম্লাম, কিন্তু সন্ন্যাসী হ'তে পার্‌ম্লাম না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু বিনয়ী হ'তে পেরেছেন, অহঙ্কারকে জয় কত্তে পেরেছেন। আপনিই ব্রাহ্মণ, আপনিই সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ্য উপবীতে নাই, সন্ন্যাস গৈরিকে নাই, উভয়ই যুগপৎ বিরাজিত অভিমানহীন মনে, দর্পহীন, দম্ভহীন, স্পর্দ্ধাহীন চিত্তে। ব্রাহ্মণের পরিচয় তার নির্লোভতায়, সন্ন্যাসীর পরিচয় তার নিষ্কামতায়।

জাতীয় জাগরণের লক্ষণ

সাধুজী বলিলেন,—বন-জঙ্গলের মধ্যে আশ্রম করেছি, আপনাদের আসতে কত কষ্ট হ'ল। বড় রাস্তার উপরে যদি আশ্রমটা হ'ত, তা'হ'লে আপনাদের একটী পা হাটতে হত না।

রায় বাহাদুর শরৎ বাবু বলিলেন,—পুণ্য কত্তে হ'লে একটু কষ্টও সইতে হয়। তবে, কিছুদিন পরে জেলা-বোর্ড হয়ত আপনার আশ্রম পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী ক'রেও দিতে পারেন। এ বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের আগ্রহ থাকা দরকার। আপনি ত' সন্ন্যাসী মানুষ, আপনি নিজের কোনো সুবিধার জন্য কাউকে কোনো অনুরোধ কর্ব্বেন না, সেটা আমি জানি। তবে স্থানীয় লোকেরা একটু উদ্যোগী হ'লেই জেলা-বোর্ড নিজে থেকে একাজে এগিয়ে আস্‌বেন। কিন্তু জাতীয় চরিত্র বড় অবনত। ঠিকাদারী ক'রে লাভবান্ হবার যাঁর সুযোগ নেই, তিনি এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা জাতি জেগেছে, না নিদ্রিত আছে, তা' কতকগুলি লক্ষণ দিয়ে বিচার কত্তে হয়। একটা লোকেরও যাতে উপকার হবে, তাতে যদি অন্য কারো অপকার না ঘটে, তা হ'লে সেই কাজটীকে সুসম্পন্ন কর্ব্বার জন্য হাজার হাজার লোকের আগ্রহের জাগরণকে বুঝতে হবে জাতীয় জাগরণের একটী সুমহৎ লক্ষণ। আর যে কাজটী হ'লে অনেক লোকের উপকার হবে এবং কোনো লোকের এমন অপকার ঘটার সম্ভাবনা নেই, যেটার প্রতীকার বা ক্ষতিপূরণ অসম্ভব নয়, তেমন কাজে যখন কারো হয় না আগ্রহ, জান্‌তে হবে, জাতি গভীর তমসায় ডুবে আছে, জাতি মরণোন্মুখ নির্জ্জীব।

নৈমিষারণ্যের তপস্যা

কথায় কথায় নৈমিষারণ্যের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতীয় জীবনে নৈমিষারণ্যের যা' দান, তা' অতুলন, অনুপম। প্রাচীন ঋষি সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর ভক্ত ছিলেন না, তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার তপোবনগুলি ছিল এক একটা নৈমিষারণ্য। এইখানেই তিনি সশিষ্যে হ'তেন সংশিতব্রত, সাধন কত্তেন সকলকে নিয়ে, এখানেই তাঁর প্রজ্ঞানেত্রের প্রস্ফূটন হ'ত, এখানেই তিনি নিজের ব্যাসাসনটী রচনা ক'রে উৎসুক শিষ্যদের কর্ণে জ্ঞানের সুধা, প্রেমের মধু,

আত্মাহুতির হব্য-কব্য আর জীবনোৎসর্গের সমিধ্‌গুলি ঢেলে দিতেন। প্রাচীন ভারতকে গ'ড়ে তুলেছিল অরণ্যের তপস্যা, যা' ধার ধারত না লোক-লোচনের কৌতূহলের, যা' পরোয়া রাখত না নিন্দা বা প্রশংসার। আধ্যাত্মিকতা-সর্ব্বস্ব নীবার-কণা-তুষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি এইখানে বসেই জয় করেছিলেন প্রাকৃত মায়া, মোহ, কাম ও বাসনাকে।

তপস্যা ও আধুনিক বিজ্ঞান

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—শিক্ষা চাই এমন, যার বনিয়াদ নৈমিষারণ্যের তপস্যা, যার হর্ম্মচূড়া আধুনিক বিজ্ঞানের সর্ব্বাধুনিক অবদান। বিজ্ঞান মানুষকে ভোগ্যসামগ্রী দিয়েছে এবং দেবে, তপস্যা দেবে চরিত্র, লক্ষ্য, আদর্শ ও ত্যাগসমর্থ জীবন-যাপনের শুদ্ধ স্বচ্ছ, সুন্দর জীবন-যাপন-প্রণালী। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারে মানুষ চমৎকৃত হচ্ছে এবং হবে কিন্তু সব আবিষ্কারই মিথ্যা, যদি না মানুষের চরিত্র জ্ঞানভিত্তিক ও আদর্শ-নিষ্ঠ হয়। অধ্যাত্ম-পিপাসাকে দাবিয়ে রেখে বিজ্ঞান মানুষকে নিত্য নূতন লিপ্সা ও আর্ত্তির দিকে যদি ঠেলে নিয়ে যায়, তবে এত আশ্চর্য্য অবদান সত্ত্বেও বিজ্ঞান মিথ্যা হ'য়ে যাবে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা-সমূহের বিস্ময়কর দান মানুষের পক্ষে একেবারেই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, যদি মানুষ তা'র জীবনকে ভোগাকাঙ্ক্ষার বেদীতে বলি দেওয়া থেকে বিরত হ'তে না পারে। ত্যাগ এবং

তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল আত্মসংযমে, পরার্থে আত্মোৎসর্গে, সর্ব্বজীব-কুশলের জন্য নিজেকে সমর্পণে। বিজ্ঞান আত্মোৎসর্গের সুযোগ দিতে পারে কিন্তু রুচি সৃষ্টি কত্তে পারে না। প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের অতি গোপন খনিতে প্রবেশ ক'রে নব নব জ্ঞানাহরণ যদি মানুষের হিংসা, দ্বেষ, জিগীষা ও পরপীড়ন বন্ধ কত্তে না পারে, তবে স্বীকার কত্তেই হবে যে, জাকজমকের দিক দিয়ে বিজ্ঞান যতই সফল হোক, ঠাট তার যতই বাড়ুক, প্রকৃত সার্থকতা থেকে সে বঞ্চিত রয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এমন সব আবিষ্কার শতাব্দী কালের মধ্যেই কর্ব্বেন, যা' চিরকাল ছিল কল্পনার অতীত, কিন্তু মানুষ যদি অধ্যাত্মচেতনায় উন্নততর না হয়, তবে সব মিথ্যা, সব ভুল, সব বৃথা হবে।

রংপুর
২৯শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৪২
(১৪ই জুলাই, ১৯৩৫)

বিজ্ঞাপন কেন

শ্রীশ্রীবাবামণির ইচ্ছা ছিল যে, রংপুর আসিয়া প্রথম দিন হইতেই যুবকদের ডাকিয়া আনিয়া যৌগিক-আসন-মুদ্রার শিক্ষাদান সুরু করেন। কিন্তু হাজারিবাগে যে হৃদ্‌যন্ত্রের অসুস্থতা টের পাওয়া গিয়াছিল, পুপুন্‌কী আসিয়া যে যন্ত্রটীকে বিশ্রাম দেওয়া যায় নাই, বর্দ্ধমান আসিয়া সেই যন্ত্রটীর

উপরে একটু উৎপীড়নই হইয়া গেল। বর্দ্ধমানে সৎকথা শুনিবার শ্রোতার অভাব হইতেছিল, অথচ বঙ্গদেশের ইহা একটী অতীব প্রসিদ্ধ জেলা। শ্রীশ্রীবাবামণি জিদ করিলেন যে, বর্দ্ধমানকে তিনি তাঁহার কথা শুনাইবেনই শুনাইবেন, বর্দ্ধমানকে জয় করিতে হইবে। শিষ্যসংখ্যা-বৃদ্ধির দ্বারা নহে, লোকের কাছ হইতে ধনসংগ্রহ দ্বারা নহে, সৎকথা শুনিবার রুচিসৃষ্টি করিয়া তিনি বর্দ্ধমানকে জয় করিবেন। জয় তিনি করিয়াও ছিলেন কিন্তু দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্রের উপরে বড়ই অত্যাচার হইয়া গেল। রংপুর রওনা হইবার সময়েই তিনি নিরন্তর হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবল ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং স্থির করিলেন যে, রংপুরে সহসাই তিনি যৌগিক আসনমুদ্রা শিক্ষাদান শুরু করিবেন না। এমনকি, বক্তৃতাও ১০ই শ্রাবণের পূর্ব্বে আরম্ভ হইবে না। কিন্তু গতকল্য হইতেই ছোট ছোট মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি বিতরণ সুরু হইয়াছে। বিজ্ঞাপন শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা হইতেই ছাপাইয়া আনিয়াছিলেন।

গতকল্যকার বিজ্ঞাপন বিলির ফলে অদ্য প্রাতে দুই চারি জন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত দেখা করিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—আপনি নাকি কয়েক দিন পরে এই শহরে ধারাবাহিক কয়েকটী বক্তৃতা দিবেন। তার জন্য আবার বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হয়েছে। আপনি যদি সত্যিকারের সাধুই হবেন, তবে আর বিজ্ঞাপন প্রচার কেন?

লোকেরা ত' নিজের গরজেই আপনার কাছে ছুটে ছুটে আস্‌বে, মধুর গন্ধে যেমন মৌমাছিরা ফুলের কাছে ছুটে আসে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৌমাছির ত' তীব্র ঘ্রাণশক্তি আছে। আপনারও কি তা' আছে?

ভদ্রলোক বলিলেন,—অমুক সাধু আর তমুক মহাত্মা ত' যেখানে আসেন, সেখানেই লোকের ভিড় জমে যায়। তাঁরা ত' বিজ্ঞাপন প্রচার করেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আরে, আসল কথাটাই ত' বলেন নি! তাঁরা ত' আসল সাধু, আর আমি ত' বিজ্ঞাপনের সাধু। আমার গায়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে পিপড়ার দল চিনির লোভে এখানে ছুটে আসে না, আমার বিজ্ঞাপন দেখে তারা আসে আমার বাগ্মিতা শুনতে। বিজ্ঞাপন আছে বলেই কেউ আসে আমার চেহারা দেখ্‌তে, কেউ আসে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে, কেউ আসে আমার পাণ্ডিত্যের গভীরতা বা অগভীরতা মাপতে, কেউ আসে আমার বক্তব্য বিষয়ের যৌক্তিকতা বিচার কত্তে, কেউ আসে আমার দোষ-গুণ আবিষ্কার কত্তে। আমার বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে কতকগুলি সৎকথা শোনানো এবং তারপরে একেবারে নিষ্কিঞ্চন হত্তে নির্ব্যক্তিক মনে শহর থেকে নীরবে প্রস্থান করা। কৈ, এত জায়গায় গিয়েছি, টাকা তোল্‌বার চেষ্টা ত' আমি কোথাও কখনো করি নি। অবশ্য, নিজের মনের আগ্রহে সেধেও যে কেউ টাকার তোড়া নিয়ে এসেছে, এমন ঘটনাও কোথাও ঘটে নি। দরিদ্র সন্ন্যাসী শূন্য পকেট নিয়ে শহরটীতে আসে, যাবার সময় শহরটীর একটী প্রাণীকেও একটী কপর্দ্দকের জন্য দরিদ্র না ক'রে নিঃশব্দে চ'লে যায়। লোককে তার কথা শুনাবার জন্য, সময় বাঁচিয়ে কাজ কর্ব্বার জন্য, ইচ্ছুক সব শ্রোতাকে এক সঙ্গে এক স্থানে একই সময়ে পাবার জন্য, বিজ্ঞাপনের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। অমুক সাধু আর তমুক মহাত্মা বিজ্ঞাপন দিয়ে শ্রোতা সংগ্রহ করেন না, এটা সুখের কথা কিন্তু বিজ্ঞাপন-প্রচার আধুনিক কালের কর্ম্মশৈলী। আধুনিক ব'লেই যদি বিজ্ঞাপন-প্রচারটা দোষের হয়, তাহ'লে আমিও ত' প্রশ্ন কত্তে পারি যে, রেলগাড়ী ত' আধুনিক প্রবর্ত্তন, তাঁরা প্রাচীন-কালের মত পদব্রজে হেঁটে হেঁটে কেন দেশভ্রমণ কর্ব্বেন না, কেন রেলে চড়্‌বেন, মোটরে চাপবেন, টেলিগ্রাম ক'রে নিজেদের আগমন-বার্ত্তা কেন ভক্তদের জানিয়ে দেবেন, আধুনিক কালের প্রবর্ত্তিত ব্যাঙ্কগুলিতে কেন নিজের বা আশ্রমের টাকা কড়ি রাখবেন, বলুন ত'।

ভদ্রলোক দমিলেন না। বলিলেন,—আপনারা দেশে দেশে এসে অর্থহীন কতকগুলি বক্তৃতা দিয়ে যাবেন আর লোকদের

হবে লাইটের খরচ, হলের খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ বহন কত্তে। এটা কি জনসাধারণের উপরে অত্যাচার নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অত্যাচার ত' বটেই, তবে যে সব অত্যাচারকারীদের কথা ভেবে আপনার মন এত ক্ষুব্ধ, আমি তাঁদের মধ্যে পড়ি না। দেখবেন? এই দেখুন আমার পেট্রোম্যাক্স্‌টী, যা, ঢাকাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে একদিন কিনেছিলাম। হলের ভাড়া যেখানে লাগে, সেখানে সর্ব্বত্র আমি নিজেই পুরো ভাড়াটী মিটিয়ে দিয়ে থাকি। বিজ্ঞাপন ত' আমি নিজের ব্যয়ে ছেপে নিয়ে আসি। আমি যদি চাঁদা-আদায়কারী বর্গী-সাধু হতাম, তাহ'লে এসব ব্যয়ভার নিশ্চয়ই জনসাধারণের স্কন্ধে চাপাতে লজ্জাবোধ কত্তাম না। কিন্তু আমি দরিদ্র হ'লেও ভিক্ষুক নই। সম্ভবতঃ সেটা আপনার জানা ছিল না।

অভিক্ষা ও অহঙ্কার

ভদ্রলোক বলিলেন,—ভিক্ষা না চাওয়াও ত' একটা অহঙ্কার। অহঙ্কার কি সাধুতে সাজে?

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাস্যে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া বলিলেন,—ওহো, এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষটী কে। পরমেশ্বরই আপনার রূপ ধারণ ক'রে আমাকে বিনয় শিক্ষা দিতে এসেছেন। আপনাকে নমস্কার, আপনাকে ধন্যবাদ।

অনন্ত জীবন ও অনন্ত সংগ্রাম

অপর একজনের একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরে বাবা, বাধাই ত' জন্ম দেবে শক্তির। বিনা বাধায় কি বল বাড়ে? শত অনুযোগ অসুবিধার মধ্যেও মহৎ কাজে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ভিতরে তোমার শক্তিমত্তার ও অসাধারণত্বের পরিচয় প্রকাশ পাবে। ভগবানের নামে মন রেখে নির্ভয়ে জীবনের জয়যাত্রা-পথে চল।

প্রশ্নকর্ত্তা।—কখনো কখনো মন বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, মনে হয় শরীর বুঝি অবশ হ'য়ে এল, হৃৎপিণ্ড বুঝি স্তব্ধ হ'য়ে গেল। জীবন-ভরা বিরুদ্ধতার সঙ্গে কাঁহাতক লড়াই দেওয়া চলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনন্ত তোমার জীবন, অনন্ত তোমার সংগ্রাম। বিশ্বাস রাখো অনন্ত তোমার বিজয়, অনন্ত তোমার সফলতা। দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে ভগবানকে সর্ব্বশক্তি দিয়ে ডাকবে, অসহায় শিশুর মত নিরুপায় হ'য়ে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করে ডাকবে,—বিপদুদ্ধারের জন্য নয়, তোমার জীবনে তাঁর শুভ অভিপ্রায় পূর্ণ হোক, এই কামনা নিয়ে। তা হ'লেই দেখবে, নিমেষ-মধ্যে তিনি তোমার কথা শুনতে পেয়েছেন। দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাশক্তি তোমার ভিতরে সঞ্চারিত কত্তে সুরু করেছেন। দেখবে মন্ত্রৌষধের চেয়েও আশ্চর্য্যজনক ভাবে তোমার ভিতরে শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস ও নিঃসংশয় অবস্থা জেগে উঠেছে।

শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব আহরণের উপায়

অপর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানের নামের সেবার মধ্য দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব আহরণ কর।

প্রশ্নকর্ত্তা।—সেটা আবার কি রকম, তা' একটু বুঝিয়ে বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মক্ষেত্রে যত প্রকারের কৃতিত্বই অর্জ্জন কর না কেন, তার মূলদেশে থাকা চাই নিষ্ঠা, সাহস ও নির্ভুল পন্থা-নির্ণয়। আর এই তিনটী দুর্লভ-বস্তু অতি সহজে তোমার চরিত্রগত ও স্বভাবসঙ্গত হ'য়ে পড়বে ভগবানের নামে মনকে নিঃশেষে সমর্পণ কর্ব্বার অনুশীলন কর্ল্লে।

বিবাহে পাত্র-পাত্রীর বয়সের পার্থক্য

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তা বয়সে যুবক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিবাহে কি পাত্র-পাত্রীর বয়সের পার্থক্য থাকা আবশ্যক? আবশ্যক হ'লে কেন আবশ্যক? কার বয়স বেশী আর কার বয়স কম হওয়া প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তি উর্দ্ধগামী, স্নেহ অধোগামী। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একজন ভক্তির পাত্র এবং অপর জন স্নেহের পাত্র হবেন, আর তার মধ্য দিয়েই

দুজনের মধ্যে অপরিসীম সখ্যের হবে সৃষ্টি, এই প্রয়োজন থেকেই স্বামীর বয়স একটু বেশী ও স্ত্রীর বয়স একটু কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য আর একটা দিক আছে, সেটা নিতান্তই শারীরিক দিক। সেই দিক্ নিয়ে আমি কিছু আলোচনা কর্ব্ব না।

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমার গুরুজনেরা আমার চেয়ে অধিক-বয়স্কা পাত্রী স্থির করেছেন। এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পাত্রের বয়স বেশী হবে, এটাই প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত প্রথা। নানা কারণে কোনো কোনো অহিন্দু সমাজে এবং পাশ্চাত্য দেশে এর ব্যতিক্রম প্রচুর দেখা যায় কিন্তু সে স্থলেও স্বাভাবিক ঝোঁক প্রত্যেক পাত্রের সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠা কনের প্রতিই থাকে। ব্যতিক্রম আমাদের দেশেও আছে। যেমন পশ্চিমাঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা নারী বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষকে অবাধে পতিত্বে বরণ কচ্ছে, দেখা যায়। আবার, বাংলাদেশে এক সময়ে অধিক-বয়স্কা কুলীন-কন্যাদের তৎকালের ধারণানুযায়ী সৎপাত্র পাবার দায়ে বাধ্য হ'য়ে অল্পবয়স্ক বরকে বরণ কর্ত্তে হয়েছে। সমাজ মেনেও নিয়েছে। বিবাহ যখন একটা সামাজিক ব্যাপার, তখন সমাজের সম্মতি পেলে কে বয়োজ্যেষ্ঠ আর কে বয়ঃকনিষ্ঠ, এই বিচারের প্রয়োজন থাকে না। যেখানে উভয় পক্ষে পিতামাতাই উদ্যোগী, সে ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে

আপত্তি ক'রেই বা লাভ কি বাবা? বিবাহের আসল উদ্দেশ্য ত' হ'ল তেমন সত্যকে পাওয়া, যা' বয়সের বিচারের ঊর্দ্ধে, রক্তমাংসের হিসাবের ঊর্দ্ধে, এমনকি শরীর-মনের পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে। সেই দিকে খাঁটি থাকার পণ কর।

বয়োজ্যেষ্ঠার প্রতি ভক্তিভাব ভাল

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—অনেক হিন্দু পরিবারেই তরুণ এবং কিশোরদিগকে একটী সৎশিক্ষা সযত্নে দেওয়া হয়ে থাকে। সেটী হচ্ছে এই যে, যে সব মেয়েরা বয়সে তোমার চেয়ে বড়, তারা কেবল তোমার যে জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাই নয়, বরং তারা প্রত্যেকে তোমার মাতৃসমা। এই শিক্ষাটার সুফল এই হয় যে, অনুবয়স্ক তরুণদের দ্বারা অতিবয়স্কা কুমারীদের নৈতিক ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনা নষ্ট হ'য়ে যায়। এই সৎশিক্ষাটা পৃথিবীময় সর্ব্বত্র বদ্ধমূল হ'লে জগতের কত পাপ যে বাধা পেতে পারে, তা' বলবার নয়। পাশ্চাত্য জগতে, বিশেষ ক'রে আমেরিকাতে, কত বর্ষীয়সী নারী ষোল থেকে বিশ বছরের একটা যুবককে জীবনের শেষ কালের পতি-রূপে বরণ করে ব'লে শোনা যায়। এসব দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিতে অতীব ঘৃণিত ব'লে মনে হবে। প্রতিকূল নানা কারণের জন্য বর যদি সর্ব্বসময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ নাও হ'তে পারে, তবু বর-কনের বয়সে অনেক পার্থক্য থাকা মোটেই সঙ্গত নয়। গুণ থাকুক আর না থাকুক,

যোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক, বয়োজ্যেষ্ঠকে ভক্তি ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা একটা লাভজনক অধ্যবসায়। এ লাভ জন্ম-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে নয়, এ লাভ মনের নৈতিক গঠনের দিক দিয়ে। তরুণ ছাগের ঔরসে বৃদ্ধা ছাগীর গর্ভে যে বাচ্চাটা হবে, তা' সব সময়েই যে রুগ্ন বা দুর্ব্বল হবে, তা' নয়। কিন্তু ছাগ বা ছাগীর কোনো নৈতিক চেতনা নেই। তারা প্রবৃত্তির প্রেরণাই শুধু বুঝতে পারে, তার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি বিচার কত্তে পারে না। মানুষ তা' পারে। নিজের চেয়ে অধিক-বয়স্কা রমণীতে স্বামিজনোচিত দৈহিক কর্ত্তব্য পালনের সময়ে রুচিসম্পন্ন ও মার্জ্জিত বুদ্ধি মানুষের দ্বিধা সত্যই স্বাভাবিক।

অতীতের ভুল নিয়া মাথা ঘামাইও না।

যুবকটী তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু মারাত্মক ভুলভ্রান্তির কথা নিবেদন করিল। মনোযোগ সহকারে শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভুল করেছ? আর তার জন্য যাবজ্জীবন তোমাকে মুখ কালো ক'রে থাক্‌তে হবে? না বাবা, আমার তা' মত নয়। ভুল যদি বুঝে থাক, তাহ'লে তাতেই জোর ক'রে লেগে থাক্‌বে না, তাকে ত্যাগ কর্ব্বে, তার প্রভাব থেকে নিজেকে অচিরে মুক্ত ক'রে নেবে, এই জিদটী কর। ভুলের কোনো অবাঞ্ছিত ফসল যদি এর মধ্যে

জন্মে থাকে, তবে তা' নিয়েও বেশী মাথা ঘামাবে না। কি ভাবে চল্লে এখনো তুমি মানুষের মত মাথা উঁচু ক'রে চল্‌তে পার, তার দিকে লক্ষ্য দাও। প্রতি পদে ভগবানের করুণা ভিক্ষা কল্লে থাক, ভগবানের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ কর, যেন তিনি তোমার অতীত সকল দুর্ব্বলতার কুপ্রভাব দূর ক'রে দেন, যেন তিনি বর্ত্তমান সকল দুর্ব্বলতার বিনাশ সাধন করেন।

বিবাহের দায়িত্ব ও গুরুত্ব

একটী পরিণত বয়স্ক-যুবক তাহার নিজের বিশেষ-কিছু কথা বলিবার প্রয়োজন নিবেদন করায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত' তোমার সব কথা শুনব বই কি?

যুবক বলিলেন, বিবাহ আসন্ন, অভিভাবকেরা পাত্রী ঠিক করিয়াছেন, এতদিন বিবাহ-বিষয়ে বিশেষ কোনও চিন্তার অবসর ছিল না। কারণ, বিদ্যার্জ্জন ও ধনার্জ্জনের উপায়-অন্বেষণে দিন কাটিয়াছে। হঠাৎ মনে হইতেছে, কি যে এক গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। এখন কি উপায় করা যায় এবং কি ভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব। সুখী হওয়ার পথ কি। ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহের দায়িত্বও আছে, গুরুত্বও আছে। বিবাহ সত্য সত্য ছেলেখেলা নয়। অবিবাহিত জীবন অর্থাৎ সন্ন্যাসেরও দায়িত্ব আছে, গুরুত্ব আছে, চিরজীবন

অবিবাহিত থাকাও ছেলেখেলা নয়। এই জন্যই উভয় জীবনেই কর্ত্তব্যপালনের জন্য উদ্বেগ ও উদ্‌গ্রীবতা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কিন্তু তার জন্য এত উদ্বিগ্ন হ'তে নেই, যাতে মনঃস্থৈর্য্যের বিনাশ ঘটতে পারে। অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবলিকে বিধাতার দান ব'লে মনে ক'রে তার মধ্য দিয়ে নিজেকে সুগঠিত ক'রে নেবার চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্রতী থাক্‌তে হবে এবং সেই ব্রত-পালনকে আনন্দের সহিত উদ্‌যাপন কত্তে হবে।

চলা বন্ধ করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথমেই বুঝে নিও যে, তুমি একটী কুমারী মেয়েকেই বিবাহ কত্তে যাচ্ছ, যার পক্ষে বিবাহিত জীবন বা ঐ জীবনের আনুষঙ্গিক নানা আচরণ ঠিক্ তোমারই মতন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব। সুতরাং তার সঙ্গে তোমার প্রতিটি ব্যবহার হবে সুধীর, সতর্ক এবং বিচার-বিবেচনা-প্রসূত। তারও হয়ত বিবাহিত হওয়ার পূর্ব্ব থেকে কোনও উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুরাগ রয়েছে, তারও হয়ত জীবন-বীণার তার কোনো উচ্চ সুরে বাঁধা আছে, তারও হয়ত কাম-ক্রোধের ঊর্দ্ধে বাস ক'রে সংসারী কর্ত্তব্য পালনের একটা সুখস্বপ্ন আছে। এই কথাটী মনে রেখে তাকে অনুরূপ ভাবে সঙ্গদান তোমাকে কত্তে হবে। আর কার্য্যকালে যদি দেখ্‌তে পাও যে, এসব তার কিছুই নেই, তাহ'লে বিবাহের পর থেকে তাকে আদর্শবাদী ক'রে গড়ে তোলবার জন্য তোমাকে চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। একই দিনে অনেকগুলি

কথা শুনিয়ে নয়, প্রতিদিন কিছু কিছু ক'রে সৎকথা শুনিয়ে শুনিয়ে উন্নত আদর্শকে জীবনে রূপায়িত কর্ব্বার জন্য তার মনকে অভিলাষী ক'রে তুল্‌তে হবে। সে যদি আগে থেকে সৎশিক্ষা পেয়ে এসে থাকে, তবে ত' দেখ্‌বে, সে তোমার ভাল কথাগুলি সানন্দে লুফে নেবে এবং এভাবে তোমার অন্তরের আনন্দকে বাড়িয়ে তুলবে। এই বিবাহের ফলে তোমার যেন জীবনটা ব্যর্থ না হ'য়ে যায় বা তোমার ত্রুটিতে তার জীবনটা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত না হয়, এ চেষ্টা তোমাকে রাখতে হবে। কাজে নেমে গেলে দেখ্‌বে, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, হেলা-খেলা, সঙ্কল্প-বিকল্প, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছুর মধ্য দিয়ে তোমরা দিনের পর দিন শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বের দিকে কেবল এগিয়েই যাচ্ছ। ভয়ের কিছুই নেই। পদস্খলন হ'লেও চলা বন্ধ করবে না।

রংপুর
৩০শে আষাঢ়, সোমবার ১৩৪২
(১৫ই জুলাই, ১৯৩৫)

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর

একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-বন্দনা করিলেন এবং পরিচয় দিলেন যে, তিনি পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র।

শ্রীশ্রীবাবামণি খুব খুশী হইয়া বলিলেন,—খুব গৌরবের কথা। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মশায় এক ক্ষণজন্মা

মহাপুরুষ ছিলেন। আমি তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি কিন্তু তাঁর যশ শুনেছি। তাঁর সম্পর্কে দু একটী কথা আমার মনে দাগ কেটেছে শ্রদ্ধার এবং ভালবাসার। গিয়েছিলেন তিনি মেদিনীপুরে একটা বিরাট সম্মেলনে ভাষণ দিতে। সেখানে কলিকাতা থেকে সমাগত অনেক দেশনেতাও উপস্থিত ছিলেন। একজন অলোক-সামান্য বক্তা বক্তৃতাকালে জাতীয় পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য মাংসসেবনের উপযোগিতার কথা বল্‌ছিলেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁর ভাষণে সে কথার প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লেন—পুষ্টি মাংস থেকে আসে না, পুষ্টি আসে সংযম থেকে, ব্রহ্মচর্য্য থেকে, যৎকিঞ্চিৎ যা' আহারীয় সহজে মিলে, সেইটুকুকে ভালরূপে হজম করার ক্ষমতা থেকে। এই ত' আমি এই বৃদ্ধ বয়সে রংপুর থেকে দীর্ঘপথ পর্য্যটন ক'রে মেদিনীপুরে এসেছি, পথে আমি ট্রেণে ব'সে এক বিন্দু সোডা-ওয়াটারও খাইনি বা মেদিনীপুরে পৌঁছে গিয়েও এখন পর্য্যন্ত কোনো জলযোগ করিনি। কিন্তু এই যে সুদীর্ঘ বক্তৃতাটী আপনাদের কাছে কর্ল্লাম, জান্‌বেন, এতে আমার শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি আসে নি। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি যে সদাচারকে মানব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কত্তে চেয়েছিলেন, তার যদি প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রতি জনের জীবনে ঘটে, তাহ'লে আমরা মাংসাশী না হ'লেও আমাদের কান্তি-পুষ্টির বা বল-বীর্য্যের অভাব হবে না। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরের এই বক্তৃতাটীর মর্ম্ম আমার কাছে অন্য লোক মারফৎ পৌঁছেছিল। তখন আমি আফশোষ

কত্তে লাগ্‌লাম যে, মেদিনীপুরের এই সার্থক সম্মেলনের খবর আমি আগে কেন পেলাম না এবং সমস্ত ভাষণটাই আগাগোড়া কেন শুন্‌লাম না। কয়েক বছর আগে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে আমি যখন ভাষণ দিচ্ছিলাম, তখন অনুরূপ একটা ব্যাপার ঘটেছিল। আমাকে এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণিত কত্তে হয়েছিল যে, নিরামিষ খেলেও শরীরে শক্তির অভাব ঘটে না।

পঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর ছিলেন সনাতনী ধ্যান-ধারণার মানুষ। তাই তিনি আমাদের চিরপ্রচলিত ভাল জিনিষটুকুকে নষ্ট হ'তে দিতে রাজি ছিলেন না। প্রায় প্রত্যেকটী সনাতনী ব্রাহ্মণেরই মনোভঙ্গীটী এই প্রকার। দৃষ্টান্ত উল্লেখ কত্তে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়বে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের কথা। ভাটপাড়ার মতন একটা পল্লীগ্রামে ব'সে তিনি সমস্ত বাংলার পণ্ডিত-সমাজের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করেছেন যে, যাঁরা সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী এবং সামাজিক জীবনের নানা সমস্যাকে আধুনিক বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী নবপ্রবর্ত্তনের দ্বারা সংশোধিত ও সরলীকৃত কত্তে চান, তাঁরা দেখ্‌তে পান যে, সনাতনী চিন্তাধারার এই দুর্ল্লঙ্ঘ্য দুর্গটি ভাঙ্গতে না পারলে আর অগ্রসর হওয়া যাবে

না। কিন্তু এসব ব্যাপারে একা একা কেউ ত' অগ্রসর হ'তে পারে না, সমাজ যাদের নিয়ে গড়া, সেই সকল সাধারণ লোককে দলে বলে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। অথচ তারা অধিকাংশেই নিজ নিজ সাংসারিক-পরিবেশ-জাত চির-পোষিত সংস্কারগুলিকে লঙ্ঘন ক'রে চল্‌তে পারে না এবং তাদের প্রতিজনকে নরকের ভয় দেখিয়ে, শাস্ত্র-বচন উদ্ধার ক'রে ক'রে নিয়ত সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন সনাতন-পন্থী প্রাচীন পণ্ডিতেরা, শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সম্পদে যাঁরা সত্য সত্যই ধনী এবং লোকে যাদের চিরকাল মান্য ক'রে এসেছে। এর ফলে, অগ্রগমনোম্মুখ জাতি বারংবার এগুতে গিয়ে গিয়েও থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে, যার ফলে অর্দ্ধ শতাব্দী বা এক শতাব্দী কালের সবল অগ্রগমনকে মাপামাপি কত্তে গিয়ে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, জাতি সেদিন ঠিক যেখানে ছিল, আজও মনে হয় যেন ঠিক সেখানটাতেই আছে। এজন্য অনেকেই সনাতন-পন্থী পণ্ডিতদের এবং তাঁদের সমর্থকদের তীব্র নিন্দা করেছেন কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, সনাতনীদের চিরাচরিত প্রথাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকার এই চেষ্টার মধ্যে বেঁচে থাকার আগ্রহই প্রকটিত হচ্ছে, কারণ অবিরাম অসংখ্য প্রকারের পরিবর্ত্তন যদি কেবলই বিনা প্রতিবাদে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়, তাহ'লে আমরা সত্যি সত্যি থাক্‌ব কিনা, এ প্রশ্নটাও বিবেচ্য। এই জন্যই আমি

গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে মনে করি সমাজ-বৃক্ষের শিকড়,—তাঁরা মাটিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকেন ব'লে ঝড়ে বনস্পতি সমূলে উৎপাটিত হয় নি,—আর সংস্কার-পন্থীদিগকে মনে করি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা,—তারা বিস্তারিত হ'য়ে ঊর্দ্ধগগনে এগিয়ে না গেলে আকাশ থেকে বাতাস থেকে বাড়বার ও বাঁচবার অন্য উপকরণগুলি সংগ্রহ কত্তে পাত্ত না। দুটারই যুগপৎ প্রয়োজন আছে।

সনাতনী পণ্ডিতগণের অন্ধতা ও নিষ্ক্রিয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্যজনক আমার যে বিষয়টা মনে হয়, তা' হচ্ছে সনাতনী পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ আর শূদ্র নিয়ে বিচার বসিয়ে জীবনের সমস্ত অধ্যবসায়টাকে মাটি ক'রে দিচ্ছেন কেন। কে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাল আর কে জন্মাল নবশাখের ঘরে, ব্রাহ্মণের উপবেশনের স্থান থেকে শূদ্রের উপবেশন স্থান কত দূরে হবে, ব্রাহ্মণ কোন্ মন্ত্রটা জপ কত্তে পারবে আর শূদ্র কোন্‌টা পারবে না,—এই সব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, প্রত্যালোচনা, বক্তৃতা, বাগাড়ম্বর, পাতি দেওয়া, আন্দোলন করা প্রভৃতির মধ্যে সত্যিকারের সার্থকতাটা এই যুগে কোথায় আছে, তা' আমি বুঝতে পারি না। ভারতের প্রাচীন মহত্ত্বের

প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই যেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ চেষ্টা এবং আন্তরিক অনুরাগ থাকা অত্যাবশ্যক, সেটি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যের পালন, ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন, ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল ভাবপ্রচার, ব্রহ্মচর্য্যের যোগ্য পরিবেশ বিস্তার। জাতি যদি বীর্য্যবান্ না হয়, তাহ'লে কেবল কি কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র এই তর্ক করেই নিদারুণ ভবিতব্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? লক্ষ লক্ষ ছেলে বিবাহ কচ্ছে, একটা ছেলেও প্রাগ্-বৈবাহিক জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে নাই, বল, তারা কি গার্হস্থ্য-জীবনে নিজ নিজ স্ত্রীকে প্রত্যাশানুরূপ পরিতৃপ্তি দিতে পার্ব্বে? পতির যদি পতি-জনোচিত সামর্থ্যটুকু না থাকে, তাহ'লে কি কেবল চিরুণীর গায়ে সোণার জলে লেখা "পতি পরম-দেবতা" এই মন্ত্রটুকুই স্ত্রীর উপরে যাদুবিস্তার কত্তে সমর্থ হবে? সনাতনী সজ্জনেরা বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত হ'য়েও এই একটা অতীব জরুরী বিষয়ে যে অন্ধ এবং নিষ্ক্রিয় রয়েছেন, এই ত্রুটিটা উপেক্ষণীয় হ'তে পারে না। সংস্কারপন্থীর সংখ্যা দেশে কত? সনাতনী অর্থাৎ সংস্কার বিরোধী পণ্ডিতের সংখ্যা দেশে তার শত শত গুণ। আজ যদি প্রত্যেকটী সনাতনী পণ্ডিত দেশবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে বল্‌তে সুরু করেন, "দেখ, সর্ব্বমঙ্গলের মূলস্বরূপ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি বিবাহিত জীবনে, কি বিপত্নীক অবস্থায়, কি বৈধব্যে, কি পুনর্ভূ-অবস্থায় প্রত্যেকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি হও

শ্রদ্ধাশীল, ব্রহ্মচর্য্য পালনে হও যত্নপরায়ণ, ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মুখ্য সাধনা-রূপে গ্রহণ কর",—তাহ'লে দশ বারোটা বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের রূপ পালটে যাবে। কিন্তু এমন প্রয়োজনীয় কাজটী উপেক্ষা ক'রে তাঁরা চূড়ান্ত পরিশ্রম ক'রে যাচ্ছেন কেবল বামুন-শূদ্রের পার্থক্যটাকে স্পষ্টতর এবং ব্যাপকতর কত্তে। এর চাইতে বড় ভুল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের পক্ষে আর কিছুই হ'তে পারে না।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণকে এই দিক দিয়ে একটী সবল ব্যতিক্রম ব'লে মনে করা যেতে পারে। যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্যের উপরে জোর না খাটিয়ে তিনি সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় কৃষ্টির উত্তরাধিকারী এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতির ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিশ্লেষণ কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন। যুগধর্ম্মের নিয়মেই তাঁর এই বিশেষত্ব-বরণ। এই জন্য তিনি বর্ত্তমান সময়ে সকলের চেয়ে বেশী লোকপ্রিয়। এঁদের সকলের অবদানকেই অপক্ষপাত দৃষ্টিতে গ্রহণ করা উচিত এবং দোষানুসন্ধী মন নিয়ে নয়, গুণগ্রাহী রুচি নিয়ে, এঁদের উপদেশ অনুধাবন কত্তে হয়।

রংপুর
৩১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(১৬ই জুলাই, ১৯৩৫)

রায় বাহাদুর রাধারমণ

প্রাতে নয় ঘটিকায় রায় বাহাদুর রাধারমণ বাবু আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-বন্দনা করিলেন। বলিলেন,—আমি রায় বাহাদুর শরৎ বাবুর নিকট প্রথম দিনই খোঁজ নিয়েছি। তিনি বল্লেন, আপনি দৈনিক শতাধিক পত্রলিখনে ব্যস্ত থাকেন। তাই স্থির কর্ল্লুম যে, আগে থেকে যোগাযোগ ক'রে সময়-নির্দ্ধারণ ক'রে তবে আস্‌ব। শুনেছি, আপনার এখানে সকলের অবারিত দ্বার কিন্তু তাই ব'লে আমি অবিবেচকের মত আপনার কোনো অসুবিধা ঘটিয়ে না দিই, এই বিষয় নিয়েই ছিলাম চিন্তিত। দয়া ক'রে আপনি আমাকে এমন দিনেই দর্শন-লাভের সুযোগ দিয়েছেন, যেই দিনটা আবার পূর্ণিমা। সাধারণ দিনেই সাধুদর্শনে অশেষ পুণ্য, পূর্ণিমার দিনে হ'লে হয় তার ষোল গুণ। সত্যিই আমি ধন্য, আমি ধন্যাতিধন্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিনয়ী লোক দেখ্‌লে মন হয় শুচিস্নাত স্নিগ্ধ। এজন্য আপনাকেও আমার ধন্যবাদ জানাব।

কৃতজ্ঞতা সর্ব্ব-ধর্ম্মের মূল

রায় বাহাদুর রাধারমণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মের মূল সূত্রটী কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে সর্ব্বধর্ম্মের মূল সূত্র হওয়া উচিত কৃতজ্ঞতা। কেউ কিছু করেছে আমার জন্য, এটা যেন আমি স্বীকার কর্ত্তে কুণ্ঠিত না হই। কেউ যে কিছু করে নি আমার জন্য, এজন্য আফশোষ করাই আমাদের অধিকাংশের বিশেষত্ব। কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না যে, আমাদের জন্য তাদের যে কিছু করণীয় থাকতে পারে, এই বোধটী তাদের মনে কে জাগিয়ে দেবে? কৃতজ্ঞতাই নয় কি? জগতের প্রতিটি প্রাণী অপর প্রতিটি প্রাণীর কাছে কোনও না কোনও প্রকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঋণে দায়গ্রস্ত। এই ঋণ পরিশোধের জন্য আমাদের প্রতিজনের চেষ্টা ক'রে যাওয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কিসে হয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ হয়ত বল্‌বেন কালীপূজা কর্ল্লে ধর্ম্ম হয়, কেউ বা বলবেন নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ধর্ম্ম হয়, কেউ বা বল্‌বেন একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভজনা কর্ল্লে ধর্ম্ম হয়, কেউ কেউ বল্‌বেন পরোপকার কর্ল্লে ধর্ম্ম হয়। আমি বল্‌ব, মনকে সাত্ত্বিক, বিনীত ও কৃতজ্ঞ ক'রে তোলার কাজে যে-কোনো অনুষ্ঠান সহায়তা কর্ব্বে, তাতেই ধর্ম্ম হয়। আমরা ঈশ্বর-ভজনা করি মূলতঃ এই প্রেরণায় যে, তিনি তাঁর অপার দয়ায় কত অতুলনীয় সুখ-সমৃদ্ধি আমাদের দিচ্ছেন আবার দুঃখকষ্টক্লেশ দিয়ে দিয়ে সোহাগায় পোড়ান সোণার

মত আমাদিগকে খাঁটি ক'রে নিচ্ছেন,—এটা কৃতজ্ঞতা। আমরা পিতৃমাতৃভক্তি করি এই যুক্তিতে যে, তাঁরা না থাক্‌লে আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে দেখতে পেতাম না, তাঁরা শত প্রকার ত্যাগ স্বীকার ক'রে আমাদের গ'ড়ে না তুল্লে আমরা জগতের বুকে স্বাধীন পদসঞ্চারে পর্য্যটন ক'রে বেড়াতে পারতাম না। সুতরাং তাঁদের সেবা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এটাও কৃতজ্ঞতা। শিক্ষক, অধ্যাপক, গুরু,—এঁরা নিজেরা শ্রম স্বীকার ক'রে আমাদের অন্ধ আঁখিতে জ্ঞানের আলো ফুটাবার চেষ্টা না কর্ল্লে আমরা হয়ত চিরকাল অন্ধই থেকে যেতাম, সুতরাং তাঁদের প্রতি বিনীত, আজ্ঞাবহ, নম্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ আমাদের সঙ্গত।—এটাও কৃতজ্ঞতা। দিনমজুর, চাষাভূষা, গরীব লোকেরা রৌদ্রে মাথা ফাটিয়ে, বৃষ্টিতে কাদা-ভেজা হ'য়ে চাষ-আবাদ ক'রে শস্য উৎপাদন না কর্ল্লে সমস্ত দেশবাসী শস্যাভাবে অনাহারে মরে যেত, সুতরাং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং সুবিচার করবার চেষ্টা করা সঙ্গত।—এটাও কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে যদি জীবনের প্রতিটি কাজ করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে, যে সব কাজকে লোকে ধর্ম্মকার্য্য ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকে, আমরা সে সব কাজই ক'রে যাচ্ছি। কৃতজ্ঞ অন্তর পাপ কার্য্যে প্ররোচনা দেয় না, প্রেরণা দেয় ত্যাগের এবং দানের। সর্ব্বধর্ম্মে ত্যাগ ও দানকে প্রশংসা করা হয়েছে।

গোবরানন্দ গোস্বামী

রাধারমণ বাবু প্রস্থান করিলে অন্য একজন প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—পরোপকারের জন্য কি কি করণীয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরোপকারের জন্য সব কাজই করা যায়, বাদে এমন কাজ যার সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ আছে। একটা গল্প বলি। নাম তাঁর গোবরানন্দ গোস্বামী। খ্যাতিমান্ এক গুরুদেব। বহু শিষ্য তাঁর এবং শিষ্যদের পেট ভ'রে খেতে দিতে তিনি ভালও বাসেন, খেতে দেবার যোগ্য সামর্থ্যও রাখেন। নিজে অতীব নিষ্ঠাবান পুরুষ। দিনে রাতে পঁচিশ বার তুলসী-পত্র চর্ব্বণ ক'রে দেহকে শুদ্ধ রাখেন, পাঁচ বার গোময় খেয়ে পাপনাশ করেন। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর মতি প্রগাঢ় এবং অধিকাংশ সময়েই নামানন্দে থাকেন। স্ত্রী-পুরুষ হাজার হাজার নরনারী তাঁকে দেবতার চেয়েও বেশী ভক্তি করে এবং কেউ কেউ তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার ব'লেও মনে করে। একদিন তিনি পরোপকার সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। উপদেশের মাঝখানে এক শিষ্য প্রশ্ন কর্ল্লে,—প্রভো, বিধবাদের দুঃখ দেখে আমার প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে। এদের কোনো উপায় আপনি কর্ত্তে পারেন না?

গোবরানন্দ জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—কেন, এঁদের আবার কষ্ট কি? নিব্যি হবিষ্য কর্ব্বে আর সংসারের পাঁচ জনের সেবা-যত্ন করার মধ্য দিয়ে ফাঁকে ফাঁকে যতটা পার্ব্বে, কেবল

হরিনাম স্মরণ কর্ব্বে। হরি ছাড়া ত' জীবের আর কোনো গতি নেই।

শিষ্য বল্লে,—না প্রভো, সমাজের লোক তাদের বড় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। বিয়ে-বাড়িতে সধবা মেয়েরা কত নাচে, কুঁদে, হাসে, গায়, আর এরা গেলেই বলে, দূরে যাও, ছুঁয়োনা, এই অলক্ষণে মেয়েটা আবার এখানে এল কেন? সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে? আর লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা কি বাঁচা? এদের একটা গতি করুন।

গোবরানন্দ বল্লেন,—কেন, কেউ যদি এদের বিয়ে করে, তবেই ত' আর বিধবারা বিধবা থাক্‌বে না, সধবা হ'য়ে যাবে। বিদ্যাসাগর মশায় ত' বিধবার বিবাহকে সিদ্ধ ক'রে গেছেন। তবে আর আট্‌কাবে কে?

শিষ্য বল্লে,—আট্‌কাবে সংস্কার। নববিবাহিত বিধবা মনে মনে ভাব্‌বে, আমি ছিলাম কাল অমুকের স্ত্রী, আজ হলাম তমুকের স্ত্রী। তার মনে সঙ্কোচ আস্‌বে, কি ক'রে সে তার নূতন স্বামীকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার ছেড়ে দেয়? তার মনে দারুণ দুশ্চিন্তা আসবে যে, সে অসতী হ'য়ে ত' গেল না? এর ত' প্রতীকার চাই গুরুদেব!

গোবরানন্দ কিয়ৎকাল চিন্তিত মনে বিষয়টা আলোচনা করবার পরে বল্লেন,—তার জন্য ভাবনা কি হে? নূতন স্বামীকে ব'লে দেওয়া হবে যে, বিয়ে ত' কর্ল্লে, কিন্তু তোমার স্ত্রীর দেহ যেন থাকে অকলঙ্ক, নিষ্পাপ, সেদিকে থাক্‌বে

তুমি সাবধান। বিবাহকারী নূতন স্বামী যদি এই নিয়মটী পালন করে, তবেই ত' সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল। সে রান্না-বান্না করার জন্য একটী চমৎকার স্বাস্থ্যবতী বৌ পেল, আবার সন্তানাদি হ'ল না ব'লে সংসারের জঞ্জাল আর দুশ্চিন্তা বাড়তে পারল না। কি বল, এটী চমৎকার ব্যবস্থা নয়?

শিষ্য বল্লে,—ব্যবস্থা ত' চমৎকারই বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সবই ত' এক এক জন প্রকৃত জানোয়ার, প্রকৃত মানুষ কজন? ফলে ব্যবস্থা কেউ মান্‌ল না বা বাইরে মানার ভাণই কর্ল্ল, কার্য্যতঃ নির্দ্দেশ পালন কর্ল্ল না। তার চেয়ে খুব ভাল হয় যদি জিতেন্দ্রিয় পরমহংস সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষেরা এই সব দুর্ভাগা বিধবা মেয়েদের বিবাহ ক'রে তাদের কপালে একটা ক'রে সিন্দুরের টিপ পরিয়ে দেন আর নিজেরা পূর্ণ সংযমের সদাচার চালিয়ে যান। তাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের পক্ষে এটা অসাধ্যও নয়, অসম্ভবও নয়। বিধবারা সধবাও হ'ল, অথচ তাদের নারীমর্য্যাদার বা সতীত্বের সংস্কারে কোনো আঘাত লাগ্‌ল না।

গোবরানন্দ হেসে বল্লেন,—আরে মূর্খ, আমি গোবর খাই ব'লে কি আমার মাথাটাও গোবরে ভরা? বিপন্ন বিধবার উপকারের জন্য তাকে বিয়ে করা ত' নিজের প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-পিপাসাকে কার্য্যের মধ্য দিয়ে ভাষা দেওয়া। অসহায়াকে সহায়তা করার জন্য তাকে বিয়ে কর্ব্ব, নিরাশ্রয়াকে আশ্রয়

দেবার জন্য তাকে বিয়ে কর্ব্ব, দুর্ব্বলাকে বাঁচবার রাস্তায় চলার সাহায্য করার জন্য তাকে বিয়ে কর্ব্ব, শত্রুদের দ্বারা উৎপীড়িতাকে যোগ্য অভিভাবকত্ব দেবার জন্য তাকে বিয়ে কর্ব্ব,—এসব হচ্ছে মায়ার ছলনা, এর ভেতরে পরোপকারও কিছু নেই, সার্থকতাও কিছু নেই। আমি ত' নৈষ্ঠিক গোস্বামী নই, আমি কালাচাঁদী গোঁসাই মাত্র, তবু আমি একথা বুঝবার মত ক্ষমতা রাখি যে, পরোপকারের নাম ক'রে সন্দেহজনক কাজ কত্তে নেই।

শিষ্য বল্লে,—কাজটা সন্দেহজনক হ'ল কি ক'রে প্রভু? আপনার মতন মহাপুরুষেরা ত' নির্ব্বিকার ঈশ্বরকোটির থাক্। আপনাদের আবার পতন কিসে? আপনারা যা' কর্ব্বেন, তাই আদর্শ। আপনারা যা' দেখাবেন, তাই সদ্দৃষ্টান্ত। আপনারা যা' বলেন, তাই ত' অভ্রান্ত শাস্ত্র। আপনাদের পন্থারই ত' অনুবর্ত্তন করে অনন্তকোটি জীব। আপনারা যা' চালাবেন, তাই চল্‌বে। আপনাদের ইচ্ছাকে প্রতিরোধ কত্তে কে পারে?

গোবরানন্দ বলিলেন,—মাথায় যাদের গোবর পোরা থাকে, সেই সব গুরুদেবদিগকে শিষ্যেরা এই ভাবেই বিপথ-চালিত করে। একটা মানুষ যত বড় সংযমী ও ধৈর্য্যশীল পুরুষ হোক না কেন, দুটী স্ত্রী, তিনটী স্ত্রী আর চারটে স্ত্রীকে সমভাবে দেখ্‌তে পারা অসম্ভব। ক্ষেত্র বুঝে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা ও ভালবাসার তারতম্য হবেই হবে। একজনের কাছে

বসলে সারাটি দিন যেন একটা নিমেষে পার হয়ে যাবে, আর একজনের কাছে বসলে একটা মিনিট সময়কে এক যুগের দুঃসহ দুঃখ ব'লে মনে হবে এবং সময় যেন আর কাটে না ব'লে অন্তরে বিরক্তি আস্‌বে। এটা স্বভাবের ধর্ম্ম। বিধবাদের জন্য পরোপকার কত্তে চাও ত' তাদিগকে বিয়ে ক'রে খুব কম উপকারই কত্তে পার্ব্বে, তার চেয়ে তারা যাতে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা তাদের দিয়ে চল। তার ফলে একদিন তারা অনেকেই নিজ নিজ দুঃখ নিজেদের ক্ষমতায় দূর করে দেবে। পরোপকার কত্তে গিয়ে এমন উপায় অবলম্বন ক'রো না, যা' নিত্য নূতন জটিলতা সৃষ্টি কর্ব্বে এবং উপকারকারীর আসল লক্ষ্যটী ভুল হ'য়ে যাবে।

পরোপকারের উপায় সৎ হওয়া চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরোপকারের জন্য নিষ্ঠুর, অন্যায়, অসৎ উপায় অবলম্বনও একেবারে নিরর্থক। ডাকাতি ক'রে অর্থ আন্‌বে, তারপরে সেই অর্থ দিয়ে পরোপকার কর্ব্বে, এগুলি একেবারে অবাস্তব কল্পনা। ডাকাতি আর নরহত্যা যাদের উপায়, তাদের লক্ষ্য যতই মহৎ হোক্ না কেন, কর্ম্মের পথে নেমে গিয়ে দীর্ঘকাল তারা নিজেদের মহৎ লক্ষ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে না।

নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার আবর্ত্তনে তাদের মতি ও গতির পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে এবং কালকের দেবতা আজকের দানবে পরিণত হ'য়ে যায়। একজনকে খুন ক'রে তার রক্ত নিয়ে অন্য জনকে প্রাণদান পরোপকার নয়। একজনকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে অন্য জনের অভাব দূর করা পরোপকার নয়। একজনের সতীত্ব রক্ষার নাম ক'রে অন্য আর একজনের সতীত্বে আঘাত হানা পরোপকার নয়।

পরোপকারের দুইটী সর্ত্ত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরোপকারের থাক্‌বে দুইটী সর্ত্ত। একটী হচ্ছে এই যে, পরের সত্য সত্য উপকার হওয়া চাই। অন্যটী হচ্ছে এই যে, পরোপকার করার ফলে আমার হবে নৈতিক কুশল, চিত্তশুদ্ধি, প্রতিক্রিয়াহীন বিমল আত্মপ্রসাদ। যে পরোপকার করার ফলে আমার নৈতিক অধোগতি হ'ল, চিত্তের অশুদ্ধতা বাড়ল, আত্মপ্রসাদ লাভের স্বাভাবিক পথ কণ্টকিত হ'ল, সে পরোপকার পরোপকার নয়।

রংপুর

১লা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪২

(১৭ই জুলাই, ১৯৩৫)

অপরাহ্ণে সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ডি, এন, মল্লিক আসিয়াছেন। সঙ্গে আসিয়াছেন কলেজের আরও তিন চারিজন জনপ্রিয় অধ্যাপক।

ছাত্র

ছাত্রসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়া কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছাত্রসমাজ বলিতে বুঝা যায় তাদেরকে, যারা ভবিষ্যতে আরও বড়, আরও মহৎ, আরও দক্ষ, আরও বিচক্ষণ হবার জন্য অধ্যবসায়ে নেমেছে। সুতরাং ছাত্রসমাজের কুশলেই সমগ্র জাতিটার কুশল। স্কুলে বা কলেজে যারা পড়ে, মাত্র তারাই ছাত্র নয়। যারা স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগের অভাব সত্ত্বেও, সাময়িক পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের ভবিষ্যৎকে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর কর্বার জন্য উদ্যমশীল, ছাত্র বলতে তাদেরও বুঝতে হবে। একদা জগতে স্কুল-কলেজের প্রবর্ত্তন ছিল না কিন্তু সাধারণ মানুষ, জীবন-সংগ্রামের সহস্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, নিজেকে অসাধারণ ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্য অধ্যবসায়শীল হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে তারাও ছাত্র। যত দৃষ্টিকোণ থেকে যত জনকে এভাবে ছাত্র ব'লে স্বীকার করার সুযোগ আছে, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের সঙ্গে তদ্দেশের তাৎকালিক ও পরবর্ত্তী ভাগ্যের শুভসংযোগ রয়েছে। ছাত্ররা তুচ্ছ নয়।

মানুষের সভ্য হওয়ার ইতিহাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একদা মানুষ ছিল সাধারণ পশুদের মতন উলঙ্গ, হিংস্র, ক্ষুধা ও কাম উপশমের উপায় অন্বেষণে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর এবং অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে

থাকার চেষ্টার ভিতরে যে যৎসামান্য ত্যাগানুশীলনের প্রয়োজন, তৎসম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। কারো কারো নিষ্ঠুরতা এবং রক্তপিপাসা ছিল সার্থকতাহীন এবং খামখেয়ালী। সেই মানুষ যে আজ এক সুসভ্য মানব-সমাজ-রূপে আত্মপ্রকাশ কত্তে পেরেছে, তার প্রধানতম কারণ এই যে, ছাত্র-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কতকগুলি মানুষ তাদের ভিতরে ছিল, যাদের অন্তরে ছিল উন্নতিস্পৃহা এবং অস্পষ্ট ভাবে হ'লেও যারা ভবিষ্যতের দিকে একটুখানি হ'লেও উকিঝুঁকি মারতে পারত। তাদেরই ঔরসে আর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে, তাদেরই চিন্তাগত অনুশীলনের সূক্ষ্ম উত্তরাধিকারকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে পরবর্ত্তী মানুষদের মধ্যে এই সকল সদ্‌গুণকে অধিকতর ভাবে আয়ত্তে আনবার স্বাভাবিক সামর্থ্য নিয়ে নতুন মানুষেরা জন্মগ্রহণ কত্তে লাগ্‌ল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এলোমেলো ভাবে নানা রকমের মানুষের আবির্ভাব হ'তে হ'তে আমরা যাকে সভ্যতা ব'লে মনে করে থাকি, তার ছাপ নিয়ে অনেক মানুষের আবির্ভাব ঘট্‌তে লাগ্‌ল। মানুষের সভ্য হওয়ার ইতিহাসটা হচ্ছে এই।

আমার সাধের স্বপ্ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ইতিহাসেরই সুষ্ঠু অনুবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, স্বেচ্ছাকৃত অনুবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে,

বুদ্ধিযুক্ত অনুবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে ভাবী জগতের পূর্ণ মানবেরা সহজে আবির্ভূত হবেন। এই একটী সুখস্বপ্ন নিয়ত দেখছি ব'লেই আমি শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কোনও প্রকার ক্লেশকে গণনায় না এনে স্থান থেকে স্থানান্তরে পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্ছি। আমার সাধের স্বপ্ন ভবিষ্যতের ভারত, ভবিষ্যতের জগৎ।

বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষণ-শৈলী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিদ্যালয়ে আর মহাবিদ্যালয়ে জড়বিজ্ঞান, শক্তিবিজ্ঞান, চিন্তাবিজ্ঞান এবং অন্য সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ভূগোল আদি পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিটি ছাত্রের দৃষ্টি ঐ এক মহনীয় ভবিষ্যতের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা অবিরাম সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধ'রে চলতে থাকে, তাহ'লে অন্তরের নবজাগ্রত অভীপ্সার প্রভাবে যুবক-যুবতীবৃন্দ এক আদর্শ জীবনের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবে। সৎশিক্ষা যদি দিতে হয়, তবে মানতে হবে যে, এইটীই হচ্ছে সেই শিক্ষার সার্থক শিক্ষণ-শৈলী। যুবকেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়বে, আমরা শুধু তাদের জানিয়ে দিয়ে খালাস যে, তাদের জীবন তাদের একার নয়, সমগ্র বিশ্বজগতের মূল্যবান্ সম্পদ, তাদের ভবিষ্যৎও তাদের একার নয়, সমগ্র জগতের স্পৃহনীয়

ভবিষ্যতের সঙ্গে তা' ওতপ্রোত ভাবে সংবদ্ধ। একটী ছেড়ে আর একটীর আলাদা হবার উপায় নেই।

মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা

স্থানীয় একটী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক প্রশ্ন করিলেন,—এই যে এক একটা বংশে হঠাৎ হঠাৎ এক একটা অতীব ভীতিজনক চরিত্রের লোকের আবির্ভাব হয়, এর কারণটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারণ নিশ্চয়ই আছে, তবে সবগুলি কারণ সঠিক ভাবে এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। এক্দা মানুষ খুবই নিষ্ঠুর ছিল, নির্দ্দয় ছিল, অকারণে হিংসাশ্রয়ী ছিল, এমন কি যাকে দিয়ে তার সুখ-পরিতৃপ্তি, সাময়িক সুখসোহাগের পরে নির্ম্মম ভাবে তাকে হত্যা ক'রে ফেলেও সে এক পাশবিক আনন্দ উপভোগ কত্ত। ক্রমশঃ উন্নতির পথে স্বাভাবিক নিয়মে ধাবিত হ'তে হ'তেও তার শরীরের প্রত্যেকটী জীবকোষের সে শ্লাঘ্য উন্নতি সাধন কত্তে এখনো পারে নি। তাই, তার শরীরের কোনো কোনো জীবকোষে আদিম রিরংসা, আদিম হিংস্রতা, আদিম নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান রয়ে গেছে। এক একটা উন্নতিশীল সুন্দর বংশে যে হঠাৎ হঠাৎ এক একটা অতীব ভীতিজনক চরিত্রের লোককে আবির্ভূত হ'তে দেখা যায়, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ এই। এর প্রতীকার মানুষের পক্ষে অসাধ্য নয়,

সুসাধ্যও নয়, অতীব দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য এই কারণে যে প্রতীকার-চেষ্টা এক পুরুষ ধ'রে চল্‌লে হবে না, চালাতে হবে ক্রমান্বয়ে নয়টী পুরুষ ধ'রে। পুরুষানুক্রমিক ভাবে নয়টী প্রজন্ম ধ'রে ধ'রে এই সংশোধন-চেষ্টা চল্‌লে মানুষ এক নূতন প্রজাতি সৃষ্টি কর্ব্বে, যাদের শরীর-মধ্যস্থ প্রতিটি জীবকোষ এক নূতন দেবজাতির জন্মদাতা হবে। এই নবজন্ম মানুষেরই সাধ্য, পশু, পক্ষী, পতঙ্গদের নয়। এই জন্যই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় এবং এটাই মানুষের উপরে সব চেয়ে বড় প্রত্যাশা এবং দায়িত্ব। আমি যখন তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথাটাই বলি।

মনুষ্যজাতিরও স্বেচ্ছাকৃত ক্রমোন্নতি প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঘটনার কি চমৎকার পরিহাস যে, মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সদ্‌ব্যবহার ক'রে গোজাতি, মহিষজাতি, শূকরজাতি, ঘোটকজাতি, ইন্দুরজাতি, খরগোশজাতি প্রভৃতি নিয়ে কত পরীক্ষা কত নিরীক্ষা কচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন যে মানুষকে নিয়ে, এই বিরাট সত্যটার সম্পর্কে একেবারেই অন্ধ। গো-শূকর-মূষিকাদিকে স্বেচ্ছামত ইন্দ্রিয়-বিহার কত্তে দেওয়া হবে না।

হবে বৈজ্ঞানিকের ইচ্ছামত সঙ্গমাসক্ত হ'তে। উদ্দেশ্য, উৎকৃষ্টতর তত্তৎ জাতির প্রাণীর আবির্ভাবকে সম্ভবপর ক'রে তোলা। অথচ, মানুষদের জন্য থাক্‌বে খোলা ভাটি, যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে, যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবে, যখন ইচ্ছা তখন, যতবার ইচ্ছা ততবার নিজের খোশ-খেয়াল-মাফিক নারীর বা পুরুষের সঙ্গ ক'রে যাবে এবং সন্তান-সন্ততি-রূপে পৃথিবীকে কতকগুলি জঞ্জাল এবং গলগ্রহ উপহার দিতে থাক্‌বে। কেন মনুষ্যজাতি পণ কর্ব্বে না যে, তাদের যৌন আচরণ এমন একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই পরিচালিত হবে, যার ফলে নির্দ্দিষ্ট মানুষের রজোবীর্য্যে উৎকৃষ্টতর মানুষের আর্বিভাবকে সম্ভবপর করা যায়, যার ফলে হীনবুদ্ধি মানুষের ঘরেও জৈবিক উৎকর্ষহেতু উদারচেতা মানুষের আবির্ভাবের রাস্তা খুলে যায়, দুর্ব্বল ক্ষীণবুদ্ধির ঘরেও বলবান্ মেধাবী পুরুষদের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়। বিশ্বজগতের সার্ব্বিক কল্যাণের দিকে তাকাতে গেলেও এই কাজ আমাদের প্রথম করণীয়, দেশবাসী সকলের সর্ব্বজনীন অভ্যুদয়ের দিকে তাকালেও এইটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। মানুষের জৈবিক উন্নতির জন্য মানুষকেই আজ উদ্যমী হতে হবে, কারণ মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার সদ্‌ব্যবহারের ক্ষমতা পেয়েছে, যেমনটা ইন্দুর, বাঁদর, কাক, চিল, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর বা গরু পায় নাই।

বাদ ও স্বাদ

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত একটী ধর্ম্মীয় আখড়ার মোহন্ত বাবাজীও আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, দ্বৈতবাদ্ আর অদ্বৈতবাদ এই দুটোর মধ্যে কোনটী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা? দার্শনিক মতামতের পার্থক্য নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে আর জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে এত লড়াই যে, শুনতে শুনতে আমাদের কাণে ব্যথা হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দুটাই বাদ মাত্র, স্বাদ নয়। প্রয়োজন হচ্ছে স্বাদের। স্বাদ পেলাম ত' সঙ্গে সঙ্গে 'বাদ' নির্ব্বাক্ হ'য়ে গেল, মতবাদের বাদ-প্রতিবাদ থেমে গেল, চিদানন্দঘন প্রেমসুন্দর পরমাত্মার কৃপা সমগ্র অস্তিত্বকে একেবারে আচ্ছাদিত ক'রে ফেল্‌ল, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' কথাটা স্বরূপে সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল। দ্বৈতবাদ সত্য, না অদ্বৈতবাদ সত্য, এটা একটা প্রশ্নই নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, যাঁকে কেউ নাম দিয়েছেন পরমাত্মা ব'লে, কেউ নাম দিয়েছেন পরমেশ্বর ব'লে, যাঁর প্রকৃত প্রস্তাবে নামকরণ সম্ভব নয় ব'লেই যাঁর নামের সংখ্যা অনন্ত, যাঁকে সত্য ব'লে জান্‌লে আর কিছু জানার প্রয়োজন থাকে না, যাঁকে জেনেও জানা যায় না, আবার যাঁকে না জেনেও জানা যায়। বিচিত্র-রহস্যময় পরমেশ্বরই জীবের একমাত্র

বেদিতব্য, একমাত্র জ্ঞাতব্য, একমাত্র আস্বাদিতব্য, একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্য, একমাত্র আশ্রয় ও একমাত্র গতি। আমার অস্মিতা-বোধ ব'লে দিচ্ছে আমি আছি। বিনা চেষ্টায় লব্ধ এক সহজ সংস্কার আমাকে ব'লে দিচ্ছে, তিনি আছেন। সেই তিনি কেমন, আর আমিই বা কেমন, এই প্রশ্ন থেকেই যাবতীয় দার্শনিক বিচারের সৃষ্টি। তিনি যদি আছেন, তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি, আমি যদি আছি, তবে আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা কিরূপ, তিনি আমার উপরে নির্ভরশীল, না আমি তাঁর উপরে ভিত্তিমান, তিনি আমার, না আমি তাঁর, ইত্যাদি প্রশ্ন অন্তরে আপনা আপনি জেগে ওঠে এবং প্রাণমন এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য হয় ব্যাকুল। জগতের যাবতীয় পরিশুদ্ধ ধর্ম্মচিন্তার মূল উৎসটী এইখানে। কিন্তু জীবে জীবে কত বৈচিত্র্য। তুমি আমার মত নও, আমি তোমার মত নই, তুমি আমার পরিবেশে জাত ও বর্দ্ধিত হও নি, আমি তোমার পরিবেশে জাত ও বর্দ্ধিত হই নাই, ফলে কেবল শারীরিক আকৃতিতে বা চরিত্রাংশেই তোমার আমার মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয় নাই, তুমি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বরহস্যের মূলানুসন্ধান কর্ব্বে আর আমি কোন্ বিশেষ ভঙ্গীতে বিশ্বরহস্য-সাগরে সন্তরণ বা অবগাহন কর্ব্ব, তার পার্থক্যও তোমার ও আমার চিন্তা-প্রণালী ও আস্বাদান-শৈলীর পার্থক্য বিধান ক'রে দিচ্ছে। ফলে, আম খেয়ে তুমি স্বাদের চেয়ে গন্ধ পাও বেশী, আমি গন্ধের চেয়ে স্বাদটা পাই

বেশী, তুমি আমটার রূপ দেখে অভিভূত হও, আমি আমের ভিতরে প্রতিটি রসবিন্দুর স্বভাব-সঞ্জাত গুঞ্জন শুনে একান্তভাবে মুগ্ধাতিমুগ্ধ হই। আস্বাদনের এই পার্থক্য থেকে, তোমার জন্য এক প্রকারের বাদ বা মতবাদের যুক্তিনিচয় রচিত হয়, আমার জন্য আর এক প্রকারের বাদ বা মতবাদের কাঠামো তৈরী হ'য়ে যায়। লোকে তোমাকে বলে দ্বৈতবাদী, আমাকে বলে অদ্বৈতবাদী, তোমাকে বলে সগুণসাধক আমাকে বলে নির্গুণ উপাসক ইত্যাদি। মতবাদের এক একটা পার্থক্য থেকে এক একটা দার্শনিক স্কুল বা পরম্পরার সৃষ্টি হ'য়ে যায় বা স্বাদের দিকে লক্ষ্য হারিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদের বিসম্বাদ নিয়ে মত্ত হ'য়ে যান। আমার মতে, ওদিকে তাকাবার দরকার নেই। পৃথিবীর সব লোক কখনো একই মতবাদ বা থিয়োরির উপরে নির্ভরশীল হবে না, হতে পারে না। আমার মতে, প্রত্যেক মতবাদী ব্যক্তিই নিজের মতবাদের দ্বারা পূর্ণতঃ লাভবান্ হ'তে পারেন, যদি মতবাদের অনুকূল সাধননিষ্ঠা নিয়ে সুদীর্ঘকাল সমপ্রযত্নে সাধনকর্ম্ম ক'রে যান। তিনি যখন স্বাদ পেলেন, তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যাই হোক্ না কেন, তাঁর জীবন ধন্য হ'য়ে গেল। কোনো মতবাদের বিজয় গাইবার জন্য মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই, যে-কোনো মতবাদের মধ্য দিয়ে এগুতে এগুতে সে যে পরম সত্যকে জান্‌ল, তা' দিয়েই তার জীবন সার্থক। আমার মতে,

প্রত্যেকটী মতবাদই মানুষের মানসিকতার গঠন ও চিন্তাশীলতার বিশেষ ধারা অনুযায়ী কারো না কারো পক্ষে সত্য। একটী মত আমার পক্ষে সত্য ব'লে অন্য একটা মতকে অন্যের পক্ষে মিথ্যা হ'তেই হবে, এই যুক্তি আমার কাছে অচল।

জীব ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়া মতভেদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। তাঁর দৃষ্টিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। তাঁর প্রবর্ত্তিত সাধন-পন্থা যদি এই ভাবনার পরিপাক-পন্থী হ'য়ে থাকে, তবে এই মতাবলম্বীরা নিশ্চয়ই পরম সত্যকে লাভ ক'রে নিজেরা প্রতিজনে কৃতকৃতার্থ হবেন এবং ধরিত্রীবাসী প্রত্যেক প্রাণীকে ধন্যাতিধন্য কর্ব্বেন। এই বিষয়ে সংশয় নিষ্প্রয়োজন। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী, তাঁর মতে স্রষ্টা ঈশ্বর ও সৃষ্ট জীব সর্ব্বতোভাবেই ভিন্ন, এরা অভেদ, অভিন্ন হ'তে পারে না। পরস্পর থেকে ভিন্ন থেকেই এঁরা পরস্পরকে হয় কৃপাসূত্রে, নয় ভক্তিসূত্রে ধ'রে আছেন। মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সাধন-পন্থা যদি এই ভাবনার পরিপাক-পন্থী হয় এবং এই মতাবলম্বনকারীরা যদি সেই সাধনেই আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁরা পরম সত্যকে লাভ ক'রে নিজেরা ধন্য হবেন, জগৎকেও ধন্য কর্ব্বেন। রামানুজাচার্য্য

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি জীব ও ব্রহ্মের ভিতর অটুট সম্বন্ধকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন আবার জীবকে ব্রহ্মের একটী বিশেষণ বা বিভাব-রূপেও লক্ষ্য করেছেন। রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সাধন-পন্থা যদি এই ভাবনার পরিপাক-পন্থী হয় এবং এই মতাবলম্বনকারীরা যদি সেই সাধনেই আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থাক্‌বেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁরা পরম সত্যকে লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হবেন এবং জগৎকে ধন্য করবেন। আচার্য্য নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী। তাঁর মতে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভিন্নতা অবশ্য-স্বীকার্য্য কিন্তু ভিন্নতাও সত্য। যুগপৎ এই ভেদভাব আর অভেদভাব সিদ্ধ হওয়া ত' সম্ভব নয়, এ প্রশ্ন উঠ্‌লে তার একটা সুন্দর জবাবও দেওয়া হয়েছে। মতবাদ যাই হোক্, সেই মতবাদানুযায়ী সাধনের পন্থা যদি কেউ পেয়ে থাক্‌বেন আর তিনি যদি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে সেই পন্থার অনুবর্ত্তন করেন, তাহ'লে তিনি একদা স্বাদ পাবেনই পাবেন, সেই পরম রসাস্বাদ সকল বাদের ঊর্দ্ধদেশে তাঁকে নিয়ে যাবে এবং তাঁকে সর্ব্বমত ও সর্ব্বপথের প্রতি সমদৃষ্টিশীল ও সুপ্রসন্ন ক'রে তুল্‌বে। জীব ও পরমেশ্বরের সম্বন্ধ সম্পর্কে এই যে নানা রকমের মত, তাও এক প্রকারের উপলব্ধির ফল। আংশিক উপলব্ধি ছাড়া কোনো মতবাদের সৃষ্টিই হ'তে পারে না। কিন্তু সেই মতবাদ-অনুযায়ী সাধন ক'রে ক'রে আরও একটা উপলব্ধি বা স্বাদ আসে, যা' গভীরতর এবং অনেক সময়ে প্রায়-অনির্ব্বচনীয়। যা' যাঁর

মতবাদ, সাধন তাঁর সেই মতবাদের অনুকূল হওয়া চাই। মতবাদ আমার অদ্বৈততত্ত্ব নিয়ে আর সাধন কর্‌বো আমি অন্য তত্ত্ব অনুযায়ী, এর ফলে প্রকৃত সত্যাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে। মুখে মুখে, তর্কস্থলে বা শাস্ত্রীয় বিচারের কালে যিনি অদ্বৈতবাদী, তাঁকে যদি দ্বৈতবাদ-পোষক সাধন-ভজন ক'রে দেখা যায়, তবে অনুমান করার কারণ ঘটবে যে, এই সাধকের বাক্যবল একদিকে ধাবিত হচ্ছে, মনোবল অন্যদিকে ধাবিত হচ্ছে,—ফলে প্রকৃত আস্বাদন লাভে হয়ত দেরী হবে। মায়া যে অসত্য, নিখিল জগৎ যে মায়া, ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য বস্তু, তিনি নির্ব্বিশেষ এবং তাঁর আর জীবের মধ্যে কণামাত্রও ভিন্নতা নেই,—এইটী যাঁর মত, তাঁর সাধনপন্থা তদুচিত হ'লেই সিদ্ধি হস্ত-করতলগম্যা এবং তারই প্রভাব দিগ্‌বিদিকে এমন ভাবে বিস্তারিত হবে যে, বিনা উপদেশে লক্ষ লক্ষ লোক পঙ্গপালের মতন এই সাধনে দীক্ষিত হবার জন্য ছুটে আস্‌বে। জীব ও ব্রহ্ম যে কখনো এক হ'তে পারে না, এক হ'তে গেলে প্রেমরস আস্বাদন যে হ'য়ে যায় অসম্ভব, একজনকে যে সেব্য হ'তে হবে, আর একজনকে যে সেবক হ'তেই হবে, এই দুইয়েরই যে নিত্যত্ব স্বতঃসিদ্ধ এবং এই দুইয়ের নিত্যত্বের মধ্য দিয়েই যে ভক্তিরসের চরমোৎকর্ষ, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম যে কোনও অবস্থাতেই অভেদ নয়, অভেদ হ'তেও পারে না,—এইটীই যাঁর মত, তাঁর সাধনপন্থা তদুচিত হ'লেই পরম প্রাপ্য হস্ত-

সুলভ্য হবে এবং তাঁর জীবনের সাধন-ঋদ্ধি সাধন-সিদ্ধি ভুবনমঙ্গল বিশ্বত্তর মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্বে। জীব যে ব্রহ্মেরই অংশ-স্বরূপ, তাঁরই শক্তি যে হচ্ছে মায়া, তাঁরই কার্য্য যে হচ্ছে মায়া, তাঁরই কার্য্য যে হচ্ছে জগৎ, এজন্য জীব, মায়া বা জগৎ সবই যে হচ্ছে ব্রহ্মপদবাচ্য, এই হচ্ছে যাঁর মতবাদ, তাঁর সাধনপন্থাও তদুচিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই সাধনে তাঁকে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থাক্‌তে হবে, যার ফলে তিনি এমন গভীর এক আস্বাদন পাবেন, যা' পেয়ে নিজে ধন্য হবেন, যা' বিলিয়ে লক্ষ কোটি প্রতপ্ত প্রাণকে শীতল কর্ব্বেন। জীব যে ব্রহ্মবস্তু থেকে কোনো পৃথক্ বস্তু নয়, আবার সে যে ব্রহ্মের সাথে অভেদ বস্তুও নয়, জীব যে যুগপৎ ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন আবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন, জীবও যে সত্য, ব্রহ্মও যে সত্য, কিন্তু সত্য বস্তু যে বহু নয়, সত্য বস্তু যে এক, জীব যে অসত্যও নয়, অদ্বয় ব্রহ্ম থেকে জীব যে ভিন্নও নয়, পরন্তু পরমতত্ত্ব যে দুই নয়, পরমতত্ত্ব যে বহু নয়, পরমতত্ত্ব যে এক এবং অদ্বিতীয়, পরমেশ্বরের অচিন্ত্য এক লীলাবেশে যে এই বিপরীত-ধর্ম্মী Paradox (স্বতোবিরোধ) সামঞ্জস্যীভূত হয়েছে,—এইটিই যাঁর দার্শনিক মতবাদ, তাঁরও সাধনপন্থা তদুচিত হওয়া আবশ্যক এবং সেই পথে তাঁকে অবিচলিত বিক্রমে চলতে হবে মত্ত হস্তীর বিক্রমে। তাহ'লেই তিনি একদা পরমতত্ত্বের মধুস্বাদ আস্বাদন ক'রে কৃতার্থ হবেন।

দার্শনিকের মতবাদ সৃষ্ট হচ্ছে এক প্রকার ভাসা ভাসা উপলব্ধির উপরে যুক্তি-তর্কের গবেষণাগারে, সাধকের আস্বাদন পুষ্ট হচ্ছে রাসায়নিকের ভিয়েনে, যেখানে টগ্‌বগ্ ক'রে মধু রস ফুট্‌ছে, সাধক কখন টুপ্ ক'রে নিজের অস্তিত্বটাকে ঐ ভিয়েনের টগ্‌বগন্ত রসের মধ্যে ফেলে দিয়ে আত্মহারা হবেন, তার মাত্র প্রতীক্ষা। আত্মহারা হ'লে কি নয়নে সুধা ব্রক্ষিত হ'য়ে গেল, কর্ণে সুধা প্রবেশ ক'রে গেল, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কেবল একটী জিনিষই কাজ কর্ত্তে লাগল, তার নাম সুধা, অমৃত, পীযূষ, তার স্বাদ মধুর, মধুরতর, মধুরতম, তার সৌগন্ধ্য অবর্ণনীয়, তার স্পর্শ সুখকর, শান্তিকর আনন্দজনক। এই মধুটুকুর প্রকৃত ও পূর্ণ আস্বাদন দেবার জন্য গোড়াতে তোমাকে একটা ঢিলেঢালা জলো আস্বাদন দিয়ে নির্দ্দিষ্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছিল, যার ফলে প্রারম্ভ-সময়ে তুমি ছিলে নিজ মতবাদের প্রতি গোঁড়া এবং সম্ভবতঃ অন্য মতবাদের প্রতিবাদী, যার চূড়ান্ত সময়ে তুমি সর্ব্বমতে, সর্ব্বপথে, সর্ব্বধর্ম্মে, সর্ব্বতন্ত্রে কেবল একটী জিনিষই দেখতে পাচ্ছ,—ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

সাধারণ ধর্ম্মীয় সংস্কার ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবের সঙ্গে পরমেশ্বরের সম্বন্ধ কি, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোথায় কতটুকু যোগ আর কোথায় কতটুকু বিয়োগ, এটা ত' হ'ল দার্শনিকের চুলচেরা

বিচারের প্রশ্ন। কিন্তু দার্শনিক যেখানে অনুপস্থিত, মানুষের নিত্যভজনশীল মন যখন তার প্রকৃত পরিবেশের মধ্যে বিরাজ করে, তখনও সে পরমেশ্বর সম্পর্কে কত রকম ভাব, অনুভব, উপলব্ধি, অনুমান, আশা, প্রত্যাশা বা অনুরাগ আস্বাদন করে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, পূজ্য নেই, বরণীয় নেই। কেউ এভাবে ভাবেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় আর তাঁর বার্ত্তা জগতে এনে পৌছে দিলেন তাঁরই প্রিয় এক পুত্র তাঁরই অবতার হ'য়ে, অথবা তাঁরই পরম এক ভক্ত, তাঁরই বার্ত্তাবহ হ'য়ে, এই ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ ছাড়া আর কাউকে ধর্ম্মের জগতে মানবার প্রয়োজন নেই। কেউ এভাবেও ভাবেন। একই ঈশ্বর সহস্র সহস্র দেবতা হ'য়ে জগন্ময় পূজিত হচ্ছেন এবং তাঁর পূজার প্রণালী বিচিত্র ও অনন্ত, কোনো দেবতাই মিথ্যা নন, কোনো পূজাই ব্যর্থ নয়। কেউ এভাবেও ভাবছেন। ভাবছেন ত' ঠিকই কিন্তু স্বাদ পাচ্ছেন কি? কোনো মধুস্বাদ, যা' জন্মমরণ ভুলিয়ে দেয়? যা' হিংসা-বিদ্বেষ মিলিয়ে দেয়? যা' পাপতাপ প্রশমিত ক'রে দেয়? যা' দুঃখকষ্টকে সার্থক ক'রে দেয়? যা' আপন-পর সবাইকে সমান ক'রে দেয়? নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ধারণানুযায়ী কাজ কত্তে কত্তে যদি তার ভিতর দিয়ে পরমমধুর স্বাদকে পাওয়া যায়, তবেই শান্তি। যেখানে শান্তি, সেখানেই ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ সফল। ধর্ম্মের ফল শান্তি, ধর্ম্মের মূল ভগবান্, ধর্ম্মের কাণ্ড সুনির্দ্দিষ্ট দার্শনিক

মতবাদ, ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা নানা মতের নানা পথের প্রতি নির্ব্বিদ্বেষ শ্রদ্ধা।

রংপুর
২রা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
(১৮ই জুলাই, ১৯৩৫)

মৌনকালে করণীয়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী আছেন।

কয়েকজন ভদ্রলোক কিছু জিজ্ঞাসা নিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া জানাইলেন,—"মৌনাবস্থায় লেখালেখি করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলে মৌনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বিশেষ ভাবে খর্ব্বিত করা হয়। এজন্য মৌনের সময়ে অঙ্গভঙ্গী করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা বা লেখালেখি করিয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতে বিরত থাকিতে পারিলে মৌনাবলম্বনকারীর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা হয়। নিতান্ত প্রয়োজন পড়িলে লেখালেখি করিয়া মনোভাব প্রকাশ দোষাবহ নহে, তবে তাহাও যতটা বর্জ্জন করিয়া চলা যায়, ততটাই ভাল। মৌন মনকে যাহাতে বিশ্রাম দেয় এবং পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরে মনকে যুক্ত রাখিতে যাহাতে সাহায্য করে, সকলেরই সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ভাল।"

ইহার পরে সারাদিন আর কেহ প্রশ্নোত্তর নিয়া বিব্রত করিতে আসেন নাই।

রংপুর
৩রা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪২
(১৯শে জুলাই, ১৯৩৫)

ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে বাঁচিবার উপায়

জনৈক যুবক প্রশ্ন করিল,—আত্মোন্নতি আর করব কি ক'রে? সব সময়ে একটা না একটা ঝড়-ঝঞ্ঝা ত' লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব সময়ে মনকে অন্তর্মুখ রাখ। বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচবার এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। মরুভূমির যাত্রীদের খবর বা বিবরণ শুনেছ কি? ঝড় আস্‌বার আগে যাত্রিবাহী উটগুলি নিজ নিজ মাথা বালুর ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় আর যাত্রীরা নিজ নিজ কাঁথা কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে তার উপরে কিছু বালি চাপিয়ে দেয়। যতক্ষণ ঝড় চলে, ততক্ষণ তারা অতি কষ্টে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টেনে কোনো প্রকারে বেঁচে থাকে। ঝড় থেমে গেলে বালুকা-বিস্তারের তলা থেকে মাথা তুলে এনে আবার দৃঢ়পদে নিজেদের গন্তব্য পথে চলতে থাকে। বিপদ এলেই ঘাবড়ে যেও না। মনকে কেবল অন্তর্মুখ কত্তে থাক। মনকে হৃদয়-গুহার অন্তরালে অতীব সুশীতল শান্ত আশ্রয়ে লালন কর। মন এতে বল লাভ কর্ব্বে এবং বিপদ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তোমাকে দ্বিগুণ সামর্থ্যে সহায়তা ক'রে যেতে থাক্‌বে। শান্ত

মনই বিপদ অতিক্রমণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সহায়। বিব্রত না হ'য়ে কেবল অন্তর্মুখ হও।

মানব-সভ্যতার সার্থকতা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনুষ্য-জাতির অভ্যুদয়-কল্পে আমরা সত্য সত্য কোনো সেবাই দিতে পারব না, যতক্ষণ না আমরা মানুষের স্বভাবকে পরিবর্ত্তনের পথে ধাবিত কত্তে না পার্ব্ব। মানুষ মূলতঃ একটী জন্তু। জন্তুর ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য এবং উদর-পূরণের জন্য যে-কোনো কাজকে কত্তে রাজি হওয়া। মানুষকে এই প্রাকৃতিক প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে হবে এবং সে এ চেষ্টায় সফল হবে তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন-সাধনের মধ্য দিয়ে। জড় বিচারে মানুষের ভিতরে জন্তু-জানোয়ারের স্বভাব স্বাভাবিক হ'লেও চৈতন্যের স্বাভাবিক বিকাশের দিক থেকে বিচার কর্ল্লে মানুষের ভিতরে দেবত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। যেটী এখন তার মধ্যে শুধু আভাস, তাকে তার মধ্যে প্রকাশ রূপে দেখ্‌তে হবে। এখন যেটি তার মধ্যে স্বল্পমাত্রায় লভ্য, সেটিকে তার ভিতরে প্রকটিত দেখতে হবে পরম প্রাচুর্য্যে এবং অশেষ ঐশ্বর্য্যে। তার ভিতরের দেবত্ব তাকে ভিতরে ও বাইরে উভয়ত্র বন্দনীয় কর্ব্বে। মানুষকে এই প্রগতির পথে পরিচালিত করার সার্থকথার মধ্যেই মানব-সভ্যতার সার্থকতা। জড়প্রকৃতির

গুপ্ত রহস্যকে আবিষ্কার ক'রে তাকে আত্মসুখের পরিতর্পণে ব্যবহার করার যোগ্যতা বা তাকে বিশ্ববিনাশের হেতুরূপে পরিণত করার ক্ষমতা-লাভকে মানব-সভ্যতার সার্থকতা ব'লে ভ্রম ক'রো না। বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানুষের হউক, আর না হউক, তার মনঃপ্রবৃত্তিগুলির উন্নতি চাইই চাই, যা না হ'লে মানুষ মানুষ্যপদবাচ্যই হয় না।

আপদুদ্ধারের জন্য মানৎ করা

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপদুদ্ধারের জন্য বা সৌভাগ্যদয়ের প্রার্থনা নিয়ে অনেকে অনেক দেবতার কাছে অনেক প্রকারের মানৎ করে। এই মানতগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে পরমেশ্বরকে খুশী ক'রে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু অনুগ্রহ আদায় ক'রে নেওয়া মাত্র। এর ভিতরে একটু দোষ আছে। দোষটী এই যে, পরমেশ্বরের স্বাভাবিক করুণায় আমার বিশ্বাস গভীর নয়, তাঁকে নানা ভোগে, উপচারে, ব্রতে, উপবাসে, উৎসর্গে ও সংযমে সন্তুষ্ট কল্লে তিনি আমার প্রতি করুণাঘন নয়নে তাকাবেন, এই ধারণাই কাজ ক'রে যাচ্ছে। এতে ভগবানকে ছোট ক'রে দেওয়া হচ্ছে। যেন, থানার এক ঘুষখোর দারোগা, কিছু ঘুষ না পেলে কারো কোনো কাজ করে দেবেন না। এসব ধারণার উৎপত্তি হয়েছে আদিম যুগের অসম্পূর্ণ মনোভঙ্গীর অগঠিত সাধারণ মানুষের অন্তরের ভীতি বা লোভ থেকে।

সভ্য যুগের উন্নত মানুষ ভগবানকে সেই দৃষ্টিতে কখনো দেখবে না। তারা ভাববে, ভগবানের প্রীত্যর্থে পুণ্যময় কাজ সব শুধু ক'রে যাবার চেষ্টা কর্ব্ব, শুভ কাজের শুভফল তিনি দিবেনই দিবেন, কারণ তা' দেবার তাঁর ক্ষমতা আছে। একদিন এমনও হতে পারে যে, নানা দেবদেবীর কাছে ধর্ণা না দিয়ে মানুষ ভগবানের একটী নামের চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে বিপদে উত্তরণ, সম্পদে সমর্থন, দুঃখে আশ্বাস ও অশান্তিতে বিশ্বাস আহরণ কর্ব্বে। মানৎ করা দোষের নয়, তবে ভগবান্ যদি মানসিক পূর্ণ না করেন, তাহ'লে তাঁর প্রতি রোষ-ভাব পোষণ চলবে না। আর, মানসিক কত্তে গিয়ে জীবহিংসাকর কর্ম্ম সম্পর্কে কোনও সঙ্কল্প না করাই ভাল।

ওঙ্কার-উপাসনার নামে মানৎ

প্রশ্ন হইল,—আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ দেবতার নামে মানৎ কর্ল্লে সব চেয়ে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনের অসম্পূর্ণ ব্যাকুলতা পূরণের জন্য যদি কাউকে কোনো মানৎ কত্তেই হয়, তবে তা' অনায়াসে ওঙ্কার-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, আমার যদি অভীপ্সা পূরণ হয়, তবে আমি সকলকে নিয়ে আনন্দ ক'রে ওঙ্কার-বিগ্রহের সমক্ষে

সমবেত উপাসনা দেব। কারণ, ওঙ্কারে কোনো মতাবলম্বীর সহিত বিরোধ নেই। ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের আদিমন্ত্র। ওঙ্কার সর্ব্বসমন্বয়ী মন্ত্র। ওঙ্কার সর্ব্বতত্ত্বের সমাহার-সাধক মন্ত্র। ওঙ্কার সব সত্যকে স্বীকারের মন্ত্র। মন্ত্রকেই মন্ত্রোপলক্ষিত পরমেশ্বরের প্রকাশমান সত্তা জ্ঞান ক'রে মানৎ করা যেতে পারে। যে ভক্তিভাবে এরূপ কর্ব্বে, তার প্রার্থনা পূরণের ঘটনা আমরা স্বচক্ষে অনেক দেখেছি। তবে, এরূপ মানৎকে কখনো তামসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে কোনো মানৎ কর্ম্মে মানৎকারীর মনে যে একটা বল আসে, এটা সত্য। সুতরাং আদিম যুগের মানুষের অগঠিত অবস্থারই এটা একটা ভগ্নাংশ ব'লে একে আখ্যা দিলেও এর যে একটা উপযোগিতা আছে, তা' অস্বীকার করা যায় না।

রংপুর
৪ঠা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪২
(২০শে জুলাই, ১৯৩৫)

রায় বাহাদুর শরৎ বাবুর সেবাযত্ন

রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত উলিপুর হইতে শ্রীযুক্ত নিতাই দয়াল বসু মহাশয় আসিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবামণিকে উলিপুর নিয়া যাইতে। শ্রীশ্রীবাবামণি জানাইলেন যে, যাওয়া সম্ভব হইবে শ্রাবণ মাসের শেষ দিক

দিয়া। কারণ, রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার পরিবারস্থ পরিজনবর্গ তাঁহাকে এমন ভাবেই ধরিয়াছেন যে, চেষ্টা করিয়াও রংপুর ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। নিজেদের বাসগৃহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ স্থানে অতীব পরিচ্ছন্ন কুটীর দেওয়া হইয়াছে অবস্থান করিবার জন্য, অন্যান্য যাবতীয় সুবন্দোবস্ত আদর্শ-স্থানীয়।

নিতাইদয়াল বাবু বলিলেন,—আমরা জানি যে, রায় বাহাদুর শরৎ বাবু খুবই সজ্জন ব্যক্তি কিন্তু ধর্ম্মীয় ব্যাপারে তাঁর ভাসাভাসা অনুরাগ ছাড়া খুব একটা উচ্ছ্বাস আছে ব'লে লোকের ধারণা নেই। তিনি একজন সাধুসন্তকে নিজের বাড়ীতে আটকে রেখেছেন দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ব্যাপারটা কি বাবামণি বলুন ত'।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাপারটা পরমেশ্বরের কৃপা। আমি ত' বিশ্বপথের এক যাযাবর। থামবার আমার জায়গা নেই অথচ মনভরা প্রাণভরা আত্মসম্মানজ্ঞান টনটনে। ক্লান্ত হ'লে বিশ্রাম কর্ব্ব কার বাড়ীতে? পরমেশ্বরের কৃপাই পরম শ্রদ্ধারূপে উদিত হ'ল রায়বাহাদুর শরৎ বাবুর মনে আর আমি না জেনে এখানে বাঁধা প'ড়ে গেলুম। পরিবারস্থ একটী লোকের সঙ্গেও আমার কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই, ঘনিষ্ঠতা আমি প্রাণপণে বর্জ্জন ক'রে চলেছি, সীমাবদ্ধ পাঁচটী মিনিটের জন্য প্রাতে একবার রায় বাহাদুরের রুগ্ন শয্যাশায়ী পুত্রটীকে দেখ্‌তে যাই, আশ্বাস দেই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরে মন

রাখ, পাঁচ মিনিটের বেশী সেখানে থাকি না। আর কোনও সম্পর্ক কারো সঙ্গে নেই। তবু দেখুন, তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা দিনের পরে দিন কেবলই বাড়ছে। এটাকে ঈশ্বরাভিপ্রায় ছাড়া কি বল্‌ব?

শরীর ক্লান্ত

নিতাইদয়াল বাবু প্রস্থান করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীর নিকট লিখিলেন,—

"শরীর ক্লান্ত। হৃৎস্পন্দনের হার মিনিটে বাহান্ন। মিনিটে বাহাত্তর হইলে স্বাভাবিক হইত। অসুখটী ধরিল আমাকে শিলচরে। ভাল করিয়া ধরা পড়িল হাজারিবাগে কিন্তু পুপুন্‌কী আসিয়া ত' ইজি চেয়ারে বিশ্রাম নিতে পারিলাম না, মুখামুখি হইতে হইল আরণ্য-হিংস্রতার সহিত। এত উদ্বেগ, এত উত্তেজনা, এত অনিয়মের পরে অন্যত্র বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। বর্ত্তমানে বিশ্রাম হইল না, বরং মানুষের মজ্জাগত উদাসীনতার বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিবার কাজে লাগিলাম। নীতির দিক দিয়া কাজটা ভালই হইয়াছে কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়া মারাত্মক। রংপুরে আসিয়া কর্ম্ম-জীবনে দ্বিতীয়বার অনুভব করিলাম যে, বিশ্রামের যোগ্য স্থান পৃথিবীতে সত্যই আছে। প্রথমবার অনুভব করিয়াছিলাম, ত্রিপুরা জেলান্তর্গত শিবপুরে গৌরীভূষণ রায় চৌধুরীর বাড়ীতে। এখানে যদি দুই মাসও থাকিয়া যাই, অযত্নের আশঙ্কা নাই। যদি শহরে একটাও

ভাষণ না দিয়াই চলিয়া যাই, কেহ বলিবে না যে, দুনিয়ার এক নাদান আসিয়া লোক ঠকাইয়া চলিয়া গেল। বলিতে কি, রংপুর আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই যাইবার আগে যে কয়টা ভাষণ দিতে পারি, দিয়া যাইব। তুমি লিখিতেছ যে, শরীর যখন ক্লান্ত, তখন একটী বক্তৃতাদানক্ষম সহকর্ম্মী পাঠাইবে। কিন্তু যে সহকর্ম্মীর কথা ভাবিতেছ, সে যদি আমার কাজের সহায় না হইয়া ঘাড়ের বোঝা হইয়া পড়ে, তখন কি হইবে? সকলে সেবা দিতে জানে না, অনেকের অহমিকা তাহাদিগকে প্রকৃত সেবা হইতে বিমুখ করিয়া রাখে। সহকর্ম্মী যদি মনের মত না হয়, তাহা হইলে মনও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। শরীরটী ক্লান্ত আছে, বর্ত্তমানে এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে আবার মনের ক্লান্তিকে যুক্ত করিয়া লাভ নাই।"

রংপুর

৫ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৪২

(২১শে জুলাই, ১৯৩৫)

রোগারোগ্যকল্পে ভগবানের নাম

বেলা একটার সময়ে সৈদপুর হইতে শ্রীযুক্ত হাফিজুদ্দিন আহম্মদ নামক এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন, রুগ্ন এক আত্মীয়ের অসুস্থতার ব্যাপারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের অধিকাংশ অসুস্থতা

ভগবানের নামজপের ফলে দূর হ'তে পারে। ঔষধগুলিরও মূল উপাদানগুলি ভগবানেরই সৃষ্টি। সুতরাং ঔষধ-সেবনে বাধা দেবার কিছুই নেই। ঔষধেও যে রোগ সারে, সেটাও ভগবানেরই দয়া। ভগবানের নাম ভক্তিভরে স্মরণের ফলে দেহের প্রতিটি স্তরে এবং মনের প্রতিটি তরঙ্গে এক সুবিমল শান্তির সৃষ্টি হয়। এই শান্তি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রোগ-নিরাময়ের সাহায্য করে। ভগবানের নাম ভক্তিভরে স্মরণ কত্তে কত্তে মনে রোগারোগ্য সম্পর্কে যে আস্থা জন্মে, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ-নিরাময়ের সহায়তা করে। লোভে প'ড়েই লোকে ভগবানকে ডাক্‌তে শিখেছে, একথা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। ভগবানকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে অনেকের রোগোপশম হয়েছে, এরূপ দৃষ্টান্ত চোখের সামনে অনেক আছে ব'লেই অন্য মানুষেরা রোগের সময়ে ভগবানকে ডাক্‌তে আগ্রহী হয়েছে। রোগ দিয়ে ভগবান্ আমাদের সঙ্গে শয়তানি করেন নি, সংশয়-সন্দেহ-রূপ শয়তানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর্ব্বার জন্যই তিনি রোগের সময়ে তাঁকে ডাকার রুচি দিয়েছেন।

অন্নের ফল পুষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানের জাত-বিচার নেই, দেশ বিদেশের বিচার নেই, মত-পথের পার্থক্যের বিচার নেই, যে যে ভাবে তাঁকে ডাকে, সকলের ডাক তিনি শুন্‌তে

পান। এই একটী বিশ্বাসে মনকে ভরপুর ক'রে নিতে পার্লে দেশময় জগন্ময় যত সাম্প্রদায়িক বৈরভাব চলেছে, সব একদিনে বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। অন্নই প্রতিজনের প্রাণরক্ষণের প্রধান সহায়, কেউ ডাল দিয়ে খায়, কেউ ঘৃত দিয়ে খায়, কেউ তরকারী দিয়ে খায়, কেউ একটু আচার দিয়ে খায়, কেউ বা সবগুলি উপকরণ একত্র ক'রে মেখে নিয়ে তবে অন্ন খায়। অন্নের ফল পুষ্টি, কলহের ফল পুষ্টি নয়।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের কল্যাণ

স্থানীয় সেটেলমেণ্ট অফিসে কাজ করেন জনৈক যুবক, তিনি বিবাহিত-জীবনের ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে কিছু উপদেশ পাইতে চাহিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রস্তাব সাধু। বিবাহ কর্ব্বে অথচ আজীবনই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে থাক্‌বে, এটা নিশ্চয়ই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিবাহ ক'রে অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থের মতন ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে প্রমত্ত হ'য়ে চলতে পার না ব'লেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের যুক্তিটী এসেছে। এ যুক্তি সদ্‌যুক্তি। যে দেশে অধিকাংশ দম্পতীর ভিতরে দাম্পত্য জীবনকে সংযমের বাঁধনে বেঁধে চলবার আগ্রহ অত্যধিক, সেই দেশে স্বভাবতই অনাবশ্যক জনসংখ্যা কতকটা ক'মে থাকবার সুযোগ পাবে। এটা একটা অর্থনৈতিক লাভ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা

এই যে, এরূপ অনুশীলনের ফলে বংশানুক্রমের ভিতরে আস্তে আস্তে কয়েক পুরুষেই সংযমের একটা স্বাভাবিক সামর্থ্য সঞ্চারিত বা প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠ্‌বে। সেটা ভাবী মানবকুলের ক্রমোন্নয়নের দিক দিয়ে মস্ত বড় একটা লাভ। বিবাহিত জীবনে সংযমের আবশ্যকতাকে বড় ক'রে দেখবার ও দেখাবার জন্য যাঁরা চেষ্টা কচ্ছেন, তাঁরা ভাবী মানব-জাতির জন্য কল্যাণ-সঞ্চয় ক'রে যাচ্ছেন।

দাম্পত্য সংযমে নারীর প্রস্তুতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পারস্পরিক সম্মতির একান্তই প্রয়োজন। একাকী কেউ এই ব্রত উদ্‌যাপন কত্তে পারে না। সুতরাং তোমার একার সম্মতিই খুব বড় কথা নয়, তোমার স্ত্রীরও সম্মতি চাই। নিতান্ত অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যাপারটার কল্যাণকারিত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। গ্রাম্য কুসংস্কার তার মনের উপরে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব কচ্ছে। অতএব, মনের গঠন-পরিবর্ত্তনের জন্য তার দিক দিয়ে একটা আমূল প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে।

দাম্পত্য সংযমে পুরুষের দৃঢ়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সংযম-ব্রত গ্রহণের পরে পুরুষেরাই বরং বারংবার ব্রতভঙ্গ করে, নারীরা এই ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। এই কারণে, ব্রত

গ্রহণের পরে স্বামীদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত যে, সাময়িক মানসিক দুর্ব্বলতার কাছে সে কিছুতেই নতি স্বীকার কর্ব্বে না। স্বামীর দুর্ব্বলতার সময়ে স্ত্রী স্বামীকে বল যোগাবে, স্ত্রীর দুর্ব্বলতার সময়ে স্বামী স্ত্রীকে বল যোগাবে, এইটী একান্তই প্রয়োজন।

প্রকৃত প্রীতির প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই একান্ত প্রয়োজনের দাবীটীকে পূরণ কর্ব্বার জন্য স্বামী এবং পত্নীতে চাই সত্যিকারের স্নেহ, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, মমতা ও ভালবাসা। যেখানে দুজনের প্রীতি যত অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক, যেখানে দুজনের আত্মীয়তা খুবই গভীর ও আন্তরিক, সেখানে একজন আর একজনকে প্রতিপদে সাহায্য কত্তে সমর্থ হয় এবং সাহায্য কত্তে গিয়ে বারংবার বিফলতা আহরণ না ক'রে সফলতাই অর্জ্জন করে। সংযম-সাধনের ব্যাপারটাই এমন যে, একবার যদি সফলতা অর্জ্জন করেছ, তবে জান্‌বে যে, পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সফলতা অর্জ্জন তোমার পক্ষে সহজতর হ'য়ে গেল। তবে একটী কথা মনে রেখো। নিজেদের দাম্পত্য সংযমের কথা বাইরে প্রচার ক'রে বেড়িও না। ওকাজটী কর্ল্লে অহংকার আসবে, ভণ্ডামি আস্‌বে এবং পতন ঘটবে।

রংপুর
৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪২
(২২শে জুলাই, ১৯৩৫)

বহু-দেববাদের কারণ

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,— বহুদেববাদ ভারতবর্ষের কি ক্ষতিবৃদ্ধি করেছে? এর ভালই বা কি, মন্দই বা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ বিষয়টা নিয়ে আমি কখনো গভীর ভাবে চিন্তা করি নি। সুতরাং আমার মতামত হবে ভাসাভাসা। তবু বল্‌ব। প্রথমে খুঁজতে হবে যে, দেববাদের উৎপত্তিস্থলটী কি? কেউ কি সত্য সত্য দেবতা দর্শন করেছিলেন এবং তারপরে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন তথা দেবতার মহিমা প্রচার করেছেন, যার ফলে এই দেবতার পূজা আস্তে আস্তে এক এক শ্রেণীর মানব-গোষ্ঠীর ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল? কাহিনী বা পুরাণ-কথায় এক এক দেবতা সম্পর্কে ভারতীয় এবং অভারতীয় নানা দেশে যা' যা' বলা হয়েছে, তা' থেকে কোনো দেবতারই মূল আবির্ভাবের কারণ ও পরিবেশটী ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু মেনে নিতে আপত্তির কারণ দেখি না যে, রোগ-শোক-দুঃখ-ভয়াতুর মানুষ রোগ থেকে, শোক থেকে, দুঃখ থেকে,

দুর্ভাগ্য থেকে, পরিত্রাণ পাবার জন্য কোনও না কোনও যুগে কোনও না কোনও কারণে অন্তরের ভিতরে প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব ক'রে, একটী সর্ব্বশক্তিমান্ অদৃশ্য-সহায় পরম-লোভনীয় ও নিত্যশান্তিপ্রদ হস্তক্ষেপের। এই ভাবে এক এক যুগে এক এক দেশে এক একটী দৈবশক্তির প্রতি গোষ্ঠিগত-ভাবে এক এক দল মানুষের আনুগত্য এসে যায়। এই আনুগত্য আস্তে আস্তে পুরুষানুক্রমিক অনুশীলনের ফলে দৃঢ়বদ্ধ এক একটা সংস্কারে এসে পরিণত হয়। এই সংস্কার এমন সুদৃঢ় হয় যে, এই সংস্কারের প্রতি প্রত্যক্ষে ত' দূরের কথা, পরোক্ষ ভাবেও কেউ সংশয় পোষণ কর্‌লে বা অনাস্থা প্রকাশ কর্‌লে সামাজিক-বর্গ তার প্রাণদণ্ড দিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হ'তেন না। খুব সম্ভবতঃ দেববাদের এটাই আদিম অবস্থা। কিন্তু মানুষের মন এক একটা সজীব পদার্থ, যাকে কেবল প্রথা আর পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক সংস্কার দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। সেই মন নানা দেশে নানা সময়ে নানা ভাবে প্রশ্ন সুরু করল,—ছেড়ে দাও তোমার ব্যক্তিগত ভয় আর ব্যক্তিগত ভয়ত্রাণ, ভুলে যাও তোমার ব্যক্তিগত দুঃখ আর ব্যক্তিগত দুঃখহরণ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডটার যে দিকে যতটুকু দেখা যায়, তার দিকে তাকিয়ে একবার নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখ ত', কে এ সকল সৃষ্টি কর্‌ল, কে চন্দ্রকে আর সূর্য্যকে একটা নিয়মের বাঁধনে বাঁধল, কেন নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে জল বায়ু, আকাশ একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলে, কি এই সৃষ্টির মূল

রহস্য, কেন এই সৃষ্টি আর এই সৃষ্টি কি চিরস্থায়ী? এই ভারতের মাটিতেই কেনোপনিষদের যুগে প্রশ্ন উঠেছে, মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয় কার ইচ্ছায়? প্রাণশক্তি কার দ্বারা নিয়োজিত হ'য়ে শরীরকে রক্ষা করে? প্রত্যেকটী জ্ঞানেন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ে ঠিক ভাবে লগ্ন থাকে, কার ব্যবস্থায়? শিষ্যকে আচার্য্য ব'লে দিচ্ছেন, এমন একটী পরমবস্তুর কথা, যা শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, সকলের কর্তৃত্বে রয়েছেন সেই চৈতন্যময় সত্ত্ব। এই ভারতের মাটিতেই মুণ্ডকোপনিষদের যুগে প্রশ্ন উঠেছে,—কি বস্তু আছে, যা' জানলে সবই জানা যায়? ছান্দোগ্য উপনিষদের যুগে প্রশ্ন উঠেছে, হে পুত্র, তুমি কি তোমার গুরুর কাছে সেই শিক্ষা পেয়েছ, যে শিক্ষা লব্ধ হ'লে অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং ভবতি, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যুগে প্রশ্ন উঠেছে,—

কিং কারণং ব্রহ্ম, কুতঃ স্ম জাতা,
জীবাম কেন, ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।—কিং কারণং ব্রহ্ম?

বিশ্বের আদি কারণ কি ব্রহ্ম, না অপর কিছু? কারণং ব্রহ্ম কিম্? জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপ কি? ঐতরেয় উপনিষদের যুগে প্রশ্ন উঠেছে—কোহয়মাত্মেতি বয়মুপাসতে?—যাঁকে উপাসনা কচ্ছি, সেই আত্মা কে? প্রশ্ন

উঠেছে,—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম, কে সেই দেবতা, হবিঃ দ্বারা যাঁর অর্চ্চনা করি। এই রকম হাজার হাজার প্রশ্ন মনকে ঘিরে ফেলতে লাগল এবং নানা যুগের নানা প্রথা সত্ত্বেও মানুষের মন মনে মনে আবিষ্কার কত্তে সক্ষম হ'ল যে, একজন কেউ আছেন, যিনি সব-কিছুর নিয়ন্তা। সেই একজনের খোঁজ যখন মন পেল, তখন দুটী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ল। একটী এই যে, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানার পূজা বন্ধ হ'য়ে গেল, একমাত্র একজনকেই মানবার ও মানাবার জন্য চল্‌তে লাগল অতুলনীয় ঐতিহাসিক অধ্যবসায়, যাতে ত্যাগও আছে, রক্তপাতও আছে, জ্ঞানদানও আছে আবার কোটি কোটি মানুষের ছিন্নমুণ্ডও আছে, যাতে উদারতাও আছে আবার অন্ধ গোঁড়ামির অকথ্য অত্যাচারও আছে। এই হ'ল এক দিক? অন্য দিকে একদল জ্ঞানী পরম সত্যকে এক এবং অদ্বিতীয় জেনেও, যারা অবান্তর পূজায় কালহরণ কচ্ছে, তাদিগকে সশস্ত্র শাসন না ক'রে যুক্তি ও উপদেশের দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা কর্লেন যে, পূজা বা অর্চ্চনার, উপাসনার বা যাগ-যজ্ঞের তোমার উপলক্ষ্যটী যাই হ'য়ে থাকুক, নেদং যদিদমুপাসতে, তোমার আসল লক্ষ্য সেই পরম সত্য, যা এক, অদ্বিতীয়, অপরিবর্ত্তনীয়, শাশ্বত, সনাতন ও চিরন্তন। এসব ক্ষেত্রে ভূতপ্রেতবৃক্ষাদির পূজকেরা নিজেদের পূজাপদ্ধতির হয়ত পরিবর্ত্তন-সাধন কর্ল্ল না, কিন্তু মনে প্রাণে জেনে নিল

১০

যে, তারা পূজা কচ্ছে ভূতকে নয়, ভূতভাবনকে, প্রেতকে নয়, প্রেতনাথকে, বৃক্ষকে নয়, বৃক্ষাধিষ্ঠাতাকে, জড় বস্তুকে নয়, জড়াতিগ পরম সত্তাকে। ভারতের আদিম-প্রথানুগ খণ্ড-উপাসকেরা বৈদিক ঋষিদের তত্ত্বজ্ঞানালোকের আওতায় এসে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম শিখ্‌ল কিন্তু প্রথার অধীনতা পরিত্যাগ কর্ল্ল না। ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে অনেকের সম্পর্কেই একথা খাটে। এতে ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি কি হয়েছে, তার বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে, যদিও কাজটা সহজ নয়। এক দেবতার পূজকেরা অপর দেবতার পূজকদের সহ্য ক'রে নিয়েছেন, এটাই বহুদেববাদের অস্তিত্বের বা স্থিতির প্রধান কারণ। এক দেবতার পূজকেরা জীবনের সকল কাম্য একটী দেবতার দ্বারা সিদ্ধ হ'তে পারে না ব'লে আশঙ্কা ক'রে জীবনের অন্যান্য কাম্য পূরণের জন্য একাধিক দেবতাপূজার শরণাপন্ন হয়েছেন, বহুদেববাদের প্রবর্ত্তন বা প্রসারণের এটাও যুক্তিযুক্ত কারণ। কারণকে খুঁজে পেলে এর ফলাফল বিচার সহজ হবে। এক দেবতার পূজকেরা অন্য দেবতাকে এভাবে সাধ্যমত সহ্য ক'রে না নিলে নিজ নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সশস্ত্র আক্রমণকারীরা নিরন্তর পরস্পর এই বিশাল দেশের পূজাস্থান, মন্দির, মঠ ও আশ্রমগুলিকে আক্রমণ ক'রে ক'রে নরকের রাজত্ব স্থায়ী ক'রে রেখে দিত। আমার দেবতা যে তোমার দেবতার চেয়ে

বড়, এটা ত' প্রমাণ হবে তোমাকে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও উৎখাত ক'রে দেবার যোগ্য ক্ষমতা যে আমার আছে, সে কথাটা বাস্তবে প্রমাণিত ক'রে দেবার উপরে। আগ্রাসী ধর্ম্মমতগুলির ত' প্রধান বিশেষত্বই হ'ল এইরূপ অসহিষ্ণুতা।

অধ্যাত্মকর্ম্মে ভক্তি আর রাজনীতিতে ঐক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মকে নিয়ে যখন রাষ্ট্র গ'ড়ে ওঠে, তখন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাকারীদের ধর্ম্মকেই চালু রাখবার জন্য অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে হয় নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তে হয় নতুবা এই রাষ্ট্র থেকে দলে দলে দূর দেশে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনে চলে যেতে হয়। পৃথিবীতে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত অনেকগুলিই আছে। একেশ্বরবাদী ধর্ম্মাবলম্বীরা যখন অস্ত্র-বলে নূতন নূতন দেশ জয় ক'রে সেই সব দেশে নিজেদের ধর্ম্মকে প্রচারের ইচ্ছা করেছেন, তখন সেই সব দেশ থেকে বহুদেববাদ প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করেছে বা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ভারতীয় আর্য্যদের দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা নাই। নাই ব'লেই এদেশে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ প্রচারের পরেও দেশ থেকে বহুদেববাদ দূরীভূত হয় নাই। দূরীভূত করার প্রকৃত উপায় কি, তা' নিয়েও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ আছে। বেদান্ত-তত্ত্বকে যদি "বৈচিত্র্যের ভিতরেও

একত্ব" প্রতিষ্ঠার উপায়-রূপে ধরা যায়, তা'হ'লে স্বীকার কত্তেই হবে যে, বেদান্তসূত্র তার কাজ ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বিচিত্র মত-পথের মধ্যে চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গেই করেছে। কিন্তু তার রাষ্ট্রনৈতিক কোনো সুফল নেই। সুফলটুকু সম্পূর্ণই কাল্‌চারাল বা শান্ত, দান্ত, শিষ্ট, ভদ্র, পরস্পর-সহনশীল মনোভাবের পরিপোষক ও সংস্কৃতিগত। সংস্কৃতি শান্তিপূর্ণ হ'লেই রাষ্ট্রনৈতিক সাফল্যের দিক দিয়ে তার মূল্য খুব বেশী হ'য়ে যায় না। সুতরাং একথাও স্বীকার কত্তে হয় যে, ভারতের বহুদেববাদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুদেবতার উপাসকদের পার্থিব অভ্যুদয়ের পথে দুস্তর বাধা-স্বরূপ। কারণ, অধ্যাত্মকর্ম্মে ভক্তির বা জ্ঞানেরই দাম বেশী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশী মূল্যমান ঐক্যের। কারণ, ধর্ম্ম জীবনের প্রাণ ভক্তি ও জ্ঞান, রাজনীতির প্রাণ একতা।

একেশ্বরবাদের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাজনীতিকে ধর্ম্মের সঙ্গে মিলান আর ধর্ম্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে রাজনীতির সঙ্গে খিচুড়ী পাকান বর্ত্তমান সভ্য যুগের উপযোগী ব্যাপার নয়। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যুদ্ধাভিযান এই যুগের মানুষের চিন্তাধারার বাইরে। স্বজাতীয়তার বা স্বাদেশিকতার নাম ক'রে যেই সব নিষ্ঠুর বা অনৈতিক কাজ বর্ত্তমানে নিন্দার্হ, ধর্ম্মের নাম করলেই সেই সকল কাজ শুদ্ধ হ'য়ে যাবে, এটা আধুনিক

কালের যুক্তি নয়। ধর্ম্মকে মানুষের ব্যক্তিগত সাধনার ব্যাপার এবং রাজনীতিকে দেশবাসী মাত্রেরই কুশলার্থে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের সামূহিক ব্যাপার ব'লে মনে করা উচিত। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রত্যেকটী মানুষকে একই ঈশ্বরের সন্তান ব'লে মনে কর্ব্বেন, প্রত্যেকটী নারীর মর্য্যাদাকে নিজের মায়ের মর্য্যাদা ব'লে ভাববেন, প্রত্যেকটী সৎ-লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব পোষণ কর্ব্বেন, প্রত্যেকটী বিপথগামী লোককে কুস্বভাব-বর্জ্জিত পরিচ্ছন্ন মানুষে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বেন, প্রত্যেকটী দরিদ্রের প্রতি তার প্রাণ সহানুভূতিতে উথলে উঠ্‌বে, এটাই বাঞ্ছনীয়। যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন এক ধর্ম্মাবলম্বীর মন অপর ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বিষ্ট করে, সেগুলিকে মধ্যযুগীয় ব'লে বর্জ্জন করাই ভাল। সমস্ত জগতের সঙ্গে সমস্ত দেশবাসী ও সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে মিলিয়ে দেওয়াই এ যুগের বাণী, আর এ যুগের দাবীও ঠিক তাই। কিন্তু ঐক্যের এমনই গুণ যে, ঐক্যবদ্ধ ধর্ম্মান্ধেরা পাশার দানে এমন বাজিও জিতে নেয়, যার জেতার কোনো সম্ভাবনাই নাই বা ছিল না। অথচ ঐক্য নেই ব'লে বহুদেববাদীরা তেমন দানেও হেরে যায়, যাতে হারা সম্ভব ব'লে কেউ কখনো মনেও কত্তে পারে না। একেশ্বরবাদের যদি রাজনীতির দিক দিয়ে এতই শক্তি, তবে বহুদেববাদীরা বেদান্তের শিক্ষা পেয়েও এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হচ্ছে না কেন?

যুবক-সমাজ ও ভ্রান্ত নেতৃত্ব

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাজনীতির কথা উঠ্‌লেই ছাত্র-সমাজের কথা এসে যায়। সেই ছাত্রদলের কথা বলছি না, যারা গুরুগৃহে নীবার-কণায় তুষ্ট হ'য়ে তিন্তিড়ীপত্রের ঝোল দিয়ে পেট ভ'রে যবাগু ভক্ষণ ক'রে আত্মার মুক্তি এবং বিশ্বের উদ্ধারের কামনায় জ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন কত্তেন এবং গৃহে ফিরে এসে কেবল চিন্তা কত্তেন যে, গুরুদক্ষিণাটী ভাল ভাবে কেমন ক'রে দেওয়া যায়, পুত্রপৌত্রাদির মধ্য দিয়ে বংশের উৎকর্ষকে কি ক'রে ক্রমবর্দ্ধমান করা যায়। পরন্তু যে ছাত্র-সমাজের আজ সব চেয়ে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক, সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ভবিষ্যতের জন্য অন্ন-সংস্থানের, সেই ছাত্র-সমাজের সাহায্য ছাড়া আজকাল আর রাজনৈতিক আন্দোলন চলে না। ফলে, এসব তরুণ এবং যুবকদিগকে নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবার প্রবণতা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দেখা যাওয়া বিচিত্র নয়। সব নেতারা যে দেশকে ভালবেসেই রাজনৈতিক আন্দোলন করেন, তা' নয়, অনেকের ভালবাসা শুধু নিজের প্রতি, প্রাণের টান ও মনের ঝোঁক শুধু নিজের স্বার্থের প্রতি। কিন্তু চিত্ত-চমৎকারী বক্তৃতামালায় মানুষ মাতিয়ে এঁরা অনেকে কেবল নিজেদের কার্য্যোদ্ধার করেন বা নিজেদের জিদের

মান রাখেন। দেশের হিত অনেক সময়েই শুধু মুখের বুলি। এসব ক্ষেত্রে ছাত্রদের নিজেদেরই সচেতন হ'য়ে চলা উচিত। তরুণ ও যুবকদের ঘাড়ে পা রেখে যাঁরা বড় হ'তে চান, তাঁদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা তরুণ ও যুবকদের আত্মরক্ষা চেষ্টারই সামিল ব'লে মনে কত্তে হবে। তাদের ডেকে বলা উচিত যে, দেশের সেবা কর কিন্তু নিজের মনুষ্যত্বকে পূর্ণতঃ বজায় রেখে। রাজনীতির চর্চ্চা পড়াশুনার ক্ষতি করে, আবার দেশের সামগ্রিক শুভচিন্তা কত্তে হ'লে রাজনৈতিক ভাবনাকে একেবারে নির্ব্বাসন দিলেও চলে না। সুতরাং চরিত্রকে প্রত্যেকের এমন ভাবে গ'ড়ে তোলা উচিত, যেন কর্ত্তব্য-বোধের ভারসাম্যটুকু নষ্ট না হ'য়ে যায়। অন্ধ রক্ত-পিপাসা আর বদ্ধমূল বৈরভাবকে পুঁজী ক'রে রাজনীতির চর্চ্চা কত্তে গেলে ফল শুধু ভয়ঙ্করই হবে, তা' নয়, হতবুদ্ধিকর, বিপর্য্যয়কর আত্ম-বিনাশকরও হ'তে পারে। অথচ প্রায় সব দেশেই নেতাদের ঝোঁক থাকে, তরুণদের মাথায় অসাধ্য-সাধনের ভার দিয়ে নিজেরা ক্ষমতার আসনটী নিরাপদে দখল ক'রে নেওয়া। ফলে এঁরা অনেকেই যুবক-যুবতীদিগকে উপদেশ দেবেন নিজ নিজ পিতামাতাকে না মানতে, নিজ নিজ শিক্ষক-অধ্যাপকদের তোয়াক্কা না রাখতে, প্রচলিত সন্নীতি ও সদাচারের বেড়াগুলিকে লাথি মেরে উড়িয়ে দিতে। এঁদের

প্ররোচনায় তরুণ ও তরুণীরা এমন অনেক কাজ ক'রে বসবে, যা' হয়ত আগে কল্পনাও করা যায় নি। তরুণ ও যুবকদের দ্বারা এসব করানো নেতাদের পক্ষে আবশ্যক, নইলে যে তাঁদের অনেকের অন্তরের দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণ অসম্ভব হবে! নিজেদের পুত্রকন্যাদিগকে এসব নেতারা নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখে পরের পুত্রকন্যাদের নিয়ে তাঁদের অত্যুগ্র আন্দোলনের অগ্নিবন্যা বহিয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু এটাই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার যে, যা'দিগকে দিয়ে তাঁরা পিতামাতাকে অগ্রাহ্য করালেন, শিক্ষক-কুলকে করালেন অপমান, হিতৈষী উপদেষ্টাগণকে করালেন অমান্য, সেই তরুণ এবং যুবকেরা যখন এই নেতাদের অমান্য বা অগ্রাহ্য কত্তে আরম্ভ কর্ব্বে, তখন তাঁরা এই অবস্থাটিকে হাসিমুখে সহ্য ক'রে নিতে সমর্থ হবেন না। কোনো দেশের রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্ব যদি এরূপ বল্‌গাহীন প্রণালীতে বইতে থাকে, তবে দেখা যাবে যে, এঁরা পরের ছেলেকে আর পরের মেয়েকে হত্যা ক'রে বা হত্যা করিয়ে নিজেদের স্বদেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রীতির প্রমাণ রাখবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে এমন নজির অনেক পাওয়া যাবে। পৃথিবীর অন্যান্য দুই একটা দেশেও সম্প্রতি এসব ঘটনা ঘটেছে। এই পাপ আমাদের দেশে আসবে না,

এমন গ্যারান্টি কে দিতে পারে? অক্রোধের নাম ক'রে ক্রোধের আশ্রয়, অহিংসার নাম ক'রে হিংসার প্রশ্রয়, ন্যায়-বিচারের নাম ক'রে অন্যায় অত্যাচার, সত্যের নাম ক'রেই সত্যভাষণের কণ্ঠরোধ অতীব লজ্জাকর ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু নির্লজ্জের মত তা' যে করা হবে না, তার প্রমাণ কোথায়? তরুণ ও যুবকদের এজন্যই সতর্ক থাকতে হবে, যেন তারা উচ্চাভিলাষী বেপরোয়া নেতাদের কবলে প'ড়ে এমন ভুল না করে, যে ভুল দেশদ্রোহতুল্য অপরাধ, যে ভুল আত্মঘাতকর।

রংপুর
৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(২৩শে জুলাই, ১৯৩৫)

জীবন-কথা বলা সত্যই দুরূহ

একটী যুবক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির জীবনী জানিতে চাহিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার জীবনী? জেনে কোনো লাভ নেই। আমার জীবনী কোনো সফলতার ইতিহাস নয় যে, জয়-গৌরবে চীৎকার ক'রে জগদ্বাসীকে শোনাব,—হে জগদ্‌বাসী শোনো, তোমরা শোনো, শুনে অবাক্ হও, লাভবান্ হও, ধন্য হও, কৃতকৃতার্থ হও। আমার জীবন সাধারণ একটী মানুষের জীবন, যার সর্ব্বাঙ্গে কোনো স্থানে

কিছু মাত্র অসাধারণত্ব নেই, বাদে একটা অফুরন্ত আশাবাদ ছাড়া। গান লিখেছিলাম কয়েক কুড়ি, একজন প্রভাবসম্পন্ন পুরুষ তা' ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিলেন। মনে কষ্ট হ'ল, তবু হাল ছাড়লুম না। আবার লিখলুম অনেকগুলি গান, হয়ত চার পাঁচশ' হবে। এক বন্ধু এসে সেই খাতাটা পুরোণো কাগজের দোকানে বিক্রী ক'রে দিল। গানগুলি সব ঠোঙ্গা হ'ল। গানগুলি সব হারিয়ে গেল। আবার লিখলাম কতকগুলি গান। সেগুলিও হ'ল চুরি। গানগুলি হারিয়ে গেল ব'লে যেমন আর পেলাম না, জীবনের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা এক একটা ক্ষণস্থায়ী সঙ্গীত, সব বিস্মৃতির প্রান্তরে হারিয়ে গেছে। কারণ, ছোট ছেলে হ'লেও আমি যে একটী যাযাবর। আজ একটা ছোট্ট ঘটনা ঘট্‌ল, হয়ত সেটা কমিক গানের মতই হাস্যকর। কাল আর একটা ছোট্ট ঘটনা ঘট্‌ল, হয়ত সেটা শান্ত-রসে ভরা। পরশু আর একটা ছোট্ট ঘটনা ঘট্‌ল, হয়ত সেটা করুণ রসেরই একটা দৃষ্টান্ত। অবিরাম কত কত ঘটনা ঘটেছে এবং ঘট্‌ছে। কে তা' ঠিক মনে ক'রে ব'সে আছে, বলত'! জীবনী লিখতে গেলে বা জীবন-কথা বলতে গেলে, সত্য কথা খুব কমই বলা সম্ভব, কারণ কল্পনাপ্রিয়তা বিস্মৃত ঘটনাকে এমন রূপান্তর দিয়ে দেয় যে, আসলে আর নকলে তফাৎ ধরা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না।

তারপরে দেখ, একটা ঘটনা ঘট্‌ল, ওটাই আমার জীবন নয়। এই ঘটনাটার সঙ্গে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত কথা যে উক্ত হয়েছে আর কত চিন্তা যে অনুক্ত রয়েছে, সেগুলিকে বাদ দিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ র'য়ে যায়। মুখের গ্রাস ক্ষুধার্ত্তকে দিলুম আর নিজের পরিধেয় বস্ত্র শীতার্ত্তকে দিলুম, এইখানেই ঘটনাটী শেষ হ'য়ে যায় না। কি ব'লে দিলুম, কি ভেবে দিলুম, দেবার পরে কি বল্লুম বা ভাবলুম, যশের লোভে দিলুম কিনা, নাকি পরদুঃখে কাতর হ'য়ে দিলুম, দেবার পরে নিজেই নিজেকে বাহবা দিলুম কিনা, না, দেবার পরে আফশোষ কল্লুম যে এত কম কেন দিলুম আরও ত' দেবার শক্তি ছিল,—এতগুলি ব্যাপার আবার এসে যায়। আমার ভবিষ্যৎ জীবন ত' আমি কল্পনার নয়নে দেখ্‌ছি, তা' ফলতেও পারে, নাও পারে। আমার অতীত জীবনের ত' অধিকাংশ ঘটনাই ছোট খাট ঘটনা ব'লে তেমন ভাবে স্মরণ নেই, চেষ্টা ক'রে স্মরণ কত্তে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে আনুমানিক চিত্র অনেক ভেসে উঠে এবং অলীক হওয়া সত্ত্বেও তারা সত্যের মর্য্যাদা দাবী ক'রে বসে। সুতরাং একমাত্র বর্ত্তমানকে বর্ণনা করা ছাড়া জীবন-কথা সঠিক ভাবে বলার কোনো নির্ভুল উপায় নেই। কেউ যদি তরুণ বয়স থেকে সুরু ক'রে প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহই বা অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন ক'রে

নিজের জীবন-কথা লেখার অভ্যাস ক'রে থাকেন এবং তাঁর লিখিত কাগজগুলি যদি মধ্য পথে হারিয়ে বা নষ্ট হ'য়ে না যায়, তবে তিনি হয়ত প্রবীণ বয়সে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ ক'রে ক'রে নিজ জীবনের সত্য কাহিনী, প্রকৃত অভিপ্রায় এবং পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্য ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে সব বল্‌তে পারবেন। নইলে জীবন-কথা হবে কয়েকটী হারাণো গানের পুরোনো কলি, অথবা কতকগুলি কিম্বদন্তী-জাতীয় দার্শনিক তত্ত্বালোচনা। বাল্য বয়সের ঘটনার কথা যুবকদেরই অনেক সময়ে মনে থাকে না, এমতাবস্থায় প্রৌঢ় আর বৃদ্ধেরা সে সব কথা স্পষ্ট ক'রে মনে রাখবেন কি ক'রে? অধিকাংশ আত্মজীবনী লেখকের কাছে এটী একটী বাস্তব সমস্যা। যৌবনের অনেক ঘটনাই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের মনে থাকে কিন্তু ঘটনা ঘটবার সমকালে বর্ণনা না ক'রে বহু বৎসর পর বর্ণনায় বসলে তাতেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর। ফলে, যেখানে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লেখা হয়নি, সেগুলি পরে লিখ্‌তে গিয়ে বিবৃতিতে ভ্রম-প্রমাদ থাকেই থাকে। এত সব শোনার পরেও আমার জীবনী শুনতে চাও? তবে বল্‌ছি শোন। কয়েকটা সুনির্দ্দিষ্ট স্পষ্ট চিন্তাই আমার জীবনী। এই চিন্তাগুলিকে ধ্বনিতে যখন রূপ দিয়েছি, তখন তা' হয়েছে আমার বাক্য বা বাণী। এই

চিন্তাগুলিকে কাজের মধ্য দিয়ে রূপ দেবার যখন চেষ্টা করেছি, তখন সেগুলি হয়েছে আমার দুই চারিটী সফল কর্ম্ম, আর হয়েছে জীবনব্যাপী বহু পণ্ডশ্রম। কাজ কর্‌লেই তা' সফল হয় না, সফলতা লাভের সহায়ক কতকগুলি অনুকূল অবস্থাও চাই। আর, শ্রম ব্যর্থ হ'লেই তা' বিফল হয় না। ব্যর্থতা নিজেও এক প্রকারের সার্থকতা, যদি ব্যর্থতায় কর্ম্মীর মনের বল না নষ্ট হয়।

মানবমৈত্রী, স্বদেশ-প্রেম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনের বলকে সুদৃঢ়-রূপে ধ'রে রাখবার ব্যাপারে পরম সহায় হচ্ছে, মানব-মৈত্রী, স্বদেশ-প্রেম আর ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি বিফলতায় হিংস্র-স্বভাব পায়, ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিফলতার মধ্যেও পরমেশ্বরের কল্যাণ-হস্তের অস্তিত্ব লক্ষ্য ক'রে আশ্বস্ত হয়, সহিষ্ণু হয় এবং ধৈর্য্যশীল, প্রতীক্ষাপরায়ণ হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসী পুরুষের মানব-প্রেম নিখুঁত ও নিঃস্বার্থ হয় আর মানব-প্রেমিক পুরুষের স্বদেশ-প্রেম হয় উগ্রতাবর্জ্জিত ও নিষ্কলঙ্ক।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

কোনও সরকারী অফিসের একটী তরুণ-কর্ম্মী কতকগুলি

নিজস্ব কথা নিয়া আসিয়াছেন। সমস্ত কথা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই শহরটায় লক্ষ্য কচ্ছি, অনেক বিবাহিত যুবকের মনেই দাম্পত্য সংযম অনুশীলনের একটা আগ্রহ জন্মেছে। কি ভাবে তোমাদের মনে এই সদ্ভাবটীর স্ফুরণ হ'ল বল দেখি।

যুবকটী বলিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণির রচিত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" বইখানা তিন চারি জন ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। অনেকেই কাড়াকাড়ি করিয়া বইখানা পড়িতেছেন এবং কেহ কেহ বলিতেছেন, "চমৎকার বহি তা'; এতদিন ত' আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কিছুই ভাবি নি।"

ইন্দ্রিয়-সুখের উর্দ্ধে থাকার অভীপ্সাও স্বাভাবিক ব্যাপার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটা খুবই সত্য যে, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে লোকের মনে কোনো আলোড়ন আসে নি। কিন্তু প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতী জানে যে, বিবাহ করার উদ্দেশ্য শুধুই যৌনসুখসম্ভোগ হ'তে পারে না। নিতান্ত কামাতুর দম্পতীও প্রত্যহ বা বহুক্ষণ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা কর্ত্তে কর্ত্তে মাঝে মাঝে অনুভব করে যে, মাত্রাটা বড় বেশী হ'য়ে যাচ্ছে, এখন থামা উচিত। এ ভাবটা স্ত্রীরও হয়, পুরুষেরও হয়

কিন্তু ঠিক একই সময়ে দুই জনের মনে এই ভাবটা আসে না ব'লে স্ত্রী যখন চায় সংযম, পুরুষ তখন হয় বেপরোয়া, আর পুরুষ যখন চায় সংযম, নারী তখন হয় বেহায়া ও নির্লজ্জা। রসগোল্লাও যদি খাও, অবিরাম খেতে খেতে বিরাগ এক সময়ে আস্‌বেই আস্‌বে। কিন্তু পুরুষের বিরাগ আর স্ত্রীর বিরাগ ঠিক একই সময়ে এলে, তবে লোভকে জয় করা সম্ভব হয়, সহজ হয়। নতুবা, একজনে সংযত হ'তে গেলে অন্য জনে অভিমান ক'রে বসে—ওঃ, বুঝেছি, তোমার এখন মন পড়েছে অন্য লোকের উপরে, তাই তুমি আমাতে অনাদর দেখাচ্ছ। রক্তমাংসের শরীর যেমন ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা স্বভাবতই চাইবে, তেমনি আবার রক্তমাংসের শরীর ব'লেই সে কোনো কোনো সময়ে ইন্দ্রিয় চর্চ্চা-বর্জ্জিত ভাবে থাকতে আগ্রহী হবে। ইন্দ্রিয়-সুখের অভীপ্সা যেমন তার স্বভাব, ইন্দ্রিয়-সুখের অতীত হ'য়ে থাকার বাঞ্ছাও তেমনি তার স্বভাব। কেউ যদি নিজেকে ইন্দ্রিয়-সুখের উর্দ্ধে তুলতে চায়, তবে জান্‌বে ওটা তার পক্ষে স্বাভাবিক ব'লেই চাইছে। সুতরাং এ চেষ্টায় তাকে বিফল যে হ'তেই হবে, এমন কথা বলা অন্যায়। ইন্দ্রিয়-সুখের উর্দ্ধে থাকার অভীপ্সাটা স্বাভাবিক ব'লেই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য দম্পতীর পক্ষে সম্ভব। অস্বাভাবিক হ'লে সম্ভব হ'ত না।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকটীকে কয়েকটী বিশেষ উপদেশ প্রদান করিলে যুবক প্রস্থান করিলেন।

জাতীয় নবজাগরণ

অপর একটী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশাভরসাহীন জাতি অকাল-বার্দ্ধক্যে নুয়ে পড়ে। অকাল-বার্দ্ধক্য অকালমৃত্যু আনয়ন করে। এজন্য জাতির চিন্তাশীল অংশের উচিত হচ্ছে এমন উপায় নির্দ্ধারণ করা, যার দ্বারা হতাশের প্রাণে আশা জাগে, ভরসাহীনের বুকে ভরসা আসে। ইতি-বাচক উপদেশ ও প্রেরণা দিয়ে জাতির মন থেকে ভীতি-বিহ্বলতা আলস্য-জড়তা ও পঙ্গুতা যাঁরা দূর করেন, তাঁরাই দেশের প্রকৃত বান্ধব। ছোটই হোক্, বড়ই হোক্, সকলেরই অতীত নিয়ে গৌরব করার মত সামগ্রী দু-চারটা থাকেই থাকে। সেই গৌরবের সঙ্গে নিজের অন্তরকে গ্রথিত ক'রে দেওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মশ্রদ্ধা জাগে এবং আত্মশ্রদ্ধা দেয় আত্মশক্তির নবোন্মেষের এক উদ্দীপনাময়ী প্রেরণা। দেশের ইতিহাস-চর্চ্চীরা এই ভাবেই জাতির নবোদ্বোধনের সহায়ক হন। এই কারণেই বিদেশের লোকের উন্নতি-অবনতির ইতিহাস পাঠের আগে নিজের দেশের উন্নতি-অবনতির ইতিহাস পাঠ করা বা শ্রবণ করা একান্ত কর্ত্তব্য কাজ। জাতির দার্শনিক, সাহিত্যিক,

কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, চিত্রকর, ভাস্কর এবং অন্যান্য শিল্প ও চারুকলার সেবকেরা এই ভাবেই এ কাজটীর সহায়তা ক'রে থাকেন। এদের মধ্যে যুগপৎ এক নবজাগরণ এলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির নবজাগরণ সম্পাদিত হয়। সার্ব্বাঙ্গিক ভাবে সমাজের সর্ব্বত্র যখন এই নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হয়, তখনই বলা চলে যে, জাতি এতদিনে জাগ্রত হ'ল।

স্বদেশের ইতিহাস প্রত্যেকেরই অবশ্য পাঠ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠও একাজের সহায়ক হ'তে পারে। কেন কোন্ যুগে কোন্ জাতি উন্নতির পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ পা-পিছলে প'ড়ে গেল, আবার সহস্র পদস্খলন সত্ত্বেও কি ক'রে কোন্ যুগে কি উপায়ে অন্য এক দেশ পৃথিবীর বুকে স্ফীত বক্ষে সরল মেরুদণ্ডে দৃঢ়চরণে উঠে দাঁড়াল, সেই ইতিহাস পড়তে পড়তেও অন্তরে উদ্দীপনা জাগে। যে-কোনো দেশের বৈষয়িক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক উন্নতি-অবনতির ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে আমরা আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী উপদেশের সন্ধান পেতে পারি। এই জন্যই ইতিহাস পাঠ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে

কর্ত্তব্য। ইতিহাস-জ্ঞান-বর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক তার বিজ্ঞান-সাধনাকে যুগোপযোগী কাজে লাগাতে অক্ষম হয়। ইতিহাস-জ্ঞান-বর্জ্জিত দার্শনিক তার দর্শন-তত্ত্বকে সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ হয়। সকল দেশের ইতিহাস থেকেই মানুষ সঙ্কট-মোচনের নানা ইঙ্গিত সংগ্রহ কত্তে পারে কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাস ভাল ক'রে জানা না থাকলে ভিন্ন দেশের ইতিহাসের শিক্ষাকে কাজে লাগাবার পথোদ্‌ঘাটন সম্ভব হয় না। কেবল বিদেশের দিকে তাকিয়ে যারা স্বদেশের সমস্যা মিটাতে চায়, অচিরকাল মধ্যে তাদের স্বদেশ কাজে-কর্ম্মে, চিন্তাধারায়, উদ্যম-আয়োজনে, চেষ্টায়-চরিত্রে, লক্ষ্যে এবং তাৎপর্য্যে বিদেশ হ'য়ে যায়। এর পরে স্বদেশে বাস ক'রেও তারা আর স্বদেশের মানুষকে চিনতে পারে না।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও স্বাদেশিকতা

হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সম্পর্কে আর একজনে কতকগুলি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করিবার পরে একটী বিশেষ প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ বিবাহ প্রচলন ক'রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী মিলন-সাধনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কেউ কেউ চিন্তা কচ্ছেন দেখে আমার মনটা খুশীতে ভ'রে উঠেছে। কিন্তু বিবাহ একটা

কাল্পনিক ব্যাপার নয় বা একটা মাত্র রাত্রির সুখ-স্বপ্ন নয়। বিবাহ একটা গানের পদ নয় বা সঙ্গীত-সভার ক্ষণকালীন একটী নৃত্যোচ্ছ্বাস মাত্র নয়। বিবাহ একটা জীবনব্যাপী বন্ধন এবং আমৃত্যু দায়িত্ব। সুখ ও দুঃখের এতে সমভাবে সমাবেশ এবং এই সুখ-দুঃখ কেবল পাত্র আর পাত্রীরই গাত্রস্পর্শ করে না, শীতল বা উত্তপ্ত করে সমাজের শরীরকেও। অতএব, এর ভাল ও মন্দ, সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা উভয়ই উত্তম-রূপে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌বার মত। ব্যক্তি-হিসাবে একজন মুসলমান তাঁর ধর্ম্ম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং গোঁড়া, সমাজ-হিসাবে মুসলমানেরা অত্যন্ত উদার ও অন্য জাতিকে আলিঙ্গনে আগ্রহী। ব্যক্তিহিসাবে একজন হিন্দু দিলখোলা ও উদার কিন্তু সমাজহিসাবে হিন্দুরা গোঁড়া, গ্রহণে অনাগ্রহী এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বীর পুত্রকন্যাদের নিজেদের সমাজে প্রবেশাধিকার দানে একান্ত অনিচ্ছুক। ফলে মুসলমান পাত্র অমুসলমানের কন্যাকে বিবাহ কত্তে চাইলে, সমগ্র মুসলমান-সমাজ সোল্লাসে সানন্দে এতে সম্মতি জানায় কিন্তু ব্যক্তি-মুসলমানটী পাত্রীকে ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত না ক'রে গ্রহণ কত্তে অনিচ্ছুক থাকে। আবার হিন্দু পাত্র অহিন্দু-কন্যাকে বিবাহ কত্তে অন্তরে দারুণ কোনও কুণ্ঠা অনুভব করে না, তার স্ত্রী যদি নিজের পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ নাও করে, তবু সে তাকে স্ত্রীত্বের মর্য্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব দিতে

সাধারণতঃ ইচ্ছুক থাকে কিন্তু সমাজ এই একটী কন্যার পরিগ্রহণকে কখনো সম্মতি দিতে পারে না, এমনই তার সুদৃঢ় গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডূকতা। কন্যাটী যদি পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিতও হয়, তবু সমাজের কাছে সেটা খুব একটা উল্লাসের ব্যাপার হয় না। বিদেশযাত্রী হিন্দুদের ভিন্ন দেশ থেকে নিজ নিজ পাত্রী ভিন্ন ধর্ম্মের লোক থেকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসবার একটা হিড়িক যখন প'ড়ে যাবে, তখন এই কুণ্ঠাটা হয়ত কিছুটা কেটে যাবে কিন্তু ভাবী মুসলমান-পাত্রীরা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনি, সুইজারল্যাণ্ড বা আমেরিকার কন্যা নাও হ'তে পারে। হয়ত তারা এই ভারতেরই মুসলমান-কন্যা, যারা বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে ব্যাপক বৈবাহিক আদান-প্রদানের পথে মনস্তত্ত্বগত একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর একটী বিষয় ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতের হিন্দু তার পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব খোঁজবার জন্য এই ভারতেরই অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ইরাণ, তুরাণ বা আরবের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানকে তার অতীত গৌরব স্মরণ করার জন্য বারংবার মনে মনে যেতে হয় ভারতের বাহিরে অনেক পশ্চিমে অবস্থিত কয়েকটা দেশে। ফলে ভারতকে স্বদেশ ব'লে ভালবাসতে তাদের চিত্ত

অধিকাংশে স্থলেই অক্ষম হচ্ছে। এই পার্থক্যটা এত মৌলিক যে, এই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কি ক'রে হিন্দু আর মুসলমান একত্র মিলিত হবে, এটা প্রকৃত মনীষীদের চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকের সকলকে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে মুসলমান ক'রে ফেলা মুসলমান ধর্ম্মের একটী আদি বিশেষত্ব। অমুসলমানকে মুসলমান কর্ত্তে পারলে তার জন্য শাস্ত্রীয় তারিফ এবং প্রচুর পুণ্যফল রয়েছে। হিন্দুর চরিত্রে এই জাতীয় কোনো সংস্কার নেই, বরঞ্চ হিন্দুরা এই বিষয়ে যে একেবারে জড় পদার্থ, একথা কলকণ্ঠে প্রকাশ কর্ত্তে সে গৌরব অনুভব করে। কিন্তু সুশৃঙ্খল জনসংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টার মধ্য দিয়েই হোক বা সুনিয়মিত ধর্ম্মান্তরণের মধ্য দিয়েই হোক্, মুসলমানদের সংখ্যা ভারতে ক্রমশই বাড়বে এবং বাড়্‌তে থাকবে। আর, হিন্দুরা নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদাসীন থেকে এবং সম্ভবতঃ নিজেদের সংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারে সহায়ক নানা কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন ক'রে নিজেদের সংখ্যাকে আপেক্ষিক-ভাবে কেবল কমাতেই থাকবে। তথাপি এমন সম্ভাবনা দেখি না যে, এক হাজার বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ হিন্দুহীন হ'য়ে যাবে। যে কারণে ভারত হিন্দুহীন হবে না, সে কারণটী হচ্ছে হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য। একটী মাত্র ব্রাহ্মণও যদি ভারতে জীবিত থাকে, তাহ'লে ব্রহ্মগায়ত্রী থাক্‌বেই থাক্‌বে। ব্রহ্মগায়ত্রী যদি থেকে

যায়, তাহ'লে আনুষ্ঠানিক-ভাবে যদি নাও হয়, অন্ততঃ ঔপপত্তিক ভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্য থেকেই যাবে। আর, চাতুর্ব্বর্ণ্য থাক্‌লেই কিছু অহিন্দু চিরকাল শূদ্র হ'য়ে এ সমাজে ঢুকবে, কিছু শূদ্র ধনোৎপাদনদক্ষতার ফলে বৈশ্য হবে, কিছু বৈশ্য সামরিক নৈপুণ্যের জন্য ক্ষত্রিয় হবে। এই যে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ, তাকে যদি আইন প্রণয়নকারীরা তুলে দেবার জন্য কখনো চেষ্টা করেন, তবে বিস্ফোরণের মুখে আইন-প্রণেতাদের সিংহাসন সহ ছিন্ন মুণ্ড সব ফুৎকারে আকাশে উড়ে যাবে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যদি হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধারণাকে উৎখাত ক'রে দিতে সমর্থ হ'ত, তাহ'লে আজ আফগানিস্থান আর পূর্ব্ববঙ্গের মত সমগ্র ভারত মুসলমান হ'য়ে যেত। যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ঘাঁটি গাড়তে পেরেছে এবং তারপরে যেখানে মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়েছে, সেখানে এই দুই ঘটনার সমাবেশের ফল মাত্র একটীই দেখা গেছে, সেটি হচ্ছে ইসলামের বিপুল প্লাবন। কিন্তু সমগ্র ভারত মুসলমান হয় নি। তার মানে এই যে, ভারত থেকে হিন্দুকে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দিতে কেউ পার্ব্বে না। কিন্তু মুসলমানও বিলুপ্ত হবার নয়। বেঁচে থাকবার যথেষ্ট উপকরণ ঐ সমাজের মধ্যে রয়েছে। ফলে দুটী জাতিকেই যদি এক দেশে অনন্তকাল থাক্‌তে হয়, তাহ'লে মিলে মিশে থাকার রাস্তা বের কর্ত্তেই হবে। আমার মতে হিন্দু-মুসলমানে মিলনের পথে সব চেয়ে বড় অন্তরায় দৈশিক চেতনা। আমার স্বদেশ ভারতবর্ষ, তোমার

স্বদেশ আরব বা পারস্য। তোমার আর আমার ভারত-চেতনা ত' ঠিক এক রকমের হবে না! আমরা মিলব কি ক'রে? তোমাদের কয়েক হাজার মেয়ে আমরা ঘরে তুলে নিলাম, আমাদের কয়েক হাজার মেয়ে তোমরা ঘরে তুলে নিলে,—এমন একটা রুচি সৃষ্টির জন্যও আমাদের স্বাদেশিকতার অনুভূতিতে একটা প্রগাঢ় সাম্য আসা উচিত। একজন ইংরাজের ধর্ম্মভূমি জেরুজালেম হ'লেও তার স্বদেশ ইংল্যাণ্ড, সে ইংল্যাণ্ডের স্বাধীনতার রক্ষার জন্য অবহেলে প্রাণ দেবে।—এই একটী দৃষ্টান্তই হয়ত আমাদের আলোচ্য বিষয়ে দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের কাজ কর্ত্তে পারে। একদিন গোঁড়া হিন্দুর উদারপ্রাণ ছেলেরা মুচি, মেথর বা এই রকম নিম্নশ্রেণীর ঘরের যোগ্যা মেয়েদের গৃহবধূরূপে বরণ ক'রে নিজ ঘরে তুলবে কিন্তু এই কথাটা জেনে যে, উভয়ের জন্মভূমি, মাতৃভূমি, পিতৃভূমি বা স্বদেশ এই ভারতবর্ষ। জলন্ত স্বাদেশিকতার অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে আমাদের এমন অনেক সমস্যা একদিন মিটে যাবে, আজ যার সমাধানের রাস্তা খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

বহুবিবাহ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক স্বামী বিদ্যমানে আর একটী স্বামী করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন অযশস্কর, এক স্ত্রী বিদ্যমানে আর একটী স্ত্রী গ্রহণ করা স্বামীর পক্ষেও তেমন অযশস্কর। ভদ্র মন কদাচ এর

সমর্থন কত্তে পারে না। তুমি যত বড় ধনী, বিদ্বান্, পরাক্রান্ত, যোগৈশ্বর্য্যশালী বা ধার্ম্মিকই হ'য়ে থাক, এক স্বামী থাক্‌তে আর একটী স্বামী, এক পত্নী থাকতে আর একটী পত্নী গ্রহণ ক'রে মানুষের সমর্থন, পূজা বা প্রশংসা এই যুগে দাবী কত্তে পার না। এই যুগের মানুষ ভয়ে প'ড়ে কাউকে সম্মান করে না, করে অন্তরে শ্রদ্ধা জাগ্‌লে। এক পত্নীর একাধিক স্বামী সাধারণ কল্পনার বাইরের ব্যাপার, দু-একটা অতীব অনুন্নত সমাজে হয়ত দেখা যায়। কিন্তু এক পতির বহু পত্নী এখনো অচল হয় নাই। বহু পত্নী থাকা সত্ত্বেও দুচারটি উপপত্নী রাখতেও অনেক স্থানে দেখা যায়। সমাজ যে প্রকাশ্যে এসব ব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ কিছু করে না, তা' দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সমাজের কাঠামোর মাঝেই ঘুণে ধরেছে, যার চিকিৎসা বাইরের প্রলেপে হবার নয়। পুরুষের বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় তুমুল আন্দোলন ক'রে গেছেন, এবং এর ফলে লোক-মতের কিছু পরিবর্ত্তন, দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু উন্নতি ঘটেছে। একদা হয়ত আইন ক'রে পুরুষের বহুপত্নীত্ব নিবারিত হবে কিন্তু সেইটুকুই কি যথেষ্ট? যার বহু নারীর প্রতি সম্ভোগ-লালসা রয়েছে, সে আইনসঙ্গত ভাবে কাউকে বিয়ে করল না কিন্তু গোপনে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করল। এতে কি সংসারের শান্তি বিপর্য্যস্ত হয় না? বিবাহ করার আগে কোনো স্বামী জান্‌তে পারে না যে, যাকে বিবাহ কচ্ছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক সুখের

হবে কিনা। জুতো যে পায়ে দেয়, মাত্র সেই জান্‌তে পারে যে পেরেকটা কোথায় গিয়ে বিঁধ্‌ছে। বিবাহিত দম্পতীর উভয়ের মধ্যে দৈহিক যোগ্যতা, মানসিক রুচিবোধ, চারিত্রিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান, ব্যবহারের শোভনতা, পরস্পরের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে অনুভবশীলতা এবং কি ক'রে একে অপরের সুখ-সম্পাদনে সর্ব্বদা পরিপূরক হ'তে পারে, তদ্বিষয়ে মননশীলতা প্রভৃতির দিক দিয়ে একটা সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য এবং সমতা থাকা একান্ত দরকার। কিন্তু এতগুলি বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে বিবাহ কোথায় হওয়া সম্ভব? বিবাহ ত' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা লটারি মাত্র। লাখ লোকে হেরে যায়, হঠাৎ একজন অপরিসীম ধনে ধনবান্ হয়। তবু লোকে বিবাহ করে এবং কর্ব্বে। করে সুখের আশায়, শান্তির আশায়, তৃপ্তির আশায়, ভালবাসার নেশায়। সেই সুখ, সেই শান্তি, সেই তৃপ্তি, সেই ভালবাসা পেতে হ'লে দুজনকেই দুজনকে অনেক কিছু দিতে হয়। সব চেয়ে বড় জিনিষ যেটি দিতে হয়, সেটি হচ্ছে বিশ্বস্ততার আশ্বাস। "আমি চিরকাল তোমারই রইব, আমি অন্য কারো কখনো হব না।"—এই আশ্বাসটী যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জীবনে ফুটে না ওঠে, তাহ'লে এজীবন সুখের হয় না। দেখ, অমুক প্রয়োজনে প'ড়ে আর একটী বিয়ে কর্লুম, তৃতীয় বিবাহটী কর্লুম একটী নিরাশ্রয়া অনাথা মেয়েকে নিরাপদ আশ্রয় দেবার জন্য, চতুর্থ বিবাহটী কর্লুম একটী দিব্যকান্তি সন্তানের আশায়, কারণ মেয়েটী

পরমা সুন্দরী কিনা, পঞ্চম বিবাহটী কর্ম্মুম সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলনে সাহায্য করার জন্য, ওটাও ত' সৎকাজ, ষষ্ঠ বিবাহটী কর্ম্মুম দেশের বাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য একটা স্থায়ী লোক ওখানে বসিয়ে রাখার জন্য, নিজের লোক না হ'লে ত' আর কেউ আমার বাড়ী মমতা সহকারে তত্ত্বাবধান কর্ব্বে না, সপ্তম বিবাহটী কর্ম্মুম এই ভেবে যে, অফিস-আদালতের বড় বড় সায়েবেরা, কল-কারখানার বড় বড় মালিকেরা প্রায়ই ত' দেখা কত্তে আসেন, আবার পার্টিও দেন, তাদের আদর-যত্ন কত্তে হয়, যেতে হয়, সঙ্গে একটী হাল-ফ্যাশানের শিক্ষিতা মেয়ে-মানুষ না থাকলে কে এসব ঝক্কি সামলায় বল, অতএব একটী আধুনিকা মেয়েকে একেবারে দায়ে পড়েই বিয়ে কত্তে হ'ল।—এই জাতীয় নানা কুযুক্তি বিস্তার ক'রে নিজের বহু বিবাহকে সমর্থন করা একেবারেই অর্থহীন। যার ভাগ্যে যা' আসে আসুক, বিবাহ একটীই হবে এবং সেই বিবাহকে সফল করার জন্য দম্পতীর উভয়কে প্রাণপণে চেষ্টা কত্তে হবে।

বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়ার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহিত জীবনে সুখী হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, বিবাহিত জীবনের মধ্যেও সংযম-পালনের শুভফলকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। এমন পুরুষ বা এমন নারী থাকে, যাদের শরীরের গঠনই এইরূপ যে, দুরন্ত

সম্ভোগের পরেও তারা আরো চায়। এটা জীবের স্বভাব নয়, এটা একটা রোগ। ভোগে ইন্ধন দিয়ে এই রোগকে সারান যায় না, এই রোগটী সারাবার ঔষধ হ'ল ভোগকে সীমাবদ্ধ ক'রে নেওয়া। ভোগ সীমাবদ্ধ হ'লে তার অনুভূতি হবে একাগ্র আর অনুভূতি একাগ্র হ'লে অল্প ভোগে অসীম তৃপ্তি সম্ভব হবে। এই কথাটায় পূর্ণ বিশ্বাস রেখে স্বামী এবং স্ত্রী যদি অকপটে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী নানা-রূপ অনুশীলন দ্বারা ভোগ-চর্চ্চাকে একটা শিল্পে পরিণত কত্তে পারে,—যা' অবশ্যই পারা তা'দের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়,—তা' হ'লে দেখা যাবে যে, আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন না ক'রেও তারা তা'দের বাসগৃহখানাকে আলোতে আলোময় ক'রে তুলেছে। কাগজের উপরে তালে-বেতালে রেখা টান্‌তে টান্‌তে একটা লোক যখন চিত্রকর হ'য়ে পড়ে, তখন দেখা যায় যে, সে অতি অল্প কয়েকটা কালীর আঁচড় টেনেই এক মহদর্থবোধক চিত্রের রচনা ক'রে ফেলেছে। প্রথম দিন থেকে সে যতগুলি কালীর আঁচড় কেটেছে, তার প্রত্যেকটার পশ্চাতে যদি তার এই অভিপ্রায়টী থাকে যে, তাকে এক সার্থক চিত্রকর হতেই হবে, তবেই এটা সম্ভব। বিবাহের পর থেকে স্বামী ও স্ত্রীর ভিতরে যতগুলি গূঢ় ব্যবহার হবে, তার প্রত্যেকটার পশ্চাতে যদি উভয়ের এই লক্ষ্যই থাকে যে, রিপুর উত্তেজনার দায় মেটাবার জন্যই তারা অঙ্গ-সঞ্চালন

করছে না, পরন্তু প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনকে একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুভূতির উৎপাদক রূপে পাওয়া চাই, এবং সেই অনুভূতিটি শুধু প্রতি অঙ্গেই নয়, কোটি কোটি রোমকূপের প্রতিটির মধ্যে আস্বাদন করা চাই,—তাহ'লে কিছুদিন পরেই দম্পতী প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্ময়ান্বিত হবে যে, এ সম্ভোগ-লীলা একটী প্রাকৃত মানবের সহিত একটী প্রাকৃত মানবীর নয়, এ মিলন-প্রয়াস বিশ্বপিতা বিশ্বনাথের সাথে বিশ্বমাতা অন্নপূর্ণার অপ্রাকৃত লীলা। তুচ্ছ ভোগ তখন বিশ্বসম্ভোগে পরিণত হবে এবং কাম-রিপু স্তব্ধ, হতোদ্যম, ব্যর্থ ও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে প্রেমসমুদ্রে ডুবে মারা যাবে। বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়ার এটী চাবিকাঠি।

একনিষ্ঠা স্বামীর জীবনে গৌরব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহিত পুরুষটীর মন যাতে নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য নারীর প্রতি অন্তরঙ্গ ভাবে আকৃষ্ট না হ'তে পারে, এজন্য প্রধান চেষ্টাটা তার নিজস্ব হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীর খবরদারীর ভয়ে বা স্ত্রীর তর্জ্জন-গর্জ্জনের দাপটে সে বাধ্য হ'য়ে মনকে ও আচরণকে সংযত ক'রে চলে, এটা তার অনুকূল কোনো প্রশংসাপত্র নয়। স্বামীকে অন্যা নারীর প্রতি আকৃষ্ট ব'লে সন্দেহ কর্‌লে স্ত্রীর মনে ভীষণ উজ্জ্বলতার সৃষ্টি হয়, এটা স্ত্রীর কোনো দোষ নয়। এই

জিনিষটী আংশিক ভাবে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ভিতরে স্বাভাবিক আছে ব'লেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীরা নিজ নিজ স্বামীর চরিত্রধনের সুরক্ষিকা বা একনিষ্ঠতার অভিভাবিকা। কিন্তু স্ত্রী এই বিষয়ে কিছু জানুক, বা না জানুক বুঝুক বা না বুঝুক, করুক বা না করুক, স্বামীর কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজের একনিষ্ঠা নিজের বিবেকবলে পরিরক্ষণ ক'রে যাওয়া। নিজের শক্তিতে নিজেকে রক্ষা ক'রে চলার কৃতিত্ব স্বামীর পক্ষে এক পরম গৌরব।

আমার দৃষ্টিতে বিবাহ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণ সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের বিবাহকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, এই বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গী তা' থেকে একটু আলাদা। বিবাহের মধ্য দিয়েই সমাজবদ্ধ মানবজাতি তার ভবিষ্যৎ সমুন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। দুটী স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ এজন্যই বিশেষ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। দুজনের মিলন-ফলে এমন কারো আবির্ভাব ঘ'টে যেতে পারে, যিনি এই পিতা এবং এই মাতা উভয়েরই গুণোৎকর্ষকে অতিক্রম ক'রে এক পুরুষোত্তমের মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বেন। দেহের মাধ্যমেই মনটা বেয়ে চলে, এজন্য এক দেহাংশের অন্য এক নবতর দেহে সঙ্করণটা একটা দারুণ তাৎপর্য্যবাহী ব্যাপার। জগদ্বাসীর ভাবী নবজন্ম সম্পূর্ণ-রূপে এই একটা ব্যাপারের উপরে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভর করে। বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতে উত্তরণের সেতু হ'ল বিবাহ। এই

জন্যই বিবাহ ঘটনাটার উপরে আমার দৃষ্টি অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং পবিত্র।

রংপুর
৮ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪২
(২৪শে জুলাই, ১৯৩৫)

কন্যাদায়

জনৈক ভদ্রলোক কন্যাদায়ের কথা তুলিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়ে বড় হ'য়ে উঠ্‌লেই কন্যাদায় সুরু হ'ল, একথা মনে করো না। মেয়ে জন্মলাভ করা মাত্র কন্যাদায় সুরু হ'য়ে গেল। বড় হ'লে তা'কে বিয়ে দিতে হবে, দায়মাত্র এইটুকুই নয়। যেমন সংসারেই তার বিবাহ হোক্, সে যেন সেখানে শান্তি, তৃপ্তি, প্রীতির অমৃত পরিবেশন কত্তে পারে, তার যোগ্য ক'রে তাকে গ'ড়ে তোলার দায়ই সব চেয়ে বড় দায়। পুরুষেরা অধিকাংশ সময়েই আত্মবলপ্রবুদ্ধ, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারে অপর দশজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন। পুরুষদিগকে সন্তান প্রসব কত্তে হয় না, মেয়েদের তাই ক'রে ক'রে কেবল দুর্ব্বল আর রোগগ্রস্ত হ'তে হয়। পুরুষেরা কোথাও একাকী বাস কর্ম্মে নিন্দনীয় হয় না, নারী একাকিনী বাস কর্ম্মে কেবল নিন্দারই শিকার হয় না, লম্পটেরও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়। পুরুষে আর নারীতে এই সব বাস্তব পার্থক্যের দরুণই পুত্রদায়ের

চেয়ে কন্যাদায়টা অধিকতর উদ্বেগপূর্ণ দায়িত্ব। ছেলের পাখা হ'লে উড়ে যেতে পারে, মেয়েরা স্বামীর ঘরে বাসের অযোগ্যা হ'লে মা-বাপেরই আবার ঘাড়ের বোঝা হয়। এগুলি সবই বাস্তব অসুবিধা। এজন্যই প্রয়োজন হচ্ছে কন্যার জন্ম হওয়া মাত্র তার ভবিষ্যৎকে নির্বিবাদ ও নির্বিঘ্ন ক'রে দেবার জন্য মাতাপিতা উভয়েরই উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যাওয়া। সেই উপায়টীর নাম শিক্ষা।

কন্যাদায় উদ্ধারের মৌলিক উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক খ শেখানোর নামই শিক্ষা নয়। হাতে খড়ি হবার অনেক আগে থেকে শিক্ষার হবে সুরু। পিতামাতার নিজ নিজ চরিত্র থেকে এমন দৃষ্টান্তগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে দিতে হবে, যে সব দৃষ্টান্তের অনুকরণ কর্ম্মে শিশু-সন্তানের ভবিষ্যৎ হবে তিমিরাবৃত বা কলঙ্কিত। পিতামাতাকে সত্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, সংযতবাক্ এবং স্নিগ্ধস্বভাব হ'তে হবে। খিটখিটে মেজাজের মা-বাপের ছেলেমেয়েরা কদাচ শান্তপ্রকৃতির হয় না। বাচালতা জিনিষটা মেয়েরা যত সহজে আয়ত্ত করে, ছেলেরা তত সহজে পারে না। যে সকল মহিলারা, তাঁরা ইতিহাস-জগতেরই মানুষ হোন্ বা পৌরাণিক কালেরই কল্পনা হোন্, নিজ নিজ জীবনের মধ্যে ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সাহস, দৃঢ়তা, সততা ও চরিত্রবত্তার উদাহরণ দেখিয়েছেন, তাঁদের জীবন-কথা বারংবার

রসাল ভাবে মেয়েদের কাছে পরিবেশন ক'রে ক'রে তাদের মনের গঠনের উপরে মহত্ত্বের একটা অনবলোপ্য ছাপ ফেলবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই চেষ্টায় পিতামাতা সফল হ'লে দেখা যাবে যে, আজকের এই ছোট্ট মেয়েটী ভবিষ্যতে সংসার-সাগরের ঝটিকাক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গমালার উপরে সার্কাসের সুশিক্ষিতা মেয়েদের মত অবহেলে একটা ছোট্ট ডিঙ্গি বেয়ে নিয়ে তীর-বেগে ছুটে চলেছে। কন্যাদায় উদ্ধারে এটা হচ্ছে মৌলিক উপায়।

মেয়েরা মহাশক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বরে বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা, পরিজনদের প্রতি স্নেহ ও প্রেম, প্রতিবেশীদের প্রতি বিদ্বেষবিহীন মনোভঙ্গী এবং বিশ্বমানবের সমস্ত সম্পর্কে উদার দৃষ্টি যদি তুমি তোমার মেয়েটীর ভিতরে সৃষ্টি ক'রে দিতে পার, এবং এর উপরে আবার মেয়ের বুদ্ধিতে যদি এই প্রখরতা থাকে যে, সঙ্কট-কালে নিজেকে বাঁচাবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভয়-বিহ্বলতা বিদূরণ, তাহ'লে ভবিষ্যতে এই মেয়ে তার পিতামাতার কাছে একটা দায়-স্বরূপ হবে না, হবে পিতৃমাতৃদায় উদ্ধারকারিণী মহাশক্তি। মেয়ে জন্মেছে ব'লে কেউ তাকে তাচ্ছিল্য ক'রো না, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো না। তাকে তার অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের সর্ব্বপ্রকার

অবস্থার জন্য যাতে তৈরী ক'রে দিতে পার, তার দিকে দৃষ্টি দাও। মেয়েকে মহাশক্তি ব'লে জ্ঞান ক'রো। জগতে আর একটা মানুষকে আনতে হ'লে প্রসব কর্ব্বে তাকে মেয়েরাই এবং প্রসবের আগে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ কর্ব্বে তাকে মেয়েরাই। তোমার মেয়ের গর্ভে যদি কোনো দিন একটা দিক্‌পাল পুরুষের জন্ম হয়, তবে এই মেয়ের জীবনই শুধু ধন্য হ'ল না, এই মেয়ের তোমরা পিতামাতা ব'লে তোমাদেরও জীবন ধন্য হ'ল।

যে মেয়েরা বিবাহ করে না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, একথাও সত্য যে, জগতের সব মেয়েই সংসারী করার জন্য জন্মগ্রহণ করে না, সব মেয়েই বিবাহিত হ'য়ে পরের সংসারে প্রবেশ করে না। কিছু কিছু মেয়ে এমনই সৎ-সংস্কার নিয়ে আসে, যাদের পক্ষে সংসারী-জীবনে প্রবেশ করা অসম্ভব। এরা প্রথমটায় নানা পরীক্ষায় প'ড়ে, নানা বিপদ-আপদের মধ্যে প'ড়ে বারংবার ক্ষণিক চিত্তাবেগের সঙ্গে স্থায়ী আদর্শবাদের সংঘাতকে সুস্পষ্টরূপে দেখ্‌তে, বুঝ্‌তে ও বিচার কর্ত্তে বাধ্য হয় এবং পরিণামে সাধন-সমরে জয়ী হয়। সে সব মেয়েরা আপাততঃ পিতামাতার কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হ'লেও তারা কদাচ পিতামাতার দায় নয়। তারা বংশের দায়কে উদ্ধার

ক'রে তাদের জগৎকল্যাণকারিণী শক্তির বিকাশ সাধন ক'রে জগদ্‌বাসীকে অমোঘ প্রেমামৃতরস আস্বাদন করায়।

পুণ্যবতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন মেয়ে আছে, যারা বিবাহ করে না কেবল পুরুষের অধীন হ'তে হয় ব'লে। এ ছাড়া অন্য দিক দিয়ে এসব মেয়ের সঙ্গে বিবাহিতা সাধারণ মেয়েদের কোনো পার্থক্য নেই। এমন মেয়ে আছে, যারা রুগ্ন ভ্রাতা, নিরাশ্রয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী, উপার্জ্জনে অক্ষম পিতা, জরা-জর্জ্জরিতা বৃদ্ধা ঠাকুরমা বা দিদিমাকে যোগ্য ভাবে পালন ও শুশ্রূষা করার প্রয়োজনে নিজেকে সংসারী জীবনের ঝক্কি থেকে মুক্ত রাখে। এরা সত্যই ভাগ্যবতী, এঁদের দেখলে পুণ্য হয়। আর একদল মেয়ে আছে, মন যাদের সংসারী চেতনার উর্দ্ধে, যাদের প্রাণটী নিয়ত যুক্ত হ'য়ে আছে অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরে, যাদের ঐহিক সুখকামনা নেই, কামনা শুধু বিশ্বজনের হিত-সাধন, যাদের ধন-মান-যশ-প্রতিপত্তির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু সকলের দুঃখ-নিবারণ। এরা মহাপুণ্যবতীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠা। এঁদের আবির্ভাবে ধরণী কোটি কল্পের পাপ থেকে উদ্ধার পায়। এদের আগমনের প্রতীক্ষায় আমি দীর্ঘকাল ধ'রে জয়-মা জয়-মা ধ্বনি ক'রে বেড়াচ্ছি।

মোট কথা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হ'লেই মোট কথা দাঁড়াল এই যে, প্রথমে শিখাতে হবে আত্মশ্রদ্ধা। তারপরে পরহিত-বৃত্তি। তারপরে পরমেশ্বরে আত্মনিমজ্জন। এদেশেই হোক আর পাশ্চাত্য দেশেই হোক, যারা আত্মশ্রদ্ধী, তারাই বিপদুত্তরণ ক'রে বেরিয়ে আসে, যারা পরহিত-ব্রত তাদেরই জীবন হয় ধন্যাতিধন্য, যাঁরা পরমেশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ তাঁদের সেবা হয় নিষ্কলঙ্ক, তাঁদের ইচ্ছা হয় নিষ্পাপ, তাঁদের চেষ্টা হয় নিষ্কলুষ, তাঁদের চেষ্টা হয় অপ্রার্থনীয় প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত, তাঁদের জীবন হয় যেন চন্দন-গন্ধবহ মলয়-সমীরণ।

চোরের প্রতি কর্ত্তব্য

অপর একজন বিগত রাত্রির এক দুর্ঘটনার কথা বলিলেন। চোরে তাঁহার অনেকগুলি জিনিষপত্র নিয়া গিয়াছে। তিনি অর্দ্ধ-জাগ্রত ছিলেন কিন্তু চোরকে ধরিবার তিনি চেষ্টা করেন নাই। ভাবিয়াছেন, চোরেরও ত' প্রয়োজন আছে। ঠিক না!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চোরে তোমার টাকাকড়ি, সোণা-গয়না, ঘড়ি-ফাউন্টেন সব কিছু নিয়ে গেল, আর তুমি বলছ, চোর যেন ক্ষমা পায়। এ তোমার মহত্ত্বের পরিচায়ক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে চোরের জন্য আরও একটী প্রার্থনা করো। সেটি হচ্ছে এই যে, চোরের

যেন পরদ্রব্যে লোভ ক'মে যায়, চৌর্য্যের প্রবৃত্তি নাশ পায়, দীন-দরিদ্র-দুঃখীকে দয়া ক'রে সে যেন সদ্‌ভাবে অর্থার্জ্জন ক'রে তাই থেকে দান কত্তে প্রলুব্ধ হয়। সজ্জনের ধন চুরি ক'রে চোরের যদি এই লাভটুকু না হ'ল, তাহ'লে কষ্ট ক'রে চুরি করাটা একেবারেই মিথ্যা হ'য়ে গেল যে। চোর যেন ক্ষমা পায়, মনে মনে এই কামনাটী ক'রে তুমি অতীব প্রশংসনীয় একটী সাত্ত্বিক কর্ত্তব্য তার প্রতি করেছ কিন্তু এতে তোমার সম্যক্ কর্ত্তব্য-পালন হ'ল না। কর্ত্তব্য তোমার আরও কিছু ছিল।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চুরি করা কোনো পুণ্য কাজ নয় যে, একাজে কাউকে প্রশ্রয় দেওয়া বা সুযোগ দেওয়া ভাল কাজ হবে। পাপ কাজে প্রশ্রয় দেওয়াও পাপ। আমি যদি এমন ভাবে চলি, যাতে অন্য লোকের পাপ কাজ করার প্রলোভন জাগে বা দুঃসাহস জন্মে, বা রুচি সৃষ্ট হয়, তবে তার পাপানুষ্ঠানের জন্য আমিও ত' দায়ী হব। সুতরাং কেউ যাতে এমন কাজ কত্তে সহজে প্রলুব্ধ বা চেষ্টিত না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমার কাজ করা কর্ত্তব্য। "হে লম্পট, তোমার চরিত্র সংশোধিত হোক্,"—এই কথা যদি কোনো রমণী মনে মনে অবিরাম জপ করে আর চলাফেরা, বসা, শোয়া প্রভৃতির ভিতরে সতর্কতা

তাহ'লে লম্পট সুযোগ-মত একটা জঘন্য কাজ ক'রে বস্‌বে না, এমন কথা কে দিতে পারে? সুন্দরী যৌবনবতী নারী প্রকাশ্য স্থানে স্তন-জঘন অনাবৃত রেখে প'ড়ে বেদম ঘুমুবে, আর মনে মনে আশা করবে যে, যারা এ অবস্থাটী দেখ্‌বে, তারা "জয়মা কামাখ্যাময়ী" ব'লে ধ্বনি দিয়ে ভক্তিনত-কন্ধরে প্রণাম ক'রেই যার যার ঘরে ফিরবে,—এটা কখনো স্বাভাবিক ব্যাপার হয় না। লুব্ধ ব্যক্তি লোভের বস্তু দেখেও আত্মসংযম করুক, এটা সকলেরই আকাঙ্ক্ষণীয় হবে কিন্তু লুব্ধের লোভ বেড়ে যাবে তখন, যখন সে স্পষ্ট দেখ্‌বে যে, তাকে বাধা দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাকে শাসন করার জন্য কারো উদ্যত দণ্ড নেই।

পুলিশের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেকে বলেন, পুলিশ উঠে যাক্ প্রত্যেকটী মানুষ নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে প্রতিটি কর্ম্ম করুক, মানুষে মানুষে সরল মনে সহজ ভাবে আদান-প্রদান হোক, পুলিশ, শাসন, আইন-কানুন এসব ত' অনাবশ্যক আড়ম্বর বা সভ্যতার ঘাড়ের বোঝা মাত্র। কথাগুলি মন্দ নয়। কিন্তু পুলিশ না থাক্‌লে দেশের কি অবস্থা হ'তে পারে, তাও বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। পুলিশ যদি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েস, খল, প্রবঞ্চক, ও পরস্বাপহারীর সহায় না হ'য়ে নিজ কর্ত্তব্যে নিষ্ঠাবান্

থাকে, তবে সমাজের লোকের পক্ষে পুলিশের মতন বান্ধব আর কেউ নেই। কিন্তু পুলিশ যখন ঐ সব অসৎ লোকদিগকে নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে বাঁচাবার জন্য ব্যগ্র, তখন পুলিশের মতন সমাজ-শত্রু আর কেউ নেই। কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ সমাজের শান্তিকামী ব্যক্তিদের নিকট যেন স্বর্গের দেবতা। কিন্তু পুলিশ যখন উৎপীড়িত এবং উৎপীড়ক এই উভয়ের কাছ থেকে সাধ্যমত উৎকোচ সংগ্রহে ব্যস্ত হবে, তখন ত' তার মতন নারকীয় জীব জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না। পুলিশের প্রয়োজন আছে কিন্তু পুলিশ যেখানে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট বা কর্ত্তব্যে অক্ষম, সেখানে চোর-ডাকাতকে রুখ্‌বার জন্য তোমার একার বা প্রতিবেশী দশ জনের সম্মিলিত শক্তিকে একাজে নিয়োজিত কর্ত্তেই হবে। নইলে দেশ চোর এবং ডাকাতে ভ'রে যাবে।

রংপুর

৯ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২

(২৫শে জুলাই, ১৯৩৫)

দেশোন্নতির মূল ত' পিতামাতার হাতে

একজন ভদ্রলোক সমাজের উন্নতিকল্পে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি মনোযোগ সহকারে যাবতীয় কথোপকথন শুনিবার পরে বলিলেন,—দুনিয়া-শুদ্ধ সব লোকেই চায় যে, পৃথিবীর

আবহাওয়ার এমন এক শুচিস্মিত বিচিত্র-সুন্দর পরিবর্ত্তন ঘটুক, যেন পাপদগ্ধ তাপক্লিষ্ট এই ধরণীতে স্বর্গের নন্দন-শোভা সৃষ্ট হইতে পারে। কে না বল্‌বে যে, এ প্রস্তাব সাধু? কিন্তু আসল গোলটা বেঁধে গেছে, কার্য্যারম্ভ নিয়ে। আমরা কাজ কর্ম্ম বাইরের লোকের ভিতরে গিয়ে আর বর্জ্জন ক'রে যাব নিজ নিজ সংসারের গণ্ডীকে। পিতা তার পুত্রকন্যার চরিত্রকে গঠনের দিকে মন দেবেন না, কেবল চেঁচাবেন যে, অন্য লোকের ছেলেমেয়েরা কেন শান্ত, দান্ত, সৎস্বভাব-সমন্বিত হচ্ছে না। গ্রামদরদী সজ্জন নিজের গ্রামের ছেলেমেয়েদের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ-বাণী নিক্ষেপ ক'রে আস্‌বেন। নিজের ঘরকে ফাঁকি দেবার এই যে একটা কৌশল, এটা কেবল অজ্ঞানতারই ফল নয়, এটার উৎপত্তি-স্থল ফাঁকি দেওয়ার মৌল এক প্রবৃত্তি। পিতামাতা নিজেরা যে সৎ অনুশীলনটুকু নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান কচ্ছেন, তা' নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের দেন না। কত তরুণ আজ নবজীবনের দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আমার কাছে আস্‌ছে, কিন্তু এরা যখন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হবে, তখন দেখা যাবে যে, এরা নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে সেই পথে পরিচালিত করে নাই, যেই পথে ভারতের প্রত্যেকটী পুত্রকন্যা প্রধাবিত হোক্

ব'লে এরা বারংবার বজ্রকণ্ঠে সঙ্কল্প ক'রে যাচ্ছে। অনেক দূরে দেখ্‌তে পাওয়ার চেষ্টা করার ফলে এরা যে অতি নিকটের কর্ত্তব্যকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, এইটাই আমার সব চেয়ে বড় আফ্‌শোষ। ইংরাজিতে বলে,—"Charity begins at home—ঘর থেকেই সৎ-স্বভাবের অনুশীলন সুরু হয়।" আমার কর্ম্মক্ষেত্র যে আমার হাতের কাছে, আমার কুরুক্ষেত্র খুঁজে বের করার জন্য যে সহস্র বনকান্তার ও মরুভূমি অতিক্রম কত্তে হবে না, প্রথমেই যে নিজের ঘরের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কাজ ধরতে হবে, এই কথাটী পদে পদে আমরা ভুলে যাই। অমুক শেঠ আর তমুক মহারাজা, অমুক নেতা আর তমুক ব্যারিষ্টার, অমুক বক্তা আর তমুক অধ্যাপক কেন দেশের বিপদের সময়ে মোটা হাতে দান কর্ল্লেন না, এ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই। কিন্তু তোমার আমার ঘরের ছেলেরা কেন জল-খাবার পয়সা থেকে বাঁচিয়ে মাত্র দুটা পয়সা সেই একই মহদুদ্দেশ্যে দিল না, এ নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও দুশ্চিন্তা নেই। হরিসঙ্কীর্ত্তনে পরের ছেলেরা কেন এখনো এসে যোগ দিল না, তাই নিয়ে আমরা কত অনুযোগ অভিযোগ সুরু করি কিন্তু আমাদের ঘরের ছেলেরা যে অদূরে ব'সে তাস পিটছে, সেই দিকে নজর রাখি না। দেশের উন্নতি আর দশের উন্নতি ব'লে ব'লে হাজার চীৎকার কর্ল্লেও কিছুমাত্র শুভ হবে না, যতক্ষণ প্রত্যেক পিতামাতা

নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে সৎপথে প্রধাবিত করার ব্রত নিজেদের ঘাড়ে তুলে না নেবেন। নেতারা এসে দেশোদ্ধার ক'রে দেবেন পরের ছেলের পঙ্গপাল একত্র ক'রে নিয়ে, এই খোয়াব ভুলে যেতে হবে। প্রত্যেকে তোমরা নিজ নিজ ছেলে-মেয়ের হাতে দেশের, দশের, সমাজের হিতকল্পে কাজের পসরা তুলে দেবে, তবে আসবে উন্নতি। নেতৃত্ব নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী মার্কা-মারা লোকের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে প্রত্যেক পিতামাতার হাতে যেদিন তুলে দেওয়া যাবে, সেদিনই কাজের মত কাজ কিছু হবে। কারণ, এ স্থলে কাজটীর যুগ-যুগ-ব্যাপী সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্নতা লাভের সম্ভাবনা বাড়্‌বে। বাপ-মা ধ্যানজপ ক'রে কত শান্তি পাচ্ছেন কিন্তু ছেলে-মেয়েদের তা' শেখাবেন না। বল্‌বেন, ওরা বড় হ'লে স্বাধীন ইচ্ছায় যদি এ করে ত' কর্ব্বে। এমন কুযুক্তি আর কিছু হ'তে পারে না, জীবনের সব চেয়ে বড় কাজটা থেকেই বাপ-মায়ের সহযোগ যাবে স'রে, এটা ত' রীতিমত এক দুর্ভাগ্য!

নিজেকে দীন ভাবিও না

একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— নিজেকে কখনো দীন বা দুর্ব্বল ভেবো না। সর্ব্বদা মনে রেখো, তুমি পরম শক্তিধরের সন্তান, তোমার মধ্যে ভয়, আত্মাবজ্ঞা, নিজ ভবিষ্যতে অবিশ্বাস অশোভনীয়। যখনি

নিজের যেই সদগুণের অভাব দেখ্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আয়ত্ত করার জন্য অনুশীলনে লেগে যাবে। কার্য্যতঃ অভ্যাসে হাত দেবার আগে বারংবার সুকঠোর সঙ্কল্প ক'রে নেবে যে, যে কাজে হাত দিলে, তা' সম্পূর্ণ না ক'রে ফিরবে না।

ঈশ্বর-বিশ্বাস

যুবকটী বলিলেন,—কিন্তু উৎসাহই যে থাকে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উৎসাহকে সদাজাগ্রত রাখ্‌বার জন্য প্রথমে প্রয়োজন অফুরন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস, তারপরে প্রয়োজন অদম্য স্বদেশ-প্রেম। লক্ষ্য যদি তোমার মহৎ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ঈশ্বর-বিশ্বাস তোমার কার্য্যের বাধক না হ'য়ে সহায়ক হবে। লক্ষ্য যার পাপাত্মক ও কলুষিত, ঈশ্বর-বিশ্বাস তাকে পদে পদে বাধা দেয় ব'লেই এমন লোকেরা নাস্তিক হওয়াটা সুবিধাজনক মনে করে। ঈশ্বর যদি একজন থাকেন, তবে নারীধর্ষক, নরহন্তা তার কুকার্য্যে অগ্রসর হবে কি ক'রে? এই জন্যই নিষ্ঠুর-কর্ম্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রথমেই চেষ্টায় নামে নিজ নিজ শাগরিদদের মন থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাসটাকে লুপ্ত ক'রে দেবার জন্য। সৎকর্ম্মীর পক্ষে ঈশ্বর-বিশ্বাস এক মহাবল, এক মহাসহায়। ঈশ্বর-বিশ্বাস তার তৃষ্ণার শীতল পানীয়, ঈশ্বর-বিশ্বাস তার অন্ধকারের আলো, ঈশ্বর-বিশ্বাস তার অভাবের দিনের সম্পদ, ঈশ্বর-বিশ্বাস তার নিঃসঙ্গ

একাকিত্বেও পরম সাথী। ঈশ্বর-বিশ্বাস যাদের নেই, তাদের সঙ্গ থেকে শতহস্ত দূরে অবস্থান ক'রো।

ঈশ্বরের নামে ভণ্ডামি ও নাস্তিক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আবার, এমন ঈশ্বর-বিশ্বাসীরও সঙ্গ ক'রো না, যে ঈশ্বরের নামের দোহাই দিয়ে জাল-জুচ্চোরি ঢেকে রাখে, ঈশ্বরের নামের আড়ালে পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ঈশ্বরকে সাক্ষি-গোপাল রেখে নানা কূটকৌশলে কেবল আত্মসুখ, আত্মতৃপ্তি ও ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের অশ্বমেধ-যজ্ঞ চালায়। নাস্তিক্য প্রশংসনীয়ও নয়, লাভজনকও নয় কিন্তু ঈশ্বরের নাম ক'রে ভণ্ডামি করার চেয়ে সরল নাস্তিক্য অনেক বেশী আদরণীয় বস্তু।

দুঃখকে নির্ভয়ে বরণ কর

অপর একজন যুবকের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার রুগ্ন শরীরে কর্ম্মক্ষমতা কমে গেছে। তারই জন্য তোমার পরিজনেরা তোমাকে অবহেলা করেন। এই ত' তোমার দুঃখ? বাবাহে, দুনিয়াটা স্বার্থের বশে রয়েছে। যতক্ষণ যার যতটুকু স্বার্থপূরণ কত্তে পাচ্ছ, ততক্ষণ তার তুমি ততটুকু প্রিয় বা আদরের বস্তু হবে। অতীতে সংসারকে খুব সেবা দিয়েছ, আদরও অনেক সময়ে পেয়েছ। এখন যদি অনাদর আসেই, হাসিমুখে তা' সহ্য ক'রে যাও।

মনে ব্যথা রেখে সহ্য কত্তে গেলে তাতে মন রুগ্ন হবে, দুর্ব্বল হবে। মনের ব্যথা ভগবানের চরণে ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে দাও, আর তিনি যে অবস্থা দিয়েছেন, তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ কর। দুঃখকে নির্ভয়ে বরণ কর, তাহ'লেই দুঃখ পালাবে। দুঃখ চাই না, দুঃখ চাই না ব'লে চীৎকার কল্লেই দুঃখ পালাবে না। আসুক দুঃখ, আসুক দৈন্য, আসুক ঝঞ্ঝা বায়ু, তথাপি আমি ছাড়ব না আমার পণ, আমার ব্রত, আমার লক্ষ্য,—এই জেদের কাছেই চিরকাল হয় দুঃখের পরাজয়।

কর্ম্ম ও ঈশ্বর-সাধনা

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মহীন মানুষ বৃথা কিন্তু ঈশ্বরসাধনহীন কর্ম্মী আরও বৃথা। কাজকর্ম্ম কিছুই কর্ব্ব না কিন্তু অভিলষিত পথে অভ্যুদয় লাভ কর্ব্ব,—এ হচ্ছে অলসের কল্পনা বা অকর্ম্মণ্যের খোশখেয়াল। প্রত্যেককেই কর্ম্মী হতে হবে,—স্বার্থের জন্যই হোক্ আর পরার্থের জন্যই হোক্। কাজ কর্ব্ব না, কেবল কথা বল্‌ব,—এটী আমাদের এক বিপজ্জনক ব্যসন। এতে আমরা আমোদ পাই, কিন্তু এতে কোনো লাভ হবে না। সাহিত্যের আসরে যশ কুড়ানো আর সংসার-রণাঙ্গনে জয়ার্জ্জন করা এক কথা নয়। কর্ম্ম তোমাকে কত্তেই হবে, না ক'রে কোনো উপায় নেই। কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চালাতে হবে ঈশ্বরানুধ্যান। কারণ, এর ফলে তোমার কর্ম্ম

ক্রমে ক্রমে ভ্রমবর্জ্জিত, ত্রুটিহীন ও নিখুঁত হ'তে থাক্‌বে। একই সময়ে কর্ম্ম এবং ঈশ্বরানুধ্যান করা যায় কিনা, সেটা নির্ভর করে কর্ম্মী বা সাধকের নিজস্ব মেজাজ, যোগ্যতা ও রুচির উপরে। অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি-সাপেক্ষ কর্ম্ম করার সঙ্গে সঙ্গে মনকে ঈশ্বরানুধ্যানে নিরত রাখা কঠিন ব্যাপার কিন্তু একই মনকে তুমি কর্ম্মের সময়ে কর্ম্মীয় বিষয়ে এবং অন্য সব সময়ে ঈশ্বরীয় সাধনে নিযুক্ত রেখে দিতে পার। সকাল বেলা তুমি যে ঈশ্বর-সাধনটুকু করেছ, তার ফলটুকু ধ্যানত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায় না, তার সুফল ও স্নিগ্ধ প্রশান্তি তোমার উপরে সারাদিন সারারাত্রি ধ'রে বিদ্যমান থাক্‌তে পারে। সাধক-বিশেষের ধ্যান-জপের সুফল সমস্ত-জীবন ব্যাপীও হ'তে পারে। মনিবের হিসাবের খাতা লিখবার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানজপ তোমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু ধ্যানজপ যদি তোমার সাধারণ অনুশীলনের মধ্যে থাকে, তাহ'লে তোমার হিসাবের খাতা লিখবার সময়ে ঐ ধ্যানজপ গৌণ-ভাবে তোমার অশেষ সহায়তা কর্ব্বে। লোকে জানে না, অথচ একথা ধ্রুব সত্য যে, ধ্যানজপের একটা অসাধারণ সূক্ষ্ম শক্তি আছে, যার ফলে দেহের রোগ, আকস্মিক বিপদ-আপদ, মনের দুর্ব্বলতা এবং অপ্রত্যাশিত সঙ্কট আপনা-আপনি কতক পরিমাণে নিবারিত ও প্রতিষেধিত হয়। ধ্যানজপ গভীর হ'লে শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপে আনে প্রশান্তি ও প্রতিরোধিকা শক্তি, শরীরের প্রতি বিন্দু রক্তে দেয় নবজীবন,

প্রতিটি ধমনীতে দেয় স্নিগ্ধ এক উৎফুল্লতা, প্রতিটি মাংসপেশীতে দেয় সহিষ্ণুতা, প্রতিকার ও সামর্থ্য। এগুলি প্রকৃত যোগীদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য। দেখো, একদিন বিজ্ঞানও এ কথার সমর্থন ক'রে ধন্য হবে।

প্রার্থনা ও নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খেতে, শুতে উঠ্‌তে, বসতে, চল্‌তে, ফির্‌তে, কাজকর্ম্ম কত্তে আর শয়ন কত্তে গিয়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্ব্বে,—"হে ভগবান্‌, আমার দেহকে কর নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, আমার মনকে কর অক্ষোভ, সদানন্দ ও সহিষ্ণু, আমার প্রাণকে কর ব্রহ্মানন্দে উচ্ছল, বিশ্ববাসী সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রেমার্দ্র, আমার আত্মাকে কর আমার জ্ঞানদৃষ্টির গোচরীভূত, স্বচ্ছ এবং সুন্দর।" এই যে সরল সুন্দর প্রার্থনা, তারই একত্র গ্রথিত সারভূত মূর্ত্তি ব'লে জানবে তোমার দীক্ষাপ্রাপ্ত অখণ্ড-নামকে। এ কথাটি অতীতের মহাপুরুষেরা যদি কেউ ব'লে না থাকেন, তাই ব'লেই কথাটাকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিও না। এই কথাটা আমি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সত্য ব'লে জেনেছি। এই প্রার্থনাকে আর ওঙ্কার-জপকে সমার্থবাচী ব'লে জ্ঞান করবে। এই প্রার্থনা তোমাকে বিশ্বের সর্ব্বসত্যের স্বীকৃতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, আর ওঙ্কার হচ্ছে সর্ব্বসত্যের স্বীকৃতিমন্ত্র। দুটীর মধ্যে বিরোধ নেই, বরং আছে

পূর্ণ সামঞ্জস্য। প্রার্থনাটী তোমাকে নামে নিষ্ঠাবান্‌ কর্ব্বে, নামের সেবা তোমাকে এই প্রার্থনাতেই রুচিশীল কর্ব্বে। একটীর সেবা অন্যটীর অনুপূরক মাত্র। এই ক্ষেত্রে প্রার্থনায় আর নামজপে কোনো বিরুদ্ধ সম্পর্ক নেই, জানবে। যখন মনকে ওঙ্কার-জপে বসাতে হবে অসুবিধা বা ক্লেশ, তখন প্রার্থনা চালিয়ে যাও। যখন প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ, তখন চালিয়ে যাও নামজপ। কিন্তু নামজপের জন্য দিনে রাত্রিতে যেগুলি তোমার সুনির্দ্দিষ্ট সময়, তখন নামজপেই অভিনিবেশ দিবে, প্রার্থনার অনুকল্পকে টেনে আনবে না।

জপ ও ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জপ আর ধ্যান একই বস্তুর দুইটা দিক্‌। পরমেশ্বরের নাম অবিরাম স্মরণ ক'রে যাওয়ার নাম জপ, এই নামটী যে পরমেশ্বরেরই বটে, সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর ছাড়া আর কারো নয়, এই কথা ভেবে ভেবে মন্ত্রার্থে বিচরণের নাম ধ্যান। জপের সময়ে সূক্ষ্মভাবে স্বল্প পরিমাণে ধ্যান আপনিই হয়। সুতরাং জপও পরমেশ্বরের ধ্যানের একটা বিশিষ্ট উপায় বটে। কিন্তু যিনি একাধারে সগুণ এবং গুণাতীত, যিনি একাধারে সাকার এবং নিরাকার, যিনি একাধারে সসীম এবং অসীম, তাঁকে ধ্যান করা একটী মাত্র শব্দের দ্বারা হ'তে পারে না—বাদে ওঙ্কার—, সেজন্য

জপ থেকে ধ্যানকে আলাদা ক'রে উপদেশ এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, ভাবো কেবল সেই অনির্ব্বচনীয় পরম প্রভুর কথা নানা বৈচিত্র্যময় অভিধাসংযোগে এবং সহস্র তরঙ্গ-মুখরিত সেই নদীস্রোতের মাঝে নিজেকে বিলীন ক'রে দাও। মন সে সময়ে সঞ্চরণশীল। একটী পরম তত্ত্বেরই সহস্র দিকে তার লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য। সেই তত্ত্বের সম্ভাব্যতা, তার অসম্ভাব্যতা, সবই তার অনুধ্যেয় বিষয়। তাকে অতীতে, বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে সর্ব্ব-প্রকারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখে, ভেবে, জেনে তার সম্পর্কে একেবারে মজে যাওয়ার চেষ্টাই হচ্ছে মনের একমাত্র আকূতি, কাকুতি, মিনতি। এই অবস্থাটীর নামই ধ্যান। তখন ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু জপ চলতে পারে, জপের সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ধ্যান চলতে থাকে। এইটুকুই মাত্র পার্থক্য। নতুবা জপও যা', ধ্যানও তা'। জপ খণ্ডিত ধ্যান, ধ্যান নিরবচ্ছিন্ন জপ।

রংপুর

১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪২

(২৬শে জুলাই, ১৯৩৫)

সৎ-কর্ম্ম

জনৈক জনহিতব্রতী কর্ম্মী যুবকের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অমুকে লক্ষপতি, তমুকে কোটিপতি, অমুকের আছে প্রভাব জনসাধারণের উপরে খুব, তমুকের মুখের কথায় হাজার লোক ওঠে আর বসে,—এই সব তথ্যের উপরে নির্ভর ক'রে কারো তোয়াজ কর্ত্তে যেও না। সমাজের সবচেয়ে নির্ধন মানুষটিকে, সব চেয়ে সাধারণ লোকটীকে, তুমি কি ক'রে তোমার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট কর্ত্তে পার, তার দিকে তুমি লক্ষ্য দাও। জগতের কয়জন ধনবানের ধন তাদের চরিত্রবল-শুদ্ধ সৎপথাশ্রিত সঙ্গত পন্থায় অর্জ্জিত? তা' আমরা কেউ জানি না। কয়জন প্রভাবশালী লোকের প্রভাবের মূল উৎস ত্যাগ বা তপস্যা? তাও আমরা কেউ জানি না। তোমরা ত্যাগীর দিকে, তপস্বীর দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে তাকাও এবং যাতে মানুষ ত্যাগের ও তপস্যার আদর্শে বিশ্বাসী হ'য়ে নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তিকে চূড়ান্ত সার্থকতায় মণ্ডিত কর্ত্তে আগ্রহী হয়, তেমন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ কর। যে কর্ম্মের লক্ষ্য সৎ, উপায়ও সৎ, সেই কর্ম্মই সৎকর্ম্ম।

সৎ-কর্ম্মে অসৎ পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনো কোনো সময়ে পরিস্থিতির চাপে সৎকর্ম্মকারীকেও অসৎ পন্থার আশ্রয় নিতে হয়। এটা কর্ম্মীর পক্ষে গৌরবজনক নয়। কারণ, একটী অসদুপায় অবলম্বনের দ্বারা আরও অধিকতর অসৎ হবার মানসিক দুর্ব্বলতা বা লোলুপতার সৃষ্টি হয়। এটী নিদারুণ ক্ষতিকর। আর, এর ফলে কর্ম্মের কৌলীন্য হ্রাস পায়। মিশ্রিত সোণা আর খাঁটি সোণার নিশ্চয়ই তফাৎ আছে।

আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা থাকা উচিত যাতে আমাদের কোনও সৎ-কর্ম্মে অসদুপায়ের ভেজাল না প্রবেশ করে। সঙ্গীদের তালে প'ড়ে অনেক মহৎ লোক এই-জাতীয় ভুল ক'রে থাকেন। অসংখ্য মানুষের হাত-তালি অনেক সময়ে অনেক প্রভাবশালী নেতাকে এই পথে টেনে নিয়ে যায়। কপট বন্ধুদের কুপরামর্শে প্রায়শই শক্তিশালী ব্যক্তিরাও এই দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন। এজন্যই প্রয়োজন সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করার,—এমন লোকের সঙ্গ, যাঁরা প্রাণান্তেও তোমাকে কুপরামর্শ দেবেন না।

সৎসঙ্গ ও সৎ সমাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁরা প্রাণান্তেও কাউকে কুপরামর্শ দেন না, এমন বন্ধু জগতে সত্যই দুর্লভ। এই জন্যই, নিজের জীবন-কাটি আর মরণ-কাটি কখনো পরের হাতে তুলে দিতে নেই। প্রত্যেক মানুষের সদ্‌গুণগুলি লক্ষ্য কর কিন্তু নিজের বিবেককে নিজের হাতের মুঠায় রাখতে চেষ্টা কর। সকলের সঙ্গে সৌহৃদ্য-পূর্ণ আত্মীয়তার সৃষ্টি কর কিন্তু যে কর্ম্মের মধ্যে তোমার সততা, সরলতা, সদুদ্দেশ্য-পরায়ণতার প্রমাণ রাখবার প্রয়োজন আছে, সেখানে অন্যের পরামর্শে পরিচালিত হ'য়ে সহজে কার্য্যসিদ্ধির কুপথ আশ্রয় ক'রো না। এক মানুষ অপর মানুষকে সৎপথে পরিচালিত হ'তে সহায়তা করে, এই জন্যেই ত' মানুষের মধ্যে সমাজ

নামক একটা বস্তুর প্রয়োজন। বহু মানুষ যেখানে সৎ, সেখানেই সৎ-সমাজ গ'ড়ে ওঠে। চেষ্টা কর নিজে সৎ থাকতে, চেষ্টা কর অন্য দশ জনকে সৎ হবার প্রয়াসে উৎসাহ দিতে, সহায়তা করে, নৈতিক বল যোগাতে, পরিবেশ-পরিবর্ত্তন ক'রে তার সাফল্য-সম্ভাবনা বর্দ্ধন করে।

কাজ ছোট ফেলেই ধর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজ ছোট ফেলেই সুরু কর। ছোট কাজটাই আস্তে আস্তে বড় হবে। আমার মতন ভুল তোমরা কেউ করো না। এক শ' বিঘা অরণ্য-ভূমি দেখিয়ে একজন বল্লেন করুন এখানে আশ্রম। অনেক আপত্তির পর বাধ্য হ'য়েই রাজি হ'য়ে গেলুম। অবশ্য চারিদিকের পরিস্থিতিই এমন হ'ল যে, রাজি না হ'য়ে পার্লুম না। আমি যত বলি না, না, হবে না, গ্রামবাসীরা, বন-ভূমির মালিকেরা হাতে পায়ে ধ'রে কান্নাকাটি ক'রে, জোর ক'রে প্রতিশ্রুতিটী আদায় করে নিলেন,—আশ্রম হবে। নিজের সত্যে নিজে বাঁধা প'ড়ে গেলুম। এখন এই একশ বিঘা জমি মাথার উপরে একটা বিরাট বোঝা-স্বরূপ হ'য়ে চেপে বসেছে। কি ক'রে এর জঙ্গল শেষ করি, কি ক'রেই বা বড় বড় শালের মুড়া সেই পাথুরে কাঁকুরে মাটির ভিতর থেকে তুলে এদের একেবারে নিঃশেষ করি, কি ক'রে জমি করি, বাড়ী করি। আবাল্য স্বপ্নে দেখে এসেছি বড় বড় কল্পনার ছবি, তাই

শেষ পর্য্যন্ত ভূমির আয়তনটা আমার সদ্‌বিবেচনাকে অভিভূত ক'রে দিল। এটা আমার ত্রুটি, এটা আমার দুর্ব্বলতা। পরিকল্পনার বিশালত্বের দরুণ এখন আমাকে ত্রিশ চল্লিশ বছর কাল গাধার মত নীরবে মুখ বুজে কেবল খেটেই যেতে হবে, তবে যদি কোন দিন মৌন কল্পনার ছবি বাঙ্‌মুখর হ'য়ে ওঠে। ততদিন যদি না বাঁচি? তখন কি হবে? সব কল্পনা একেবারে ভেস্তে যাবে না? এই জন্যই আমি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বল্‌ছি, বড় বড় কল্পনায় না যেতে। কাজ ছোট ফেলেই ধর।

স্বরূপানন্দ-চরিত্রে প্রকৃতির বৈপরীত্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে কদিন ধ'রে শহরময় কেবল বিজ্ঞাপন ছড়ান হচ্ছে,—"স্বরূপানন্দ বক্তৃতা দেবেন, স্বরূপানন্দ বক্তৃতা দেবেন," তারও রহস্যটা ঐ এক ভুল। অন্ততঃ দু হাজার শ্রোতা না হ'লে বক্তৃতা দিয়ে সুখ নেই। আরও একটা কথা আছে, দীর্ঘকালের প্লুরুসিতে আমার ফুস্‌ফুস্‌টাকে একেবারে জীর্ণ ক'রে দিয়েছে। এত দিনে যে মরে যেতে পারি নি, এটা একটা পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। তাই হিসাবে বসে অঙ্ক কষি যে, কথা কইতে কইতে এই ফুস্‌ফুস্‌টাকে হঠাৎ একদিন যখন ফাটিয়েই ফেল্‌তে হবে এবং তারপরে আমাকে আমার পরলোকের সঙ্গীদের সাথে বিচরণ কত্তে হবে, তখন স্বল্পতম খরচের হারে অধিকতম

কাজটুকু ত' করেই যেতে হয়। সুতরাং যেখানে বড় জোর দুই শত লোক হ'লে বক্তৃতা চলতে পারে, সেখানে দুই হাজার লোককে কেন টেনে আনা হবে না? দু শ লোকের কাছে কথা বল্‌তে আমার যে পরিশ্রম, দু হাজার লোকের কাছে কথা বল্‌তেও ত' আমার সেই একই পরিমাণ পরিশ্রম। কিন্তু আসলে আমি মানুষটা কে? যেই লোকটা আকৈশোর একটী একটী ক'রে মানুষকে ধ'রে তার কাণের কাছে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট উচ্চারণে কিন্তু অস্ফুট স্বরে বারংবার বলেছে, "ব্রহ্মচারী হও, জিতেন্দ্রিয় হও, পুরুষকার-পরায়ণ হও, লালসার বন্ধন, দাসত্বের নিগড় ভেঙ্গে ফেলার যোগ্যতা অর্জ্জন কর,"—আসলে ত' আমি সেই মানুষটা। যে লোকটী মানুষের কাছে লক্ষ লক্ষ পত্র লিখেছে কিন্তু হাজার-করা নয় শত নিরানব্বইখানা পত্রের নীচে নিজের নাম-স্বাক্ষরটী পর্য্যন্ত করে নাই, নিজের ঠিকানাটী পর্য্যন্ত দেয় নাই, যে মানুষটী বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে আত্ম-পরিচয় একেবারেই গোপন রেখে কেবল পত্রের পর পত্র লিখেছে,—"ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও, মানুষের সেবা কর এবং করাও, স্বদেশকে ভালবাস এবং বাসাও, বিশ্বকে আপন কর এবং করাও",—আমি আসলে ত' সেই মানুষটী। নিজের ভিতরে প্রকৃতির বৈপরীত্য দেখে অনেক সময়ে নিজেই অবাক্ হ'য়ে ভাবি, এসব কচ্ছি কি?

বিস্ময়কর আবিষ্কার

এমন সময়ে উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বলিলেন,—স্বামীজী, আমি আপনাকে একটু interrupt কর্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বলুন।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার নাম আদিনাথ চট্টরাজ। এখানে একটা ছোট-মোট সরকারী চাকুরী করি। আমি আমার পাঠ্যকালে নিরন্তর একজনের চিঠি পেতাম। ভাবতাম, কে এমন চিঠি লেখে? কেন লেখে? আজ এখানে আসাতে আমার সন্দেহের নিরসন হ'ল। আমি দুইটী আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে এক সঙ্গে দেখ্‌লাম। প্রথমতঃ আপনি অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছেন, আবার একটুখানি না থেমে চিঠিও লিখে যাচ্ছেন। কৌতূহলী হলাম, চেয়ারটী টেনে নিয়ে একটু এগিয়ে এসে বসতেই দেখলাম, এ' ত' ঠিক তাঁরই হস্তাক্ষর, যিনি আমাকে কমপক্ষে ডজন খানিক চিঠি লিখেছেন কিন্তু আত্ম-পরিচয় দেন নি। বিস্ময়কর আবিষ্কার!

আজ একাদশী। শ্রীশ্রীবাবামণি আজ খুবই ক্লান্ত বোধ করিতেছেন। বেলা নয়টায় ডিষ্ট্রিক্ট্ এন্‌জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণিকে তাঁর বাংলোতে নিয়া যাইবার জন্য গাড়ী সহ আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ নড়্‌বার চড়্‌বার একটুও ইচ্ছা নেই। কিন্তু কি বিপদ, আজই বিকাল তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কারমাইকেল কলেজে ভাষণ দিতে হবে।

ললিত বাবু বলিলেন,—প্রোগ্রাম বাতিল করুন। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সবই করা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যায় না। কর্ত্তব্যের দায় ঘাড়ে নিয়ে তারপরে আর সেই দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য পথ নেই। কলেজে যাব, তবে বেশীক্ষণ বল্‌ব না।

ললিত বাবু বলিলেন,—না, আপনার বিশ্রাম নেওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু আমি যে একটী আবেদন নিয়ে এসেছি। আমার বাংলোতে আপনাকে একটু যেতে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই না আপনি বলছিলেন, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন? আর আপনিই এখন আমাকে নিয়ে টানাটানি কচ্ছেন।

ললিত বাবু বলিলেন,—এটা গৃহস্থদের দুর্ব্বলতা। পাপে তাপে আচ্ছন্ন আমাদের শরীর ও মন, আমাদের গৃহে সাধুসন্তের পদধূলি পড়লে আমরা নিজেদিগকে ধন্য, পুণ্য ও কৃতকৃতার্থ ব'লে মনে করি।

আমি সাধারণ মানুষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত', চলুন। তবে, আমি সাধুও নই, সন্তও নই। আমি আপনাদের দশ জনের মতন একটী সাধারণ মানুষ। একজন সাধারণ মানুষকে পেলেই যদি আপনার চলে, তবে চলুন, আপত্তি নাই। নিজেকে অসাধারণ ব'লে ভাব্‌তে গেলেই আমার যেন কেমন অস্বস্তি

বোধ হতে থাকে। মনে হয়, একটা দরজা-জানালা-হীন রেলের ওয়াগনের মধ্যে বুঝি আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবাধে ও স্বচ্ছন্দে মিল্‌তে মিশ্‌তে যেখানে বাধা, আমার সেখানে বিষম ভয়। আমি সাধারণই থাক্‌তে চাই।

সাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—বহু সাধারণ মানুষ যখন একটী সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র ক'রে কোনো মহৎ ব্রত পালনের অঙ্গীকার গ্রহণ করে এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সকলে যখন সাধ্যমত চেষ্টা সুরু ক'রে দেয়, তখন একটী সাধারণ মানুষও একটা অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হয়। মাত্র তখনই বুঝা যায় যে, সাধারণ ব্যক্তিটি নিতান্ত সাধারণ নন, বহু সাধারণের সমর্থনে তিনি অসাধারণ। এই অসাধারণ মানুষেরা জগতের কিছু কিছু প্রশংসনীয় হিতসাধন ক'রে জগতের নমস্য হন। আমি তেমন অসাধারণ কখনো হব ব'লে মনে মনে কোনো কামনা রাখি না। এই কারণেও আমাকে কেউ অসাধারণ ব'লে ভাবা সুরু কর্ল্লে আমার অস্বস্তি আসে।

মানুষ-পূজা, আড়ম্বর ও চিত্তশুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুপূজা, নেতাপূজা,

মানুষপূজা, বীরের পূজা, মহাপুরুষের পূজা অল্পাধিক সব দেশেই সব যুগেই কোনো না কোনো প্রকারভেদে বিদ্যমান রয়েছে। এ নিয়ে মানুষকে প্রশংসা বা নিন্দা করার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যাপারটাই কখনো অতিরিক্ত যুক্তিনিষ্ঠতার উৎপীড়নে, কখনো বা একগুঁয়ে গোঁড়ামির দাপটে এমন মূর্ত্তি ধারণ করে যে, এসব পূজা অর্থহীন এক ভূতুড়ে কাণ্ডে পরিণত হয়। আমার কথা হচ্ছে এই যে, কাউকে পূজা করি আর নাই করি, তার সম্পর্কে আমার যা' আচরণ, তার দ্বারা আমার চিত্তশুদ্ধি ঘটছে কিনা, এইটাই সর্ব্বপ্রথমে আমার দেখা প্রয়োজন। তারপরেই দেখা প্রয়োজন যে, এই আচরণের দ্বারা আমার স্বদেশবাসী এবং বিদেশবাসী লোকেরাও লাভবান্ হচ্ছে কিনা। যাতে আমার লাভ চিত্তশুদ্ধি, সবার লাভ নানাবিধ, তা' যুক্তিশাস্ত্রের প্রত্যেকটা দাবীকে মান্‌তে পার্‌ল না ব'লেই যে নিন্দনীয় হবে, এমন বলা চলে না। কিন্তু তবু আমার কথা এই যে, আমি আপনার ঘরে যাব আর দুনিয়ার যত কাসর-ঘণ্টা যোগাড় ক'রে তা' পিটতে সুরু কর্ব্বেন, হাজার শঙ্খ একত্র ক'রে এনে ধ্বনি দিতে থাক্‌বেন এসব করা চলবে না। যাব, কিছুক্ষণ বস্‌ব, দুটী ছোটখাট ভাল কথা বলব এবং নীরবে তথা সানন্দে স্বস্থানে ফিরে আস্‌ব। এইটী আমি চাই।

ললিত বাবু সম্মত হইলেন।

শোভনা

কিন্তু কার্য্যকালে ইহার বিপরীত দেখা গেল। সেনগুপ্ত-গৃহিণী ঠিক সেই ব্যবস্থাগুলিই করিয়া রাখিয়াছেন, যেগুলি সম্পর্কে শ্রীশ্রীবাবামণি আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সেনগুপ্ত-গৃহিণী পঞ্চপ্রদীপ হাতে লইয়া প্রতীক্ষমাণা ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—আমরা বাবা বরিশাল জেলার লোক। নিজ জেলার প্রথানুসারে যা' যা' করা বিধি, সব আমরা কর্ব্ব, কোনো নিষেধ মান্‌ব না।

কুমারী কন্যা শোভনা নিজের হাতে গাঁথা একটী সুন্দর পুষ্পমাল্য নিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি শোভনা, সত্যই শোভনা। চোখে তোমাদের মাতার ভক্তি, মুখে তোমাদের পিতার শ্রদ্ধা, সর্ব্বাঙ্গে তোমাদের সুস্থির পবিত্রতা তোমাদিগকে প্রকৃতই শোভনা করেছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি আচরণ তোমাদের চিত্তশুদ্ধির উপচায়ক হউক।

অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভব

ললিত বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যতীন বাবু ময়মনসিংহ হইতে আসিয়াছেন। সাধু-দর্শনে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া পদধূলি নিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবামণি, অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য পালন কি কখনো সম্ভব? কি রকমে সম্ভব? গৃহস্থের পক্ষে কি অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন? অখণ্ড-

ব্রহ্মচর্য্য না এলে কি ঈশ্বর-লাভ অসম্ভব? ব্রহ্মচর্য্য পালনের নাম ক'রে ইন্দ্রিয়-পরিচালন কি বিধেয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রশ্ন ত' অনেকগুলি হ'য়ে গেল। বেশ! একটা একটা ক'রে জবাব দিচ্ছি। খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য যখন পালন সম্ভব, তখন অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যও পালন নিশ্চয়ই সম্ভব। খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য পালনেই যখন আনন্দ ও বলোন্মেষ, অখণ্ড অটুট আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য পালনে তখন নিশ্চয়ই আনন্দ অপার, বললাভ অশেষ। তবে খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্য মানুষের পুরুষকার-সাধ্য, অখণ্ড অটুট অক্ষত অকলঙ্ক অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণরূপেই ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ। ভগবানের কৃপার জন্য সারা দেহমন উন্মুখ হ'য়ে গেলে ভগবান্ নিজের করুণায় ভক্তের পুরুষকারের অসাধ্য সিদ্ধিও তাঁকে দয়া ক'রে দিয়ে দেন। মানুষ ক্ষুদ্র একটী জীব, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের উপরে যার কোনো কর্ত্তৃত্ব নেই। তাই সে অনেক সময়ে সৎসঙ্কল্পে সমারূঢ় হ'য়েও তাতে লগ্ন হ'য়ে থাক্‌তে পারে না, মাঝে মাঝে স্খলিতব্রত হ'য়ে যায়। পরন্তু পরমেশ্বর অপার করুণা ও অমিত শক্তির আধার। তিনি নিজ করুণার বলে আত্মসমর্পণকারী সাধককে অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার অধিকারী করেন। ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্পে সমারূঢ় হওয়ার জন্য পুরুষকারের অর্থাৎ তপস্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পরে তপস্যা পরিণত

হয় আত্মসমর্পণে, অহমিকা বিসর্জ্জনে, নিজেকে ঈশ্বর-হস্ত-ধৃত যন্ত্র-রূপে অনুভবে। তখন আপনা আপনি কৃপার অবতরণ ঘটে। তখন সাধক উত্তেজনার কারণ ঘটলেও উদ্বেল হয় না, বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনায়াসে উত্তরণ ক'রে নিজ লক্ষ্যপথে চলে যায়। তখন তার মন নিস্তরঙ্গ এক মহাসমুদ্রের মত, যার বুকের উপরে নভোময় কোটি কোটি জ্যোতিষ্কের পূর্ণ প্রতিবিম্বটী নিখুঁত ভাবে পড়ে, সে কৃপার মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে পায় আর জ্ঞানের মধ্য দিয়ে জন্মমরণের দুঃখনিবহ পার হ'য়ে যায়। সে স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

বিবাহিতের যৌন আচরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি গৃহস্থ, কি উদাসীন, সকলের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বোত্তম তপস্যা এবং সকলের পক্ষেই এই সাধনা ক'রে যাওয়া সম্ভব। এই তপস্যার প্রয়োজন এই জন্য যে, এতে ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, বল ও পৌরুষ অর্জ্জিত হয় আর হয় সর্ব্বজীবে সমদর্শনের যোগ্যতা। একটুখানি ব্রহ্মচর্য্যেরও একটুখানি শুভফল আছে, অনেকখানি ব্রহ্মচর্য্যের ও শুভফল অনেক। খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্যের শুভফল খণ্ডিত। অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যের শুভফল অখণ্ড ও অপরিমেয়। কিন্তু জীবহিতার্থে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাও সস্ত্রীক জৈব আচরণে প্রবৃত্ত হতেন, একথার দৃষ্টান্ত সর্ব্বশাস্ত্রে পাবে। সুনির্দ্দিষ্ট সংসঙ্কল্প নিয়ে যাঁরা পারিবারিক জীবনে জৈব ব্যবহার করেন,

তাঁদের এই আচরণের জন্য তাঁদের ঈশ্বর-প্রাপ্তির বিঘ্ন হয় না, যদি জৈব আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। সংসারী জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের যে সম্মান আছে, বংশের সামগ্রিক কুশলের দিকে তাকিয়ে তাদের যে যৌন আচরণ তারও সম্মান আছে। প্রকৃত হিসাবী সংসারীর সাময়িক অব্রহ্মচর্য্যে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কুশল পরাহত হয় না। কিন্তু এই কথাটার উপরে বেশী জোর দিতে গেলে গৃহস্থ আস্তে আস্তে সংযম-ভ্রষ্ট, নীতি-দুর্ব্বল ও পরাজিত সৈনিকে পরিণত হ'য়ে যায়। এজন্য, তার আগাগোড়াই লক্ষ্য থাকা উচিত, যাতে সে সমস্ত জীবনই সংযত থাকতে পারে। সমস্ত জীবন নিষ্কাম থাকার যার চেষ্টা, তার পক্ষে অধিকাংশ সময়ে নিষ্কাম থাকা সম্ভব। আর, কিছু কিছু সময় নিষ্কাম থাকা যার চেষ্টা, সে অন্য সময়ে বেহাল হ'য়ে যেতে পারে। এজন্য লক্ষ্য নির্ব্বাচনের সময়ে একটু উঁচুতে তাকালেই ভাল। যার লক্ষ্য যত উঁচুতে তার পক্ষে লক্ষ্যের অনুগত থাকা তত সহজ।

কামকে নিয়া ছেলেখেলা অনুচিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য পালনের নাম ক'রে, ইন্দ্রিয়-সংযমের দোহাই দিয়ে কোনো কোনো ধর্ম্ম-গোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার প্রথা দেখা যায়। জামার আগুন নিবিয়ে দেবার নাম ক'রে গায়ের চামড়ায় কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে

ব্যাপারটা যেমন হয়, এ ব্যাপারটাও তাই। ইন্দ্রিয়কে জয় কর্ব্বার জন্যই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার এক প্রকারের ভ্রান্ত যুক্তি। বরং কেউ যদি বলে যে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য জানবার জন্য সে ইন্দ্রিয়-ব্যবহার কচ্ছে, তবে তা' একটা যুক্তি হ'লে হ'তে পারে। লোভকে দমনের জন্য লোভরিপুর ব্যবহার, ক্রোধকে দমনের জন্য ক্রোধরিপুর ব্যবহার খুব সীমিত ক্ষেত্রেই সঙ্গত ব'লে বিবেচিত হবে। কামের চেয়ে খল, ছদ্মবেশী এবং বহুরূপী রিপু আর কিছু নেই। সুতরাং তাকে নিয়ে ছেলেখেলা কারোই করা উচিত নয়।

ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, জীবন এবং যৌবনকে একেবারে ভগবানের পায়ে সমর্পণ ক'রে দিয়ে আমাদের নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে তাঁর চরণাশ্রয়প্রয়াসী হ'তে হবে। তাহ'লেই তিনি কৃপা ক'রে আমাদিগকে তাঁর স্নেহের কোলে তুলে নেবেন এবং ষড়রিপুর আস্ফালন-চঞ্চল সংসার-ভূমির ঊর্দ্ধদেশে আমাদিগকে স্থাপন ক'রে একেবারেই নিরাপদ করে দেবেন। এই জন্যই ত' দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা বদ্ধ জীবকে ডেকে ডেকে বলেন,—এস ভাই-বোনেরা, ভগবানের অমৃতময় নামের রসে ডুবে জীবন সার্থক কর।

কৃষক, ছাত্র ও শিক্ষক

বেলা সাড়ে তিনটায় শ্রীশ্রীবাবামণি কারমাইকেল কলেজে পৌছিলেন। রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার গাড়ী-খানাতে করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে নিয়া গেলেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি, এন, মল্লিক এবং অধ্যাপকেরা শ্রীশ্রীবাবামণিকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। যথাকালে সভারম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কৃষকেরা জাতির মেরুদণ্ড, ছাত্রেরা জাতির বাহু, শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা জাতির মস্তিষ্ক। প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ত্তব্য আছে এবং সেই কর্ত্তব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে প্রতিপালিত হ'লে জাতির পরম কুশল। একদা আমরা দেশ ও জাতির মঙ্গলের কথা বিন্দুমাত্রও ভাবতাম না, আমাদের চিন্তা ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। আমাদের নিজ নিজ স্বার্থ এবং অভ্যুদয়কে কেন্দ্র ক'রেই ছিল আমাদের যাবতীয় চেষ্টা। কিন্তু মেরুদণ্ডকে, বাহুকে আর মস্তিষ্ককে একলক্ষ্য ক'রে দিয়ে নিখিল দেশ ও সমাজের সার্ব্বাঙ্গিক অভ্যুন্নতি সম্পাদনের জন্য একটা বিপুল আগ্রহ আজ সৃষ্টি করার দিন এসেছে। সেই দিনটাতে ছাত্রদের ভূমিকা সবচেয়ে প্রধান, সব চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ এবং সব চেয়ে মর্য্যাদাসম্পন্ন। কারণ, জ্ঞানার্জ্জনপথের তারা পথিক, তাদের অন্তরে আজ বল চাই, বুকে তাদের সাহস চাই, সৎকর্ম্মে তাদের নেশা চাই, পরহিতার্থে আত্মদানের তাদের রুচি চাই, আর চাই

নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, অনবদ্য, সুশোভন চরিত্র। চরিত্রের মূল ব্রহ্মচর্য্য আর ব্রহ্মচর্য্যের মূল প্রগাঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস।

একঘন্টা বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি আসন গ্রহণ করিলেন। ছাত্রবর্গের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মল্লিক শত কণ্ঠে বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন। অধ্যাপকেরা জনে জনে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন। কলেজ হইতে চলিয়া আসিবার পরেও ছাত্রেরা অনেকে রায় বাহাদুরের বাড়ী আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শন করিয়া গেলেন।

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—বল্লেন ত' সহজ সরল মাত্র কয়েকটা কথা। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কি যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, তা' লক্ষ্য করেছেন?

ডাঃ মল্লিক বলিলেন,—তপস্বীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য। এ ত' কখনো বৃথা হ'য়ে যেতে পারে না। প্রথম দেখা অবধিই আমি স্বামীজীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে গেছি।

রংপুর
১১ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪২
(২৭শে জুলাই, ১৯৩৫)

হিরণ্ময়ী দেবী

সমাজ-কল্যাণকর্ম্মে আত্মনিয়োজিত একটী উৎসাহী যুবক দূরবর্ত্তী একটী পল্লী হইতে শ্রীশ্রীবাবামণির নাম শুনিয়া

আসিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, পদদ্বয় ধূলিধূসরিত। শ্রীশ্রীবাবামণি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহাকে একটী আসনে বসাইলেন এবং অন্যান্য আগন্তুক ভদ্রলোকদের একরূপ উপেক্ষা করিয়াই তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবকের মুখ হইতে তাঁহার যাবতীয় বক্তব্য শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অত ছুটাছুটি ক'রে তোমার আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমি আজ বা কালই চলে যাচ্ছি না, আমি বেশ কতকদিন এই শহরে থাক্‌ব। মানে, যতক্ষণ শহরের লোকের কাণের পোকা বের ক'রে দিতে না পার্‌ছি, ততক্ষণ শহর ত্যাগ কর্‌ছি না। অর্থাৎ আমার বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে জ্বালাতন হ'তে হ'তে একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে যতক্ষণ না শহরের লোকেরা আমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া কচ্ছেন, ততক্ষণ আর যাচ্ছি না। একটা কাজ ধরলে তাকে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়ে ফেলতে পারার আগ পর্য্যন্ত আর আমার স্বস্তি নেই। কিন্তু তুমি এসেছ দারুণ ক্লান্ত হ'য়ে, তোমাকে এখন কথা না শুনিয়ে কিছু খেতে দেওয়া উচিত। যখন তোমার প্রয়োজন খাদ্যের, তখন তোমাকে উপদেশ দিতে বস্‌লে নিষ্ঠুরতা করা হবে।

কে যে কাহাকে খবর দিল, বুঝা গেল না। কিন্তু রাস্তার ওপারে শরৎ বাবুর গৃহাভ্যন্তর হইতে একটী লোক আসিয়া যুবকটীকে নিয়া গেল এবং শরৎ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী

১৪

হিরণ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় যুবকটীকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। যুবকটী ফিরিয়া আসিয়া সবিশেষ বর্ণনা করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, শরৎ বাবুর সংস্পর্শে এসে আমি যেন একটা নূতন দিগন্তের আলো দেখ্‌লাম। শরৎবাবু এখানকার একজন অতীব সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য লোক। এঁর এক একটা ভাই চাকুরী-বাকুরীর জগতে এক একটা দিক্‌পাল। একজন ত' জিনেভাতে লীগ্ অব্ নেশান্‌সের সেক্রেটারী। আর একজন লণ্ডনে হাই-কমিশনার ফর-ইণ্ডিয়া। কিন্তু তাঁর ঘরে এমন লক্ষ্মী মেয়েদের জন্ম হয়েছে, যাঁরা দূর থেকে ফুলবাগানের মধ্যে অবস্থিত আমার এই সাময়িক বাসস্থানটীর প্রতি সস্নেহ লক্ষ্য রেখেছেন নির্ভুল ভাবে। আমি চাচ্ছিলাম, তোমাকে কেউ খাওয়াক্। প্রয়োজন ছিল তোমার খাদ্যের। কি আশ্চর্য্য! তা' তুমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই পেয়ে গেলে।

সৎকর্ম্মের শুভফল আছেই

তৎপরে অন্যান্য প্রসঙ্গ উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি নির্দ্দল কর্ম্মী। আমার কোনো দল নেই। এই জন্যই কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সময়ে আমার উপরে কোনও দলীয় প্রভাব পড়ে না। আমি নিরপেক্ষ ভাবে সকলের সব দিকের ভালমন্দটা সহজে বিচার কত্তে পারি। দলের প্রতি যার মায়া, তার

সদসদ্‌বিবেক সকল সময়ে সজাগ, সতেজ, স্বচ্ছ থাকে না। তার চোখের দৃষ্টি অনেক সময়ে অকারণে ঘোলাটে হ'য়ে যায়। কাজ যদি কিছু কত্তে চাও, মানে, খাঁটি কাজ নির্ভুল ভাবে যদি সম্পাদন কত্তে চাও, তবে লক্ষ্যের দিকে দাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দলের প্রতি নয়। দলবুদ্ধি নানা রূপ দুর্ব্বলতার প্রসূতি হ'য়ে পাপকে করে লালন আর দ্বন্দ্বকে করে পালন, মিথ্যাকে দেয় প্রশ্রয় আর কপটতাকে দেয় ইন্ধন। স্পষ্ট ক'রে মনের কথা খুলে বলছি, তবু যারা তার মর্ম্ম বোঝে না, জান্‌তে হবে যে, এরূপ কোনো একটা জটিলতার প্যাঁচে সে পড়েছে, জিদ আর অভিমান তাকে অক্টোপাসের মত চার দিক থেকে চেপে ধরেছে। যতই চীৎকার ক'রে কথা বল না কেন, সে জেগেও ঘুমোবে। জেগে যারা ঘুমোয়, তারা যত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই হোক্ না কেন, তাদের উপরে নির্ভর করার মতন ভ্রান্তি আর কিছু নেই। কলহে না গিয়ে তাদের আওতা থেকে একটু দূরে সরে নিজের মনে কাজ ক'রে যাও। অন্তরের সাত্ত্বিক সদ্‌বুদ্ধি নিয়ে যতকিছু কাজ জীবনে যখনি যেখানে যতটুকু করেছ বা কর্ব্বে, জেনো, তাদের প্রত্যেকটীর শুভফল তোমাদের জন্য উপযুক্ত সুসময়ের প্রতীক্ষায় বসে আছে বা থাক্‌বে,—কিছুই বৃথা হয় নি বা হবে না। এই প্রত্যয়ে সুস্থির হও যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তোমার বিরুদ্ধে যাক্ না কেন, তোমার সৎকর্ম্মের শুভফল তোমার

জন্য অনন্ত কাল ধ'রে থাক্‌বেই থাক্‌বে। তুমি সকাম হ'য়ে কাজ ক'রে থাক্‌লে তোমার সকামতা তোমার ফলকে লঘু করে দেবে, এই মাত্র পার্থক্য হবে। তুমি নিষ্কাম হ'য়ে কাজ ক'রে থাক্‌লে তোমার শক্তি দুর্ব্বার ও দুর্জ্জেয় হবে।

নেতৃত্বের ঘুণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন কর্ম্মী অনেকেই আছেন, যাঁরা নিজ নিজ ত্যাগ ও শ্রমশীলতার প্রভাবে কর্ম্মিরূপে সমাদৃত হন, এমনকি নেতৃপদেও অভিষিক্ত হন। কিন্তু অন্য কর্ম্মীদের শরীরের উত্তাপটুকু সহ্য কত্তে পারেন না। এঁদের মনোভঙ্গী এই যে, ভারত যদি তাঁর নিজের দ্বারা বা নিজের নেতৃত্বে স্বাধীন না হয়, তবে তিনি ভারতের স্বাধীনতাও চান না। তিনি নিজে গিয়ে যদি আগুনটা নেবাতে না পারেন, অন্যদেরই যদি বাজার-জোড়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড থামাতে হয়, তবে যাক্ না বাজারটা ছারখার হয়ে, ছাই হ'য়ে, তাতে তাঁর কি যায় আসে? তিনি নিজে যখন নেতৃত্ব পেলেন না, তখন ঝড়ে, বন্যায়, প্লেগে দেশ রসাতলে ডুবে যাক্ না, তাতে তাঁর কি? অর্থাৎ তিনিই হবেন আমাদের কর-চরণের লৌহশৃঙ্খলের চূর্ণতাবিধাতা, তারই জন্য আমাদের স্বাধীনতা চাই, নইলে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের আর কোন্ প্রয়োজন? অর্থাৎ তিনিই হবেন সমস্ত বাজারটার অগ্নিকাণ্ডের পরিত্রাতা, নইলে আগুন নিভ্‌লেই বা কি, জ্বল্‌লেই বা কি? অর্থাৎ

তাঁকেই হওয়া চাই ঝঞ্ঝায় ত্রাণকারী, বন্যায় পরিত্রাতা, মহামারীতে ত্রাণকর্ত্তা, নইলে আমরা দেশ-শুদ্ধ লোক মরে গেলেই আর কি ক্ষতি, বেঁচে থাক্‌লেই আর কি লাভ? নেতৃত্বলাভিষিক্তদের এইরূপ অহংমত্ততা যে এক প্রকারের উন্মাদ-রোগ, এই কথাটাকে কি চিকিৎসক, কি চিকিৎসিত কেউ বুঝতে পারে না বলেই ত' এই প্রথাটা চালু হয়েছে। এগুলি মায়াও নয়, ছায়াও নয়, কায়া ত' নয়ই, এগুলি বিকৃত-বুদ্ধি অহংপ্রমত্ত বিভ্রান্তের একান্তই মস্তিষ্কের রোগ। বাঁশের সব চেয়ে বড় ঝাড়টা যখন ঘুণে ধরে, তখন আস্তে আস্তে সবগুলি ঝাড় হয় ঘুণের রোগে সংক্রামিত। এই অবস্থায় সবগুলি ঝাড় সমূলে উচ্ছেদ ক'রে নূতন ক'রে বাঁশের চাষ করাই সমীচীন।

অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় রংপুর টাউনহলে শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা হইবে। টাউনহল জনতায় কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সভাস্থলে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিলেন, হলে প্রবেশের রাস্তাটুকুও একেবারে জাম। অনেক ক্লেশ সহকারে তিনি ও রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মঞ্চে গিয়া উপবেশন করিলেন। স্থানীয় উকিল-সভার জনৈক মান্যগণ্য সদস্য রায় বাহাদুরকে সভাপতির পদে বরণ করিলেন। বক্তৃতারম্ভ হইল।

মাত্র দুই মিনিট সময় অতিক্রান্ত হইতেই দেখা গেল যে, জনতার ভিড়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশের ললাটে ঘর্ম্মোদ্‌গম

হইতেছে। বর্হিদ্বারের প্রান্ত হইতে জেলা-বোর্ডের ওভারশিয়ার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চীৎকার করিয়া অনুরোধ জানাইলেন যে, হলের বাহিরে উন্মুক্ত মাঠে সভার অধিবেশন হউক। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সভা এমন জমজমাট হইয়াছে যে, এখন সভাভঙ্গ করিয়া বাহিরে যাইতে গেলে পুনরায় সকলের সুশৃঙ্খল ভাবে আসন গ্রহণ করিতে করিতে কম পক্ষে এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইয়া যাইবে। আজ আপনারা একটু কষ্ট করিয়াই শুনুন, কাল আমি ঐ বাহিরের মাঠেই ভাষণ দিব। জনতা সম্মত হইলেন।

যাহাদের অতীত নাই ও যাহাদের আছে

বক্তৃতা ঠিক দেড় ঘণ্টা কাল চলিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাদের কোনো অতীত নেই বা অতীতকে যারা মুছে ফেলতে পেরেছে, এক হিসাবে তারা বড়ই নিশ্চিন্ত। একমাত্র ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই তারা নির্ভয়ে পথ চলতে পারে। অতীতের স্মৃতি, অতীতের প্রথা, অতীতের ইতিহাস, অতীতের গতানুগতিকতা তা' দিগকে স্পর্শ কত্তে পারে না। অতীতের মোহ তাদের গতিবেগ কমাতে পারে না। এই জন্যই, যখনি জগতে কোন বেপরোয়া ধর্ম্মমত বা বেপরোয়া রাষ্ট্র-নীতি আত্মপ্রকাশ করে, তখন তার একটা বিশেষত্ব এই দাঁড়ায় যে, যাদের সংস্পর্শে আস্‌তে হবে, তাদের প্রত্যেকের

অতীতকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দিতে হবে। অতীতের বালাই যাদের নেই, তাদের পক্ষে এটা একটা মস্ত সুবিধার ব্যাপার। ধ্বনি উঠবে,—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, পরিজ্ঞাত পৃথিবীর সীমার পরিধি অতিক্রম ক'রে ছুটে চল গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, ছুটে চল অজানা এক অত্যাশ্চর্য্য সমাজ গড়তে, অজানা এক অত্যাশ্চর্য্য রাষ্ট্র গড়তে, অজানা এক অত্যাশ্চর্য্য নব-মূল্যমান সৃষ্টি কত্তে। অতীত যখন নাই, তখন পিছন-টানের প্রশ্নও কিছু নাই। মিশর, ব্যাবিলোন, সুমের, হিত্তাইতি, মিট্টানি, অ্যাসিরিয়া, ক্রীট আদি কত প্রাচীন দেশের কত প্রাচীন ইতিহাস ছিল কিন্তু নবতর সভ্যতার দুর্ব্বার আর্বিভাবে তার প্রাচীন চরিত্রের ছন্দাংশটুকু পর্য্যন্ত এমন ভাবে মুছে গেছে, যাতে মনে করার কোনো উপায় নেই যে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের উপত্যকায় আজ যারা বাস কচ্ছে, এশিয়া মাইনর বা নাইল নদীর উপত্যকার আজ যারা অধিবাসী, তাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই কেউ ছিলেন হ্যাম্মুর‍্যাবি, নেবুচাদ্রেজ্জার অথবা আমেনহোটেপ। এদের সঙ্গে আধুনিক কালের ভারতবাসীদের অধিকাংশের এই ব্যাপারে একটা বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। ভারতবাসীরা ইতিহাস-রক্ষণে পটু বা ইতিহাস-সঙ্কলনে আগ্রহী না হওয়া সত্ত্বেও কেউ ঋষি ভরদ্বাজের নামে, কেউ ঋষি কাশ্যপের নামে, কেউ ঋষি শাণ্ডিল্যের নামে আজও আত্মপরিচয় দেয়। প্রবহমান বংশধারার সাথে

সাথে নিত্য নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে এদের পরিচয়-স্থাপন কত্তে হয়েছে, নিত্য নূতন প্রতিবেশীদের সঙ্গে এদের হয়েছে সংঘর্ষ এবং সন্ধি, নিত্য নূতন বিজয় ও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এদের হয়েছে কত রকমের সুসভ্য ও অসভ্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রোহের বা মিত্রতার সম্পর্ক, কত রকমের বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে কতবার এদের মরতে মরতে বেঁচে উঠ্‌তে হয়েছে এবং বাঁচতে বাঁচতে মরে যেতে হয়েছে, তথাপি ধমনীর রক্তপ্রবাহের প্রতিটি বিন্দুর সাথে সাথে ফুটে উঠেছে এক অস্ফুট স্বচ্ছ ঋষিমূর্ত্তি, যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রেমে সুস্মিত। অর্থাৎ যদিও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেউ কখনো আত্মজীবনী লিখ্‌তে আগ্রহী ছিলেন না, যদিও পদ্ধতিবদ্ধ ইতিহাস রচনা আমাদের ধাতের মধ্যেই নেই, তথাপি আমাদের একটা স্মরণযোগ্য মননযোগ্য গৌরবাবহ ইতিহাস আছে। যাদের অতীত নাই, তাদের সমগ্র শক্তি ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে একলক্ষ্য ভাবে একনিষ্ঠ হয়ে লাগ্‌তে পারে। যাদের অতীত আছে, তাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে পদে পদে অতীতকে স্মরণ ক'রে পথ চলতে হয়, তা' না কর্‌লে তাদের পদস্খলন ঘটে। ভারতে যখনি যাঁরা সমাজ-সংস্করণ কত্তে এসেছেন, তখনই তাঁদের কাছে ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণ একটা বিরাট দ্বিধাসঙ্কুল সমস্যার মূর্ত্তি নিয়েছে, কারণ, অতীতের পরম্পরাগত কুশলের দায় তারা এক

কথায় চুকিয়ে দিতে পারেন নি। কিন্তু অতীত যতই গৌরবান্বিত হোক্ এমন অতীত আছে, যাকে বর্জ্জন করা প্রয়োজন। অতীত যতই বিপদসঙ্কুল হউক, এমন অতীত আছে, যাকে বর্ত্তমানের জীবন-পটে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের এমন একটী অতীত। ব্রহ্মচর্য্য ছিল ব'লেই প্রাচীন যুগ নমস্য। ব্রহ্মচর্য্য ছিল ব'লেই প্রাচীন ঋষিরা নমস্য। ব্রহ্মচর্য্য ছিল ব'লেই প্রাচীন প্রথা নমস্য। আমাদের অতীতের সব স্মৃতিও যদি মুছে যায়, তবু যদি একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য থাকে, তবে একমাত্র তারই দৌলতে আমরা আমাদের মহত্তম ভবিষ্যৎকে অর্জ্জন কত্তে সমর্থ হব। পৃথিবীর কোনও দেশের সভ্যতা তদ্দেশস্থ জাতিকে যা' দিতে পারে নি, ব্রহ্মচর্য্য ভারতবর্ষকে তা' দিয়েছিল। সেই ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের প্রতিটী পদবিক্ষেপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনাই হবে ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনের সাধনা। আমি বহুবার বলেছি যে, ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আজও সেই কথাটুকু ব'লেই আজকের মত বিদায় নেব।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহজ উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যকে সহজ ভাবে, সরল

ভাবে, স্বাভাবিক ভাবে পালন কত্তে হ'লে তার প্রকৃষ্টতম উপায়টী হচ্ছে, জীবে জীবে ব্রহ্ম-ভাবের অনুশীলন ও অনুসরণ। যা-কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি, যা কিছু বুঝতে পাচ্ছি, যা-কিছু শুনতে পাচ্ছি, যা-কিছু অনুভবে আনতে পাচ্ছি, সবই একমাত্র ব্রহ্মেরই রসাস্বাদন মাত্র, তা' ছাড়া আর কিছুই নয়,—বারংবার চিন্তনের দ্বারা, অনু-চিন্তনের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, অনুধ্যানের দ্বারা, আলোচনার দ্বারা, প্রত্যালোচনার দ্বারা এই বোধকে নিজের অন্তরে নিত্য স্থায়ী কর্‌বার সাধনাই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। এ সাধনা অকৃতদার ব্যক্তি কত্তে পারে, বিবাহিত ব্যক্তিরা কত্তে পারে, বিধবারা কত্তে পারে, বিপত্নীকেরা কত্তে পারে, ইন্দ্রিয়-সুখত্যাগীরা কত্তে পারে, ইন্দ্রিয়-সুখভোগীরাও কত্তে পারে।

ইন্দ্রিয়সুখভোগীর ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইন্দ্রিয়-সুখভোগীরা কি ভাবে এ ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে পারে? সে তার ভোগ্য-বস্তুতে ব্রহ্মকে দেখতে চেষ্টা করুক, সে তার ভোগেন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্রহ্মকে উপস্থিত ব'লে জান্‌তে চেষ্টা করুক, সে তার ভোগ-চেষ্টার পশ্চাতে, ভোগকামনার পশ্চাতে নিয়ন্ত্রিকা শক্তি-রূপে ব্রহ্মকে অবস্থিত ব'লে উপলব্ধি কত্তে চেষ্টা করুক। এ চেষ্টা মানসিক। এ চেষ্টার মূলকে তার মনের মধ্যে প্রোথিত কত্তে হবে। জান্‌তে হবে, পরমেশ্বরই কাম রূপে, রতি রূপে,

বাসনা রূপে, কামনা রূপে, অভীপ্সা রূপে, তৃপ্তি রূপে, অতৃপ্তি রূপে, আবেগ রূপে, তার অন্তরে বিলাস ক'রে বেড়াচ্ছেন। জান্‌তে হবে তার দেহ, তার মন, তার চেষ্টা, তার পৌরুষ, তার আগ্রহ, তার অনাসক্তি সবই পরমেশ্বরের হাতের এক একটা বিচিত্র পুত্তলিকা। ইচ্ছা কল্লেই সে ভোগ কত্তে পারে না, যদি পরমেশ্বর তাকে দিয়ে ভোগ না করিয়ে নেন। ইচ্ছা কল্লেই সে সুখাস্বাদন কত্তে পারে না, যদি পরমেশ্বর তাকে সুখাস্বাদনের শক্তিটুকু না দেন। এই ভাবে ভাবতে ভাবতে তার দেহে ও মনে আপনা আপনি সংযম এসে যায়।

প্রথম বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু প্রথম বিদ্যার্থীর জন্য এটা রাস্তা নয়। তার রাস্তা গোড়া থেকেই ত্যাগের। প্রলোভনের পথে যাব না। আসক্তি বর্দ্ধক দৃশ্য দেখব না। উত্তেজনাকর কথাবার্ত্তা শুন্‌ব না। অন্যের গুহ্য সংবাদ জানবার জন্য চেষ্টা কর্ব্ব না। কেউ এসে গোপনীয়, গুহ্য ও ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা-সম্পর্কিত কথা বলতে সুরু কল্লে বিনা বাক্যব্যয়ে স্থানত্যাগ কর্ব্ব। নিজের গায়ে আগুনের হল্কার ছোঁয়াচ লাগতে দেব না। নিজের মনে লালসার ক্লেদস্পর্শ ঘটতে দেব না। কুকার্য্য ত' দূরের কথা, কুচিন্তা পর্য্যন্ত কর্ব্ব না। প্রথম বিদ্যার্থীকে এই নেতি পন্থার অনুসরণ করতে হবে। প্রাচীন

ভারতবর্ষে যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ছিল, তাতে এইভাবে ভারতের অতীতকে প্রতিটি বিদ্যার্থীর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবার চেষ্টা করেছিল। আমাদের একটা অতীত ছিল ব'লেই এই কথাটী আজ আলোচনার অবসর পাচ্ছি। যে অতীত ছিল একদা অপার্থিব গৌরবে গরীয়ান্, সেই অতীতের আশ্রয় থেকে আমরা কিছুতেই চ্যুত হব না, এই সঙ্কল্পের এই জন্যই রয়েছে আজ বিশেষ প্রয়োজন।

জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি আসন গ্রহণ করিলে রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যে বিষয়টীর প্রতি আমাদের অধিকাংশেরই নেই কোন মনোযোগ, এমন একটী নীরস বিষয় নিয়ে শ্রীশ্রীবাবামণি যেরূপ অপূর্ব্ব ভাষণ দিলেন, আমি স্বীকার কত্তে বাধ্য যে, এমন ভাষণ রংপুরবাসী একটী প্রাণীও সম্ভবতঃ জীবনে আর কখনো শোনেন নাই। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আরও কয়েক দিন ভাষণ দেবেন। আশা করি, প্রত্যেকেই প্রতিটি ভাষণ শুন্‌বার সুযোগ গ্রহণ কর্ব্বেন।

ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণের মাহাত্ম্য

রাত্রিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী নামক জনৈক উকিল তাঁহার ব্যক্তিগত জিজ্ঞাস্য-সমূহ উপস্থাপিত করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিষ্টিরিয়া, হাঁপানি বা উন্মাদ রোগ যে মনের অবদমিত কামনার বহিঃ-প্রকাশ, এই তত্ত্ব নানা

দেশে নানা জনের বক্তব্যে আজকাল খুবই মুখর। এই সকল অভিমতের মধ্যে সত্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। একদিকের মনোগতিকে অন্য দিকে ধাবিত করার চেষ্টার ভিতরে যে পুরুষকার আছে, তা' অনেক সময়ে স্বচ্ছন্দ বিজয়ের মূর্ত্তি ধারণ ক'রে যোদ্ধাকে গৌরবান্বিত করে। কিন্তু অজানা রন্ধ্রপথে লক্ষ্মীন্দরের লৌহ-নির্ম্মিত বাসরঘরে বিষাক্ত সর্পের প্রবেশের ন্যায় কখনো কখনো হলাহল-মত্ত দুর্ব্বার অধোগতিরও প্রবেশ ঘটে। মানুষ তার নিজের মনকে এত কম জানে যে, তার ভাল বা মন্দ কোনো কিছুই প্রায় তার আয়ত্তের মধ্যে থাকে না। এই কারণেই আমাদের সুধী গুরুজনেরা বলেছেন,—নিরন্তর ঈশ্বরাশ্রিত থাক, নিরন্তর ঈশ্বরে মন লাগিয়ে রাখ, পরমেশ্বরের পরম কৃপায় তোমার মন আস্তে আস্তে নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, প্রতিক্রিয়া-বিরহিত ভাবাবেগে পূর্ণ এবং শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর হবে। নিজেকে এবং নিজের সব-কিছুকে ঈশ্বরার্পিত ক'রে রাখবার অনুশীলনের চেয়ে নিরাপদে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠতর অন্য কোনো উপায় মানুষের জানা নেই। অনেক সাধন ক'রে তবে মানুষ এই উপায়টিকে জেনেছে এবং আর একবার মহাপ্রলয় এসে পৃথিবীকে সর্ব্বপ্রাণী সহ বিনাশ ক'রে দেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানব-মনের শান্তি বিধানের জন্য এইটাই একমাত্র নিরাপদ পন্থা-রূপে বিরাজমান থাক্‌বে।

অতঃপর হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী নামক একটী সেটেলমেণ্ট-

কর্ম্মী কতকগুলি প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— যৌনতত্ত্ব-সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে উচিত নয়। তুমি যা' যা' জান্‌তে চাচ্ছ, তার অনেক কথার জবাব আমার রচিত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থে মুদ্রিত অক্ষরে পাবে।

আচার্য্য শঙ্করের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা

যুবকটী শঙ্করাচার্য্যের প্রসঙ্গ তুলিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী আচার্য্য শঙ্করকে রতিতত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর দিতে না পেরে শঙ্করাচার্য্য রতিতত্ত্ব শিখবার জন্য যোগবলে দেহান্তর আশ্রয় ক'রে অন্য এক রাজার দেহের সাহায্যে রাজরাণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসবাস ক'রে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে এসে তার পরে নিজ দেহকে পুনরাশ্রয় ক'রে উভয়ভারতীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে সব প্রশ্নের যোগ্য জবাব দিলেন, এইরূপ কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। এ গল্প আমি বিশ্বাস করি না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা তর্ক শুরু ক'রে দেবার পরে হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে নির্দ্দিষ্ট একটা বিদ্যা শিখে আস্‌বার জন্য দু-সপ্তাহ বা দু-মাস ছুটি নিয়ে চলে গেলেন রতি-বিজ্ঞানের গবেষণাগারে, এরকম প্রথা কোথাও আছে ব'লে শুনি নি। আর, তর্ক যেখানে ব্রহ্ম নিয়ে, ব্রহ্ম দ্বৈত না অদ্বৈত, সগুণ না নির্গুণ। কিম্বা কর্ম্মকাণ্ড শ্রেষ্ঠ, না জ্ঞানকাণ্ড

শ্রেষ্ঠ, এই নিয়ে, সেখানে রতি-শাস্ত্রের প্রবেশাধিকার কোথায়? সগুণে নির্গুণে কি রতিতত্ত্ব আসে? কর্ম্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ডের কলহের ভিতরে রতিতত্ত্বের অবকাশ কোথায়? শঙ্করাচার্য্যের নিন্দাকারী অসূয়াপরায়ণ অসহিষ্ণুদের রচিত গালগল্পকে শঙ্করের মহিমাসূচক মনে ক'রে তাঁর অনুরাগীরাও অনেক সময়ে এই গল্পকে বেশ রং চড়িয়ে ফলাও ক'রে প্রচার ক'রে থাকেন ব'লেই একটা অসম্ভাবিত মিথ্যা কখনো সত্য হ'য়ে যেতে পারে না। যোগসিদ্ধ পুরুষের রতিতত্ত্ব শিখবার জন্য ভিন্ন পুরুষের দেহাশ্রয় ক'রে নারীর সান্নিধ্যে বাস করার কোনো প্রয়োজনই নেই। শঙ্করাচার্য্যের নিন্দাকারী দ্বৈতবাদ-সমর্থক রামানুজ-পন্থী লেখকেরা কেউ কেউ ত' সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দে এমন সব শ্লোকও লিখে গেছেন, যার বঙ্গানুবাদ হবে অশ্লীল এবং যার মর্ম্ম এই যে, আগের রাত্রে শঙ্কর এসে সুকৌশলে উভয়-ভারতীকে ঘরের বাইরে আকর্ষণ করেন এবং নিজ সুরত-সামর্থ্য দিয়ে মণ্ডন-পত্নীকে একেবারে বশীভূত ক'রে ফেলে নিজের অনুগত ক'রে নেন, যার ফলে উভয়-ভারতী পরের দিনের প্রকাশ্য বিচার-কালে এই কারণেই নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে রায় দিয়ে শঙ্করাচার্য্যকে জয়ী ব'লে ঘোষণা ক'রে দেন এবং তারই ফলে মণ্ডনমিশ্রকে গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ ক'রে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ ক'রে গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হ'য়ে শঙ্করের পদানুসরণ কত্তে বাধ্য হ'তে হয়। নিজের চক্ষে ছাপার হরফে এসব বিবরণ যদি না পড়্‌তাম, তবে এমন

কুরটনার কল্পনাও কত্তে পাত্তাম না। উভয়ভারতী পণ্ডিতা ছিলেন, এটা যথার্থ হ'তে পারে। কিন্তু তার আগে কোনও মহিলা-পণ্ডিত সর্ব্বত্যাগী আকুমার ব্রহ্মচারী এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে রতিশাস্ত্র নিয়ে তর্কালোচনা করেছেন ব'লে কোনো ইতিহাসে নজীর পাওয়া যাবে কি? কুলবধূ উভয় ভারতী রতিশাস্ত্র আলোচনার জন্য সদর্পে শঙ্করাচার্য্যকে আহ্বান করেছিলেন, এটা বধূজনোচিত আচরণ হ'তে পারে কি? শঙ্করাচার্য্য এক কথায় এমন প্রস্তাবকে প্রত্যাখান না ক'রে সাগ্রহে সম্মত হবেন, এটাও কি একজন আদর্শ সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব? গল্প গল্পই, তবে গাঁজার কল্কীর গল্প মানুষেরা বিনা বিচারে বিশ্বাস করে, এটাও মনুষ্য-স্বভাবই বটে। সংশিতব্রত সন্ন্যাসীতে আর পণ্ডিত-পত্নী কুল-বধূতে রতিশাস্ত্র নিয়ে তর্ক হয়েছে, এ রকম আর একটী দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে কোথাও দেখাতে পারবে কি? আর আচার্য্য শঙ্কর যদি সত্যি সত্যি কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে রতিশাস্ত্র বা কামতত্ত্ব নিয়ে তর্ক ক'রেই থাকেন, তবে কি ভাব্‌ছ যে, তাঁর অগণিত শিষ্যপ্রশিষ্যের দল এই ব্যাপারটা নিয়েই একটা প্রথার সৃষ্টি ক'রে ফেলে দলে দলে রতিতত্ত্ব বা কামশাস্ত্র নিয়ে বিদুষী কুললনাদের সঙ্গে তর্ক করার জন্য কোমর কেছে লেগে যেতেন না? আদিগুরু যা' কত্তে পেরেছেন, শিষ্য-প্রশিষ্যদের পক্ষে তা'তে নিরুৎসাহ থাকার বা অরুচি বোধ করার ত' কোনো কারণ নেই। শঙ্কর-শিষ্যেরা প্রধানতঃ শিবপূজক, প্রতীক তাঁদের অধিকাংশেরই শিবলিঙ্গ। লিঙ্গ

হচ্ছে কাম-তত্ত্বের একেবারে মেরুদণ্ড। সেই লিঙ্গ যাঁদের প্রতীক, তাঁরা শঙ্কর-জীবনে কামচর্চ্চার এমন চমৎকার নজীর পাওয়ার পরেও নিতান্ত গ্রাম্য বোকার মতন চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকবেন, এটা মনে করা মূর্খতা। কোথায় রায় রামানন্দের সঙ্গে গোপনে ব'সে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ-রাধার অপ্রাকৃত লীলারসের আলোচনা করেছিলেন, আর দেখ, তারই নজীর টেনে পূর্ব্বভারতের পল্লীতে পল্লীতে ধর্ম্মের নাম নিয়ে কত কত ব্যভিচার অবিরাম অনুষ্ঠিত হ'য়ে যাচ্ছে। শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এমনই এক অত্যদ্ভুত জাত। কেশব সেনকে ত্রৈলোক্য বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মশায় আপনি মাছ খান না কেন? ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র বলেছিলেন, 'আমি মাছ খেলে শিষ্যরা ধরবে মাংস, আমি পাঠা খেলে ওরা ধরবে গরু, শিষ্যরা চিরকালই গুরুর চেয়ে একটু বেশী দড়।' শঙ্করাচার্য্য সম্পর্কে ঐ গল্পটা সত্য হলে শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে রতিশাস্ত্র শিক্ষার জন্য যোষিৎ-সঙ্গ একটা কাড়াকাড়ির ব্যাপারে গিয়ে পরিণত হ'ত। কিন্তু তা' হয় নি। কারণ, গল্পটা মিথ্যা। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা ভারতীয় ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের আলোচনা কত্তে গিয়ে বারংবার বলেছেন phallus বা লিঙ্গ পূজা গ্রীসে ছিল, রোমে ছিল, ব্যাবিলনে ছিল, মিশরে ছিল, ছিল না কোন্ দেশে? কিন্তু সর্ব্বত্রই এই ব্যাপারটা একটা ন্যক্কার-জনক সামাজিক গ্লানির সৃষ্টি করেছে, অথচ দেখ, ভারতের কমপক্ষে বিশ লক্ষ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী আর কমপক্ষে এক কোটি বিধবা রমণী লিঙ্গ-প্রতীকের পূজা

করেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁদের কোনো কাম-বিকার নেই। ভারতবর্ষকে প্রশংসা কত্তে বিদেশীরা নিক্তির ওজনে করেন। সুতরাং মনে করো না যে, আমাদের কাছে বাহ্‌বা পাবার জন্য তাঁরা এই প্রশংসাসূচক কথাগুলি বলেছেন। শঙ্করাচার্য্যের রতিশিক্ষা বা রতিশাস্ত্রের চর্চ্চা সম্পর্কিত রটনাগুলি যদি সত্য সত্য ঘটনাই হ'ত, তাহ'লে লিঙ্গপূজক সন্ন্যাসীদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনেরও বেশী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক একজন ব্যভিচারী কালাচাঁদী গোসাই হ'য়ে যেত। কিন্তু তা' হয় নি। এ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আচার্য্য শঙ্কর কেবল জ্ঞানেই অদ্বিতীয় ছিলেন না, তিনি আচরণেও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

যুবকটী আরও প্রশ্ন করিতে চাহিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধৃষ্ট যুবক, গৃহে যাও। পরমেশ্বরের চিন্তা কত্তে কত্তে নিদ্রাশ্রয় নাও। শোবার আগে কতকগুলি বাজে বিষয়ের আলোচনা ক'রে মনকে বিক্ষিপ্ত কর্ম্মে মনের অবচেতন অবস্থায় অনেক দুর্গতি ঘটে। যা প্রশ্ন করার কাল ক'বরো, নিশ্চয়ই জবাব দিব।

রংপুর

১২ই, শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৪২

(২৮শে জুলাই, ১৯৩৫)

গতরাত্রের যুবক পুনরায় আসিয়াছেন, সঙ্গে একটী প্রবীণতর সঙ্গীও আনিয়াছেন। দুজনেই বেশ তার্কিক। আলোচনার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝা গেল না। বিরক্তিকর হইলেও

শ্রীশ্রীবাবামণি সহিষ্ণুতার সহিত একটার পর একটা কথার জবাব দিতে লাগিলেন।

সামাজিক সন্নীতি ও মুমূর্ষু বিবেক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাদের মধ্যে ভোগ্য-ভোগ্যাভাব উপজাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের মধ্যে যথেচ্ছ মেলামেশা, দেখাশুনা, আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করার চেষ্টা থেকে তারা পরস্পর পরস্পরকে বিরত রাখ্‌বে, এইটী সব দেশের সব সমাজেই সর্ব্বকালের শিষ্টজনসম্মত সন্নীতি। এই সন্নীতির সৃষ্টি সামাজিকবর্গের নানা সময়ের বিচিত্র ও অভাবনীয় অভিজ্ঞতা থেকেই হ'য়েছে এবং পরে তা' কুলক্রমাগত বা প্রথাগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের স্বাধীনতার অধিকারের নাম ক'রে এই প্রথাগুলির মূলগত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ কত্তে যাওয়ার নাম সমাজদ্রোহ। সকলেরই সাধ্যমত সমাজ-দ্রোহ থেকে বিরত থাকা উচিত,—এই যে সর্ব্ববাদিসম্মত একটী মত আছে, মহাযুদ্ধকালে, বিপ্লবের সময়ে, ব্যাপক বিপর্য্যয়ের মুহূর্ত্তে, মহামারী বা মন্বন্তরের ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আপনা আপনি তা' শিথিল হ'য়ে পড়ে। কারণ, সেই সময়ে মানুষের প্রধানতম দৃষ্টি থাকে কোনো প্রকারে বেঁচে যাওয়া এবং কোনো রকমে বেঁচে থাকা। তখন নৈতিকতার আদর্শ বা মাধুরী ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ, নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। বিবেক তখন কেবল দুর্ব্বলই হ'য়ে পড়ে না, অমা-রজনীর অন্ধকার যত

নিবিড়তর হ'তে থাকে, বিবেক তখন নিজের প্রতি তত নির্ব্বিকার ও মমত্বহীন হ'য়ে অনায়াসে পাপের সঙ্গে আপোষ করে। এই সব অবস্থায় ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন নীতি-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়, নূতন নূতন ফ্যাশানকে মানুষ নূতন নূতন ধর্ম্ম জ্ঞান ক'রে তাকেই আঁকড়ে ধ'রে সংসার-বৈতরণী পার হওয়ার প্রয়াস পায়। ভোগবাদের এটা চরম কুফল। এরই ফলে বিপর্য্যয় কাটিয়ে উ'ঠে দেশ বা জাতি যখন সুদিনের নাগাল পায়, তখনও আর কদভ্যাস, কদাচার, কুৎসিত আসক্তি ছাড়তে পারে না। এতগুলি ত' প্রশ্ন করেছ, তাতে তোমার চিন্তাশক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাচ্ছে। তোমার ঐ হাজার চিন্তার সাথে সাথে আমার বলা এই কথাগুলিও একটু চিন্তা ক'রো।

বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরুষে পুরুষে মিত্রতা বা নারীতে নারীতে সখীত্ব সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট একটা সময় পর্য্যন্ত চলতে পারে বা চ'লে থাকে। বুদ্ধির বিকার বা রুচির বিকৃত অস্বাভাবিকতার খাতে প্রবাহিত না হ'লে সাধারণতঃ এই মিত্রতার গণ্ডী খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পুরুষে আর নারীতে, নারীতে আর পুরুষে মিত্রতার চর্চ্চা কল্পনীয় সকল সীমাকে অতিক্রম ক'রে চলে যায়, শুধু দেহ নিয়েই নয়, মন, প্রাণ, আত্মাকে নিয়েও সে রাজত্ব চালায়। একটা মানুষের দেহটাই

মাত্র অপর মানুষটীর দাবীর অধীন নয়, তখন একের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সবই অপর মানুষটার প্রাপ্য বা অপর মানুষটার প্রতি প্রদেয়। অবস্থাটা যখন এইরূপ দাঁড়ায়, তখনই নারী-পুরুষের রতিক্রিয়া-সমন্বিত সহবাস স্বাভাবিক। কোনও দেশ বা জাতিই এই স্বাভাবিক ব্যাপারকে সমর্থনের অযোগ্য মনে করে নি কিন্তু সমর্থন বা সম্মতির সঙ্গে তুলে দিয়েছে উভয়ের স্কন্ধে দ্বিবিধ দায়িত্ব। প্রশ্ন উঠ্‌ল, যার সঙ্গে যার সহবাস হ'ল, তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি নিতান্তই ক্ষণিকের? শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালেই যার যার রাস্তা সে ধরবে এবং একজন যদি উত্তর দিকে অন্তর্ধান কর্ল্ল, তবে অপর জনকে দক্ষিণ মেরুতে চলে যেতে হবে? দায়িত্ব কি নেই? কর্ত্তব্য কি নেই? সহবাসের দ্বারা একে অপরের অনুপূরক হ'ল বা পরিপূরক হ'ল, ফলে একে অপরকে ত্যাগ ক'রে বিচ্ছেদ সৃষ্টি কত্তে অনধিকারী হ'ল। বিবাহ-রূপ পবিত্র এক বন্ধনের সৃষ্টি জগতে এই কারণেই হয়েছে। যে ধর্ম্মের নিয়মানুসারেই এই বন্ধনটিতে তুমি আবদ্ধ হও না কেন, সকলের চখেই বিবাহ এই কারণে এক পবিত্র অনুষ্ঠান। এই কারণেই বিবাহ-দান একটী পুণ্যকর্ম্ম, সংশিতব্রত ব্রহ্মচারী ছাড়া অপর সকলের পক্ষে বিবাহ-দর্শন একটী পুণ্যকর্ম্ম, বিবাহ-অনুষ্ঠানে সাহায্য-সহায়তা করা পুণ্য কর্ম্ম, কারো বিবাহ ঈর্ষ্যাপরবশ হ'য়ে ভেঙ্গে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া অতীব নিন্দিত এক পাপকর্ম্ম।

ব্যভিচার, ধর্ষণ ও পুরুষ-শিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যেই বিবাহ-বন্ধনের বাইরে গিয়ে যৌন সহযোগ করার নাম ব্যভিচার এবং এই জন্যেই ব্যভিচার অধর্ম্ম। মানুষের ভোগপ্রবৃত্তিকে নানা ভাবে উত্তেজিত কত্তে কত্তে অস্বাভাবিক কামনাকে কেবলি উদ্রিক্ত কত্তে থাকলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মত্ত হয়। ব্যভিচার দুঃসাহসকে বাড়িয়ে দেয়, তখন সমাজ-মধ্যে বৃদ্ধি পায় ধর্ষণ। ব্যভিচার পাপ হ'লেও তার একটা স্থানে আছে সমর্থন। তা' এই যে, এতে উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতি বিদ্যমান। স্ত্রীপুরুষের মিলিত ভাবে কামানুশীলন যদি সমাজানুমোদিত বা রাষ্ট্রানুমোদিত গণ্ডীর ভিতরে হয়, তবে তা' নিয়ে নীতিশাস্ত্রকারেরা মাথা ঘামান না। তাঁরা মাত্র এইটুকুই বলেন যে, অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা ক'রো না, গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষে অনিষ্টকর ভাবে ইন্দ্রিয়-সেবা থেকে বিরত হও, জাত সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়ো না। বিবাহিত দম্পতীর মধ্যে দৈহিক ভোগ-সম্ভোগের অবাধ ও অবারিত সামাজিক, ধার্ম্মিক ও নৈতিক অধিকার আছে ব'লেই যে এই ব্যাপারে বেপরোয়া স্বাধীনতা ধর্ম্মসঙ্গত, এ কথা মনে কত্তে নেই। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা যখন কর্ত্তব্যজ্ঞান হ্রাস করে, দৈহিক সামর্থ্য কমায়, মানসিক

সুস্থতা নাশ করে, তখন ওটা পাপ। কিন্তু ব্যভিচারীর সম্পর্কে তাঁদের অবিমিশ্র ঘৃণা ব্যতীত আর কিছুর প্রত্যাশা তোমরা কত্তে পার না। যে সমাজে ব্যভিচার সমাদৃত, সে সমাজ পশুর সমাজ। যে সমাজে ধর্ষণ অনিন্দিত, সে সমাজ দানবের সমাজ। পশুরা প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে আর দানবেরা যাবতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ ক'রে নিজেদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, নিজেদের কৃতিত্বকে সাবাস জানায়। নারীটী যদি পুরুষটীর পত্নী না হয় এবং উভয়ের শারীরিক মিলনের মধ্যে স্ত্রীটীর এককণাও যদি থাকে অনিচ্ছা, তবে ব্যাপারটা শুধুই ব্যভিচার থাকে না, ওটা হ'য়ে যায় ধর্ষণ। স্ত্রীপুরুষ মিলিত-ভাবে পরস্পরের শারীর ব্যবহারের সম্পর্কে অনুমোদনশীল হ'য়ে যদি কামানুশীলন করে, এবং তাদের এই গ্রাম্য ব্যবহারে যদি ধর্ম্মীয় অনুশাসনের বা রাষ্ট্রপ্রচলিত আইনের বাধা না থাকে, তবে তাকে ব্যভিচার ব'লে মনে করা যায় না। কিন্তু যদি স্ত্রীলোকটী পুরুষটীর পত্নী না হয় এবং উভয়ের শারীরিক মিলনের মধ্যে স্ত্রীটীর এক কণাও যদি থাকে অনিচ্ছা, তা' হ'লেই ব্যাপারটা হ'য়ে দাঁড়ায় ধর্ষণ। ধর্ষণকে নিন্দা করে নাই, পৃথিবীতে এমন কোনও সমাজ ব্যবস্থা বোধ হয় নাই। কিন্তু এমন কতগুলি স্ত্রীলোকও থাকে, যারা ধর্ষিতা হ'তে আনন্দ পায়। এসব স্ত্রীলোকেরা বাহ্যতঃ ধর্ষণে বাধা দান করে কিন্তু পুরুষকে নিজের কব্জার ভিতরে পুরবার উদ্দেশ্যে

এমন সব ছলা-কলার চর্চ্চা করে যে অভিলষিত পুরুষটী ধর্ষণের জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে যায় এবং "যা থাকে কপালে" ব'লে দুঃসাহসে ভর ক'রে প্রথম সুযোগেই যা' করার তা' ক'রে বসে। এসব নারীকে পুরুষ-শিকারী আখ্যা দিতে হয়। এক এক জন দানব-পুরুষ যেমন একের পর এক ক'রে ক্রমাগত বহু নারীর উপরে ধর্ষণ চালিয়ে নিজেদের দৈত্য জীবনকে গর্ব্বিত করার চেষ্টা করে, ঠিক সেই রকম এক একটী দানবী-নারী একের পর একটী ক'রে পুরুষকে সুকৌশলে উত্তেজিত ক'রে ক'রে ধর্ষণের ন্যায় দুঃসাহসিক কার্য্যে প্ররোচিত এবং লিপ্ত ক'রে তাদের চরিত্রের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে -চুরে দিয়ে নিজের বিজয়িনী-গর্ব্বকে চরিতার্থ করে। সমাজের দুর্গম গিরিবর্ত্মে এরা সব দারুণ সঙ্কট। এই সঙ্কটের মোচনের জন্যই বুদ্ধদেব নারী সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন,—প্রথম উপায় অদর্শন, দ্বিতীয় উপায় উপস্থাপন বা পূজা। অর্থাৎ নারী সম্পর্কে এগুবে না, যদি দেখাশুনা হ'য়ে যায়, তবে মাতৃবৎ জ্ঞান ক'রে মনে মনে তাকে পূজা কর্ব্বে।

গণিকা-বৃত্তি সম্বন্ধে

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ হয়ত গণিকা কিম্বা গণিকাবৎ দুশ্চরিত্রা। কিন্তু তাতে আমার কি? আমার দৃষ্টিতে সে মা। পৃথিবীতে মায়ের মত

পূজার পাত্রী, মায়ের মত আদরণীয়া, মায়ের মত অভয়দাত্রী আর কিছু আমার নেই। আমিই গেয়েছি—

"যে দিকে ফিরাই রে আঁখি
কেবল আমার মাকেই দেখি,
মা যে আমার বিশ্বজোড়া
ব্যাপিত সব জলস্থল,
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্?"

নারী দেখলে এসব চিন্তা, সন্দেহ বা আলোচনা আমার মনে কখনো আসে না যে, সে কি বাজারের গণিকা, না কারো রক্ষিতা, না কারো সঙ্গে গোপন অবৈধ সম্পর্কে সম্পর্কান্বিতা, বস্ত্রাচ্ছাদিতা সুশোভনা নারীমূর্ত্তিকে মনে মনে বিবস্ত্রা কল্পনা ক'রে তার বিভিন্ন অঙ্গের মাধুরী বা কদর্য্যতা সম্পর্কে যারা চিন্তা করে, আমার মতে তারাও এক একজন ব্যভিচারী অপরাধী ব্যক্তি। তবু সামাজিক মানুষ এই আলোচনা না ক'রে পারে না যে, কেন নারীরা গণিকা-বৃত্তির পথে বা পতিতার জীবনের দিকে আকৃষ্টা হয়। ভ্রমণকারী ব্যবসাদার বা সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিক বা নিত্য নূতন স্থানে ভ্রমণশীল সৈনিকের পক্ষে অত্যাগ্রহের সময়ে পত্নীর সঙ্গ মিলে না ব'লে এদের জৈবিক প্রয়োজনের দাবী মেটাবার জন্য আর এক শ্রেণীর ব্যবসাদারেরা অনাদি কাল থেকেই পোতাশ্রয়ে, সেনা-নিবাসে, বাজারে ও হাটে রমণী সরবরাহ ক'রে আস্ছে।

এসব স্থানে দেহ-বিক্রয় করবার জন্য যারা আস্‌ছে, তারা কি কি কারণে আস্‌ছে, তাও অতীব বিচিত্র। মনে করা যেতে পারে, যারা আসছে, দারিদ্র্যই তাদের এই অধঃপতনের মূল কারণ। দগ্ধ উদরকে পালনের জন্য মানুষ কিই না কর্ত্তে পারে! কত নীচেই না নামতে পারে। কিন্তু পেটের ক্ষুধা মেটাবার যাদের অন্য উপায় আছে, তারাও ত' এই পথে আসে। প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, প্রতিভাশালিনী, মেয়েরাও দলে দলে গাণিক্যের পথে নাম্‌তে কুণ্ঠিতা হয় নি! তারা কেউ কেউ নিজ নিজ জীবৎ-কালে রাষ্ট্রনীতিরও কর্ণধার হবার দক্ষতা বা যোগ্যতা দেখিয়েছে। তবে কেন গাণিক্যের পাতাল-গহ্বর অথবা রক্ষিতার গবাক্ষহীন স্বল্পালোকিত কোটর তাদের আদরের আশ্রয়স্থল হ'ল? কারণ, ক্ষমতাশালী লোকেরা গণিকা পুষতে ভালবাসে। আবার অনেক রমণীর রিরংসার উন্মাদনা এমন মাত্রাহীন হ'য়ে থাকে যে, শত-পুরুষ-সম্ভোগেও তাদের প্রাণের পিপাসা আর মিটতে চায় না। রোম নগরী যখন অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাটের রাজধানী, ঠিক তখনই কেন দেখা যায় যে, এক একজন সম্রাজ্ঞী রাজ-দরবারের উচ্ছৃঙ্খল উপভোগেও ক্লান্ত হচ্ছেন না, তাঁরা আবার ছদ্মবেশে শহরের সবচেয়ে নোংরা গলিগুলিতে গিয়ে রাজপথের রাজমিস্ত্রী, ভিস্তিওয়ালা পাথর-ভাঙ্গা কুলী বা মাংস-কাটা কসাই ডেকে এনে তার সঙ্গে সম্ভোগরত সুখ-রজনী কাটিয়ে দিচ্ছেন। কোটি মুদ্রা মূল্যের রত্ন-রাজিতে যার পায়ের জুতো-জোড়া বিখচিত, তাঁর এমন মাত্রাজ্ঞানবর্জ্জিত বেপরোয়া ইন্দ্রিয়-

বিলাস কেন? এটা অন্য কোনও পুরুষের দোষে ঘটে নি, এটা তার নিজস্ব রমণেচ্ছা-চর্চ্চারই এক শোচনীয় পরিণাম। সম্রাজ্ঞী হ'লেও এরা বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। রমণেচ্ছার তাড়নায় এরা এক স্বামীকে হত্যা ক'রে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে এবং বিবাহিত স্বামীকে প্রতারণা ক'রে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে দেহ-সুখ-সম্পর্ক স্থাপন করে। মনোব্যাধির এগুলি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কিন্তু কারো কারো পক্ষে দেহেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক গঠনও এর কারণ হ'তে পারে। কিন্তু অধিকাংশ গণিকাই যে প্রবঞ্চকের হাতে প'ড়ে ভুল বুঝে বিপথে এসেছে, একথা বল্‌লে বোধ হয় ভুল হবে না। এমন মেয়েদের জন্য আত্মসংশোধন ক'রে সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করার পথ খুলে দেওয়ার চেষ্টা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভোগ-বিলাসের, অতিরিক্ত আয়ের, বেশী পরিমাণ টাকাকড়ি হাতিয়ে বেশ স্বচ্ছল ভাবে থাক্‌বার আকাঙ্ক্ষা যাদের সীমাহীন, দারিদ্র্য না থাক্‌লেও তেমন মেয়েরা সধবা হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও, এমনকি নিজেরা নিজেদের শ্রম দিয়ে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করার মত ক্ষমতা এবং সুযোগ তাদের থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ে তারা পরপুরুষ-প্রীণনকে রুটিন-মাফিক কর্ত্তব্যের মধ্যে ধ'রে নিতে পারে। অবশ্য, এর কারণ দারিদ্র্যও নয়, অপরের কোনো প্ররোচনাও নয়, এর কারণ নিছক সাংসারিক আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যকে নিজের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের অধীন রাখা। প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগধর্ম্মের মহিমা আমাদের জীবন থেকে যতই অপসৃত হ'তে থাক্‌বে, এই দুঃশীলতা আমাদের সমাজে ততই বাড়বে। আজ

ইংরেজকে আমরা মনে প্রাণে ঘৃণা করি ব'লে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগ ও সতীত্বের আদর্শই আমাদের চিরাবলম্বনীয়। কিন্তু একদিন ইংরাজ এদেশে থাক্‌বে না, একদিন ইংরাজের প্রতি আমাদের বিদ্বেষও কমে যাবে। সেই দিন সত্য সত্য পরীক্ষা সুরু হবে যে, আমরা ত্যাগ-মহিমায় বিশ্বাসী কিনা। জানি না, সেইটী আমাদের এক মহাশুভদিন, না পরম দুর্দ্দিন।

যৌন জীবনের স্বচ্ছতা ও দেবমানবের আবির্ভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কয়েক মাস আগে আমি শ্রীহট্ট শহরে কয়েকটী বক্তৃতায় খুব কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলেছিলাম। শুধু স্পষ্ট কথাই নয়, সত্য কথা। মৎপ্রদত্ত অকাট্য যুক্তিনিচয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সাহস ক'রে, আমার কথার কেউ প্রতিবাদ কত্তে পারেন নি। শ্রোতা ছিলেন হাজার হাজার আর তাঁদের মধ্যে শহরের গণ্যমান্য বিদ্বান্ লোকদেরই ছিল প্রাচুর্য্য। আমি বলেছিলাম, দেশটা আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের প্রাথমিক চরিত্র হ'ল নিজেদের দেশ-সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ থাকা এবং বিদেশের কৃতিত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকা। তথাপি আমরা গরজ ক'রে গোলাকার এই পৃথিবীটার অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কে কোনো খবর সত্য সত্যই জানি না। জানা অসাধ্য ব'লে জান্‌তে

পারি না, তা' নয়, জান্‌তে চেষ্টা করি না ব'লেই জানি না। কোথায় তাঁদের মহত্ত্ব আর কোথায় তাঁদের হীনতা, তার সংবাদ সংগ্রহের গরজই আমাদের নেই। তবু ছিটেফোঁটা খবর যা' ঐ সব দেশ থেকে আসছে, তা' থেকে অনেক বিষয়ই ধারণা করা যায়। যৌন ব্যাপারকে মল-মূত্র ত্যাগের মতন একটা সাধারণ ব্যাপার মনে করার ফলে নরনারীর আচরণে যে নিদারুণ পরিবর্ত্তন প্রত্যাসন্ন, তা' সুদীর্ঘ বহু শত শতাব্দী ধ'রে অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ পন্থার একেবারেই বিপরীতধর্ম্মী। এতকাল ধ'রে সমাজ-রূপী পেনেলোপি * যে বস্ত্রখানা বয়ন ক'রে যাচ্ছিলেন, এখনকার নবভাবপ্রবর্ত্তকেরা সেই বস্ত্রখানার বয়ন-করা সূতাগুলি সযত্নে খুলে ফেলতে চেষ্টিত হচ্ছেন। রাস্তার ধারের মূত্রাগারে বা শৌচাগারে যে

* পেনেলোপি হোমার-রচিত মহাকাব্যের এক প্রখ্যাত নায়িকা। ইনি ইথাকার রাজা ইউলিসিসের পত্নী। ইউলিসিস ট্রয়ের মহাযুদ্ধে বিদেশ-গমন করিলে চতুর্দ্দিকের রাজারা পেনেলোপিকে বিবাহ করিবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। পেনেলোপি বলেন যে, তিনি একখানা বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। সেই বস্ত্রখানার বয়ন শেষ হইলেই তিনি উক্ত রাজাদের মধ্যে যে-কোনও একজনকে বিবাহ করিবেন। রাজারা পেনেলোপির গৃহেই বহির্বাটিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সারাদিন পেনেলোপি বস্ত্র-বয়ন করেন, সারারাত বয়ন-করা সূতা খুলিতে নিরত থাকেন। সুদীর্ঘকালেও তাঁহার আর বস্ত্র-বয়ন শেষ হইল না। ইতিমধ্যে ইউলিসিস যুদ্ধ শেষ করিয়া রাজ্যে ফিরিলেন এবং গদাঘাতে উপদ্রবকারী রাজাদের যোগ্য শিক্ষা প্রদান করিলেন।

ইচ্ছা সে এবং যত জন ইচ্ছা তত জন পর পর এসে মূত্রত্যাগ বা মলত্যাগ ক'রে যেতে পারে কিন্তু নারীকে মূত্রাগার বা শৌচাগারের মতন সর্ব্বসাধারণের জিনিষে পরিণত করা চলে না। নারী নিজে যদি কখনো তা' চান, তবুও না। নারী হচ্ছে জাতির মা, জগতের মা। মাকে তার নিজ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়াসই সমাজধর্ম্মের সব চেয়ে বড় কথা। আমি বলেছিলাম, ফ্রান্স যে পথে চলেছে, সেই পথ তাকে ছাড়তে হবে, নইলে সে বিপন্ন হবে, বিপর্য্যস্ত হবে, পর্য্যুদস্ত হবে। তবে দেশটা সত্য সত্যই স্বাধীন, সুতরাং সে আস্তে আস্তে এবং অনেক চেষ্টার পরে বিপদ কাটিয়ে উঠবে। সে তার সমাজ-জীবনের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পেতে বাধ্য হবেই হবে। † আজ আমরা শিল্প, সাহিত্য বা সংস্কৃতির নামে যদি এমন কিছুর প্রবর্ত্তন করি, যা সুকৌশলে আমাদের তরুণ-তরুণীদের মনে প্রচ্ছন্ন ভোগ-লিপ্সাতে ইন্ধন দেয়, তবে একদা তার ফল ভোগ কর্ব্বার কালে অনেক চখের জলে আমাদের বক্ষ ভাসাতে হবে। শিল্প, সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি কেবল

† শ্রীশ্রীবাবামণির এই ভবিষ্যদ্বাণী ইংরাজি ১৯৪১ সালে সত্য সত্যই ফলিয়াছিল। জার্ম্মেণীর আক্রমণে প্রায় সমগ্র ফ্রান্স কিছুদিনের জন্য হইলেও জার্ম্মেণীর পদানত হইয়াছিল। ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি তখন দুঃখ করিয়া প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, রণনৈপুণ্যে প্রসিদ্ধ ফ্রান্স যে জার্ম্মেণীর পদানত হইতে বাধ্য হইল, তাহার একমাত্র কারণ ফ্রান্সের নৈতিক অধোগতি।

দেশ-চরিত্রের মুকুরই নয়, ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিতদাতা বা দিগ্‌দর্শন। একটী নৃত্যানুষ্ঠান, একটী শিল্প-নিদর্শন, একটী সাহিত্য-কীর্ত্তি স্রষ্টা, পাঠক বা শ্রোতার মনে কি কি ভাবের উদ্দীপনা দেয়, এটাও যেমন বিবেচ্য, এই নির্দ্দিষ্ট কৃতিত্বের স্রষ্টার মনে কি কি ভাবের প্রসার বা বিকার ঘটায়, সেটাও তেমন বিবেচ্য। উভয়ই দেশবাসীর ভবিষ্যৎকে স্থিত ও গঠিত করে। উচ্চারণের অযোগ্য একটা অশ্লীল গান গেয়ে একজন মরে গেলেন, তাতেই তাঁর ঐ সাহিত্য-কীর্ত্তির জের মিটল না। তিনি নিজে তখন কি ভাবছিলেন, সেই চিন্তাটা কিন্তু সকলের অজ্ঞাতসারে বহু দুর্ব্বল মনকে অভিভূত করার চেষ্টা নিয়ে সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাক্‌বে। শক্তিশালী চিন্তাবীরের বিপরীত চিন্তার পরাক্রমেই মাত্র এই আপদের প্রতীকার হ'তে পারে। পুরুষ-মনের অধিকাংশ ভাবনাই ত' নারীকে নিয়ে। নারী-মনের অধিকাংশ ভাবনাও তেমনি পুরুষকে নিয়ে। এই ভাবনাকে মলমূত্র ত্যাগের স্তরে নিয়ে ফেল্‌লে মানুষের ভবিষ্যৎ মাঠে মারা যাবে। অনেক মনীষীরাই যে সময়ে ভাবছেন যে, আজকের মানবজাতি ভবিষ্যতে এক মহামানবজাতিতে বা দেবমানব-জাতিতে রূপান্তরিত হবে, সেই সময়ে মানুষের যৌন ব্যাপারকে ছেলেখেলা ব'লে মনে করা উচিত নয়। মানুষ যখন পশুর স্তরে ছিল, তখনকার কথা আলাদা, সেই পুরোণো পরিত্যক্ত স্তরেই মানুষের ফিরে

যাওয়ার প্রয়োজনটা কি? মানুষ অতিমানব কি ক'রে হ'তে পারে, সাধারণ মানুষের বংশধরেরা কি ক'রে দেব-মানবে পরিণত হ'তে পারে, এইটাই হওয়া উচিত বর্ত্তমান মানবের একমাত্র চিন্তা। দেব-মানবের অবির্ভাবকে সম্ভব করার জন্যই যৌন-জীবন সম্পর্কে চাই স্বচ্ছ, শুচি এবং আনন্দিত ধারণা।

জীবন দিয়া ছবি আঁকা

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় টাউন হলের বহির্দ্দেশস্থ মাঠে শ্রীশ্রীবাবামণির রংপুরের তৃতীয় ভাষণ শুরু হইল। প্রত্যেকেই জানিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রোতার আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া বা নিজে বিলম্ব করিয়া আসিয়া ঘড়ির অপমান করেন না, সুতরাং বিরাট মাঠ আগে হইতেই শ্রবণেচ্ছু আগ্রহী জনতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংযম এমন এক অনবদ্য আদর্শ, যা' শক্তিকে একদিকে করে সংহত, অন্য দিকে করে একাগ্র। একাগ্র হ'লে বাঁশের একটী কচি করুলও বিরাট বটবৃক্ষের কাণ্ড ভেদ ক'রে চলে যেতে পারে, এ দৃশ্য আমরা বছর দশ বারো আগেকার এক ভীষণ ঝড়ের সময়ে নিজেদের চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষের জীবনে সংযম এক মহাশক্তির উৎস, কারণ সংযমের দ্বারা সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়। যার যেটুকু শক্তি আছে, সে যদি সেইটুকুকে প্রকৃষ্টতম সদ্ব্যবহারে আনবার অভিলাষে সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে জমা করে

এবং একমাত্র সঠিক প্রয়োজনের সময়ে সুস্থির সঙ্কল্প নিয়ে ব্যবহার করে, তাহ'লে পরিণামে দেখা যাবে যে, ব্যয় তার অতি অল্পই হয়েছে কিন্তু ব্যয়ের পরিবর্ত্তে প্রাপ্তি তার ঘটেছে অসামান্য রকমের এবং ব্যপক-ভাবে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি সর্ব্বতোভাবে সংযমকে করেছিলেন তাঁর প্রথম জীবনের একমাত্র ব্রত। এ সময়ে ব্যয়, অপব্যয় বা অপচয়ের নাই কোনো প্রশ্ন। জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশে পত্নীকে নিজ আদর্শে সুদীক্ষিত করবার চেষ্টা এবং দ্বিতীয়াংশে অল্প ব্যয়ে কিন্তু একাগ্র ব্যয়ের পরিণাম-স্বরূপ কীর্ত্তিমান্, ব্রহ্মজ্ঞ, জগন্মঙ্গলকারী সন্তান লাভের প্রযত্ন,—এই ছিল তাঁদের জীবন-চর্য্যা। তৃতীয় অধ্যায়ে সাংসারিক জীবনে জটিলতা, কুটিলতা, আবিলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও চঞ্চলতার আওতা ছেড়ে বানপ্রস্থ আশ্রমে গিয়ে হয় সস্ত্রীক, নয় একক কঠোর তপস্যা দ্বারা জীবনকে ব্রহ্মানন্দের পূর্ণতায় অভিষিক্ত ক'রে তোলার সাধনা। চতুর্থ অধ্যায় বিষয়-বিরক্ত, সুখদঃখে উদাসীন, আত্মসুখকামনা-বিরহিত, পরদুঃখবিমোচক ও ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বজনের কুশলকর্ম্মে আত্মনিয়োগের শুভ্রসুন্দর পূর্ণাঙ্গ জীবনের চর্য্যা ও বৃত্তি গ্রহণ। এ যেন নিজের জীবনটাকে তূলি ক'রে নিয়ে নিজের জীবনের যাবতীয় সামার্থ্যকে রং-রূপে গুলে নিয়ে অনন্তকালকে চিত্রপট ক'রে ঋষিগণ ও ঋষিনন্দনেরা শতগগনব্যাপী একটীর পর একটী ক'রে কেবল ছবি এঁকে চলেছেন।

ভারতের ব্রহ্মচর্য্য কল্পনার স্বপ্নাবেশ নয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কেউ হয়ত তর্ক তুলে বলতে পারেন, "এসব কবি-কল্পনা বা পাগলের প্রলাপ, এরকম ঘটনা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে কোথাও কখনো হয় নি। গায়ের জোরে কথাগুলি প্রচার ক'রে গেলেই বুঝি হ'ল! এ সব গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাস কর্ব্বে কে?" আমি তার জবাবে বল্‌ব, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এটা সম্ভব নাও হ'তে পারে কিন্তু এটা যে ভারতবর্ষ। এদেশে এটা সম্ভব, সুনিশ্চিতই সম্ভব। ভারতবর্ষ ব'লেই এটা সম্ভব। ভারতবর্ষ না হ'লে হয়ত এটা সম্ভব হ'ত না। এটা যদি গাঁজাখুরি স্বপ্নই হ'য়ে থাকে, তবে অন্য কোনো দেশে আজ পর্য্যন্ত কেউ এই রকমের স্বপ্ন দেখল না কেন? গাঁজাখোর ত' সব দেশেই আছে আর গাঁজায় দম দিলে যুক্তিশাস্ত্র আর দণ্ডবিধি আইনের পরোয়া ত' কোনো দেশের লোকের কোনো কালেই ছিল না। জীবনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্য্যকে সংস্থাপিত কর্‌লে যে পর পর স্বাভাবিক ভাবে জীবনের চারটি অধ্যায়ে চারটি নূতন ঢংয়ের পৃথক্ সৌন্দর্য্যময় চিত্রের উন্মেষ ঘটে, এমন স্বপ্ন আরব কেন দেখল না, মিশর কেন দেখল না, রোম কেন দেখল না, ভূমণ্ডলের আর কোনো দেশ কেন দেখল না। স্বপ্ন স্বপ্নই, স্বপ্ন সত্যও হ'তে পারে, মিথ্যাও

হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবে যা' কারো পক্ষে সুসাধ্য, কারো পক্ষে অসাধ্য, স্বপ্নে তা' প্রত্যেকের পক্ষেই সুসাধ্য। এসব ছবি যদি শুধু কল্পনারই ছবি, তবে পৃথিবীর সব দেশের লোক এই অভাবনীয় সুন্দর স্বপ্নটী দেখ্‌তে সমর্থ হ'ল না কেন? কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। ভারতের চতুরাশ্রম যে কেবলি কল্পনার বিলাস ছিল না, তার প্রমাণ বহু বহু শতাব্দীর মুসলমান-শাসনের পরেও পৌনে দুই শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের পরেও আমাদের সামাজিক আচার-বিচারের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ কর্চ্ছে। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কেবলই একটা স্বপ্নাবেশ নয়, এটা ভারতীয় জীবন-গগনের মধ্যাহ্নকালের ভাস্বর সূর্য্য।

বক্তৃতা তিন ঘণ্টাকাল হইল।

এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল

রাত্রে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সম্পাদক মহাশয় আসিলেন একটী প্রার্থনা লইয়া। তিনি বলিলেন,—স্বামীজী, আপনার কলিকল্মষাপহ মধুর উপদেশে কারমাইকেল কলেজ, টাউন হল, টাউন হলের ময়দান সব পবিত্র হ'ল। আর আমাদের এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলটা পুণ্যপাদস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাক্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আপনাদের যখন এতই আগ্রহ আর আমার প্রতি এতই ভালবাসা, তখন দয়া ক'রে

প্রচারটা ক'রে দিন যে, কালকের ভাষণ আপনাদের হলেই হবে। হলটা কোথায়?

—হলটা টাউন হলের অতি কাছে। তবে, এটা ত' জানা কথা যে, আমাদের হলে লোক ধরবে না। পরের দিন থেকে আপনি আমাদের হলের সম্মুখস্থ মাঠেই ভাষণ দেবেন, সেই ব্যবস্থা কর্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি স্মিতহাস্যে সম্মতি জানাইলেন।

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারী

এই সময়ে রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সমীপস্থ হইলেন। তিনি বলিলেন,—ইনি হচ্ছেন এখানকার ফুটবল-অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারী এবং বহুখ্যাত ক্রীড়াবিদ্। ইনি একটী আর্জ্জি নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কৌতুকের সহিত বলিলেন,—কেন? আমাকে ফুটবল খেলতে হবে নাকি?

সেক্রেটারী মহাশয় করজোড়ে নিবেদন করিলেন,—রক্ষা করুন বাবামণি। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে যে খেলা খেলছেন তারই ঠেলা সামলাতে জান কাবার। জেলার সবগুলি ফুটবল টিমের চলেছে এখন প্রতিযোগিতা। কালকের খেলার ফরোয়ার্ড সেণ্টার আপনার বক্তৃতা শুনতে এসেছিল, সময়মত মাঠে

পৌঁছে নি। ফলে নামী একটা দল হেরে গেল। প্রধান খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে সাবৃষ্টিটিউট দিয়ে কি খেলা জেতা যায়? আজকের খেলার গোলরক্ষক মাঠে হাজিরই হয় নি। তন্ময় হ'য়ে আপনার বক্তৃতা শুনেছে। আপনাকে বাবামণি ভাষণের সময় বদলাতে হবে। নইলে ক্রীড়ামোদীদের সর্ব্বনাশ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভালো কথাই ত'। কাল থেকে আমি বিকাল পাঁচটায় বক্তৃতা আরম্ভ করব।

এডোয়ার্ড মেমোরিয়ালের সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়া গেলেন তিনি বিনা বিলম্বে সময়-পরিবর্ত্তনের খবর সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিবেন। তাহা তিনি করিলেনও।

রংপুর

১৩ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪২

(২৯শে জুলাই, ১৯৩৫)

অদ্য এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে স্বাভাবিক কারণেই বক্তৃতাটি সংক্ষিপ্ত হইল। হলে মানুষের স্থান-সঙ্কুলান হইতেছিল না। মাঠে বাহির হইবার মতন আকাশের অবস্থাও ছিল না। শ্রীশ্রীবাবামণি এক ঘণ্টাতেই তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন। সভাস্থলে অধিকাংশ সজ্জনেরাই সস্ত্রীক যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" সম্পর্কে বিশদ ভাবে বলিলেন। বক্তৃতার কোনও নোট রাখা হয় নাই। বক্তৃতা শেষ করিয়া প্রাক্মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়া দিলেন যে, আগামী দিন হইতে বক্তৃতা হইবে এডোয়ার্ড

মেমোরিয়াল হলের বাহিরের বিস্তীর্ণ মাঠে, আকাশের অবস্থা যেমনই হউক, হলে ফিরিয়া আসা হইবে না।

বক্তৃতা বনাম সিনেমা

স্থিতিস্থানে ফিরিয়া আসিলে রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সহ কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করিলেন। সকলের পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর নিবেদন করিলেন যে, বক্তৃতার সময় আরও কতকটা পিছাইয়া না দিলে সিনেমা হলের বড় আর্থিক ক্ষতি হয়। টাউন হলটাতেই অপরাহ্নে প্রত্যহ সিনেমার ছবি দেখান হয়। এজন্যই ১১ এবং ১২ শ্রাবণের ভাষণ সিনেমা আরম্ভের সময়টা বাঁচাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু অদ্য যে সময়ে বক্তৃতারম্ভ হইল, তাহাতে সিনেমাদর্শনার্থী অর্দ্ধেক লোকই সিনেমায় না ঢুকিয়া এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে ভিড় করিয়াছেন। হলে স্থান-সঙ্কুলান না হইলে কি হইবে, বক্তার কম্বুকণ্ঠ বাহিরের মাঠে দাঁড়াইয়া ঝিরিঝিরানি বৃষ্টির মধ্যেও সকলে আগ্রহ সহকারে শুনিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি এতবড় একটা অসাধারণ বক্তা হ'য়ে গেছি, এটা আমার জানাই ছিল না। জানা থাক্‌লে কি আর সিনেমা-হলের কাছাকাছি কোথাও ভাষণ দিতে দাঁড়াতাম? কিন্তু এখন উপায় কি? আমি যে

অনেক দিন ধ'রে বক্তৃতা দিয়ে যাব, একথা প্রচার ক'রে ব'লে দিয়েছে। বক্তৃতা-মালা ত' বন্ধ করা যায় না।

রায় বাহাদুর বলিলেন,—উচিতও হবে না। কারণ, যে অসাধারণ শিক্ষা জনসাধারণ আপনার ভাষণ থেকে পাচ্ছে, তা' তা'দের বহু ভাগ্যের ফল। বক্তৃতা চল্‌বেই। এখনি আমি লোক লাগিয়ে দিচ্ছি, পাড়ায় পাড়ায় আর ঘরে ঘরে গিয়ে ব'লে আসুক যে, সময়টা আরও আধঘন্টা পিছিয়ে যাবে। অর্থাৎ সিনেমা-শো আরম্ভ করারও আধ ঘন্টা পরে আপনার ভাষণ শুরু হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি সম্মত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল কর্মী চারিদিকে বাহির হইয়া গেলেন এই বার্ত্তা প্রচার করিতে।

বাগ্মিতার উৎস ও সার্থকতা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—স্বামীজী, আপনি এই অত্যদ্ভুত বাগ্মিতা পেলেন কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পেলাম ভগবচ্চরণে বিশ্বাস আর নির্ভর থেকে। সব ধ্বনি, সব অর্থ, সব বাক্য, সব শাস্ত্র একজনের কাছ থেকেই এসেছে, যাকে লোকে নাম দিয়েছে পরমেশ্বর। তাঁতে যার নির্ভর, জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি বাগ্মিতা ও দক্ষতা সবই তার আসে। আমরা বিশ্বাস কত্তে যখন অক্ষম হই, নির্ভর কত্তে যখন পারি না, তখন নিঃশক্তি হই। কিন্তু

কথা ব'লে মানুষকে খুশি করার ভিতরেই বাগ্মিতার সার্থকতা নেই, বাগ্মিতার সার্থকতা পরমেশ্বরে আত্মনিবেদনে। কাদের আমি কথা শুনাই? যারা আমার কাছে নানা বিষয় শিখবে, তাদের? না, যাদের ভাল কথা শুনানোর মধ্য দিয়ে আমি আমার পরমেশ্বরের পূজা করি। বাগ্মিতা যখন পূজা, তখনি সে সার্থক। অন্য সময়ে বাগ্মিতা যশোবর্দ্ধক এক রিপুমাত্র, যার কবলে পড়লে অহঙ্কার ঘাড়ে চেপে বসে এবং দন্তপংক্তি বসিয়ে দিয়ে স্কন্ধরক্ত পান করে।

রংপুর
১৪ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(৩০শে জুলাই, ১৯৩৫)

মনকে বিশ্রাম দাও

অদ্য প্রাতে আট ঘটিকায় রায় বাহাদুরের বাড়ীর অন্দর-মহলের চত্বরে গিয়া বসিতে হইল। কারণ, কাল যে সব মহিলারা বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কিছু ব্যক্তিগত উপদেশ পাইবার প্রত্যাশায় আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনকে জিজ্ঞেস করবে যে, কোন্ কাজটা ভাল। মন বিনা দ্বিধায়, বিনা তর্কে যে কাজটীকে ভাল ব'লে পরামর্শ দেবে, সেটা তুমি নিশ্চিন্তে কত্তে পার। যে কাজে মনে দ্বিধা আসে, তার সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কালক্ষেপ করা ভাল। কারণ, মানুষের মন

সব সময় সুস্থ নাও থাক্‌তে পারে, অনেক সময়ে মন থাকে রুগ্ন ও দুর্ব্বল। তখনকার মন প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়ার যোগ্য পাত্র নয়। বিশ্রামে মনের রুগ্নতা কমে। মনের এই বিশ্রামকে যোগীদের ভাষায় বলা হয় প্রত্যাহার। মনকে বিশ্রাম দেওয়ার অনেক উপায় আছে, শ্রেষ্ঠ উপায় ভগবানের নাম অবিরাম স্মরণ। সারাদিন সারা রাত মানুষের মন বড় চঞ্চল ও উদ্দাম। এই জন্যই মনের নাই বিশ্রাম। বিশ্রাম নেই ব'লেই সে নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা হ'তে পারে না। তাই তার সিদ্ধান্তে, তার নির্দ্দেশে অনেক সময়ে ভুল থাকে। ভগবন্নামের সাধন ক'রে ক'রে তাকে বিশ্রাম দেওয়ার অভ্যাসটী রাখলে মন ক্রমশঃ ধীর, স্থির, অচঞ্চল ও নির্ভুল বিচারে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়। অন্য কোনও মহত্তর প্রয়োজনে যদি নাও কর, তবু এই একটী প্রয়োজনের দাবীকে মিটাবার জন্যই প্রত্যেক মানুষের সাধ্যমত ভগবৎসাধন করা লাভজনক। লাভ লোকসানের দিক্ দিয়ে যদি বিচার কত্তে হয়, তবে প্রকৃত হিসাবী লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পার্‌বে যে, ভগবানে নিয়মিত ভাবে আত্ম-নিবেদনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে লাভই ষোল আনা, লোকসান কিছুই নেই।

মনে, বনে ও কোণে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, ভগবানের নাম করা আর নামের ঘটা করা এক কথা নয়। পরমেশ্বরের সঙ্গে

মনের যোগাযোগ-সাধন একটা আভ্যন্তরিক ব্যাপার। ওটাকে বাইরের ভড়ং, রং-তামাসা, আড়ম্বর ও প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত ক'রে একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ডে পরিণত কর্ল্লে লাভের অঙ্কটা যায় কমে এবং লোকসানের অঙ্কও কিছু ওঠে জমে। মহতেরা বলেছেন, সাধন করবে মনে মনে, বনে গিয়ে বা কোণে ব'সে। তার মানে এই নয় যে, গৃহ ত্যাগই কত্তে হবে, শ্বাপদের সঙ্গ করা চাইই চাই, অন্য লোকের দৃষ্টির অগোচর অন্ধকার খুঁজে না নিলে চল্‌বে না। তার মানে এই যে, পরমেশ্বরের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন ক'রে নেবার জন্য যেটুকু নির্জ্জনতা প্রয়োজন, তা' তোমাকে অবলম্বন কত্তে হবে।

ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ সুফল ও সমবেত উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বরের সাথে গোপন প্রেমানুশীলন জমে ভাল, নীরব প্রেমানুশীলন বাহিরের নানা আবল্য থেকে দেয় মুক্তি। কিন্তু বহুকে নিয়ে বা সকলকে সাথে ক'রে ঈশ্বরার্চ্চনার অন্য একটা প্রত্যক্ষ-গোচর সুফল আছে। সেইটী হচ্ছে বিমল সাত্ত্বিক ঐক্যের সৃষ্টি। বারোয়ারি দুর্গোৎসব আদির দ্বারা হিন্দুর ঐক্যবদ্ধ ঈশ্বরোপাসনার একটা সুযোগ কয়েক শত বৎসর ধ'রে হ'য়ে আস্‌ছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, দেবীর নিকটে আত্মনিবেদন-মূলক

মন্ত্রগুলি প্রায় সবই পুরোহিত ঠাকুর পড়ে থাকেন, সমাগত ভক্তদের তাতে অংশ অত্যল্প। সমাগত জনতা কেবল বাহ্য আড়ম্বর গুলির, হুজুগ গুলির, হৈ চৈ গুলির থাকে অংশীদার। এতে প্রকৃত সাত্ত্বিক ভক্তি বা ঐক্যবদ্ধ ঈশ্বরানুগত্যের অনুশীলন এত কাল ধ'রে কতটা হ'য়ে এসেছে বা ভবিষ্যতে কতটা হ'তে পার্ব্বে, তা' নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, তর্কের পথও খোলা। মুসলমানের কালী নাই, দুর্গা নাই কিন্তু আল্লা আছেন। সেই আল্লার কাছে আত্মনিবেদন করার জন্য সবাই ওঁজু ক'রে এসে এক স্থানে দাঁড়িয়ে যান, এক সঙ্গে শত জনে সহস্র জনে, কোনো কোনো সময়ে লক্ষ জনে পবিত্র মনে ঈশ্বরোপাসনা ক'রে যান। এটার দ্বারা আধ্যাত্মিক সুফল ও সামাজিক সুফল উভয়ই তাঁরা এক সঙ্গে পেয়ে যান। এটা যে তাঁদের কত বড় এক সৌভাগ্য, তা' বল্‌বার নয়। আমাদের বা তোমাদের তা' নেই। আমরা বা তোমরা পরমেশ্বরকে যার যার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কত্তে পারলেই খুশী, আমাদের ধাতের মধ্যেই এই ভাবটা নেই যে, আমার পরমেশ্বরকে আমি বিশ্ববাসী সকলের পরমেশ্বর-রূপে দেখ্‌ব, ভাবব, অর্চ্চনা কর্ব্ব, এক পরমেশ্বরের চরণতলে সবাই এক সঙ্গে একমনে এক প্রাণে একহৃদয় হ'য়ে আত্মসমর্পণ কর্‌ব। আমাদের মধ্যে এই ভাবটার খুবই অভাব যে, সকলে একজনের চরণে আত্মদান ক'রে পরস্পর পরস্পরের আপন

হব, নিকট হব, একের সাথে অন্যের দূরত্ব দূর ক'রে দিব। প্রত্যেক ব্যক্তিগত উপাসনায় রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই চিন্তাটীও কত্তে হবে। নতুবা ধর্ম্মচর্য্যার পূর্ণাঙ্গ সুফল আমরা আহরণ কত্তে পার্ব্ব না। সমবেত উপাসনা ধর্ম্মচর্য্যার পূর্ণাঙ্গ সুফল প্রদানের ক্ষমতা রাখে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় আগ্রহী কুমারীকে সমবেত উপাসনার স্তোত্রসমূহের সুরশিক্ষা প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের মাঠে বিশাল এক জনতার সমক্ষে শ্রীশ্রীবাবামণির পঞ্চম বক্তৃতা সুরু হইল।

সদ্ধর্ম্মের অল্পও ভাল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহে, মনে, প্রাণে পাঁচ মিনিটের যে ব্রহ্মচর্য্য, সেটাও ব্রহ্মচর্য্য। সেটাও তোমার জমার খাতার অঙ্ক। সারাদিন নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে কালকর্ত্তন ত' কচ্ছ, তাতে কি? মদের দোকানে চাকরী কর্ল্লে মাতালের সংস্পর্শ আসেই। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কারো উপায় নেই। মেছুয়ার বা কুম্ভকারের জীবিকা নিলে গায়ে জল-কাদা-মাটি লাগবেই। এমন কি রুই-কাতলা ছাড়া যদি মাছ নাও ধর,—এমন কি দুর্গাপ্রতিমা ছাড়া অন্য কোনো জিনিষ যদি নাও গড়। বাজারের বেশ্যাপল্লীর কাছখানটাতে যার নিরামিষ তরি-তরকারীর দোকান, তাকে

বাধ্য হ'য়েও অনেক সময়ে কু-দৃশ্য দেখতে হয়, তার কাণে অনিচ্ছাতেও নানা অনভিপ্রেত কুকথা প্রবেশ করে। এর ফলে তার চিত্ত-বিকলন হতেই ত' পারে। কিন্তু উপায়ান্তর না থাক্‌লে তাকে ঐখানেই ঐ জীবিকা নিয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দগ্ধোদর ও সংসার চালাবার জন্য থাকতেই হবে। তখন তার আর ভরসা কি? হয়ত সে একদিন ঝড়ের একটা ঝট্‌কায় বিক্ষিপ্ত হ'য়ে সাগরের কোন্ তীর থেকে কোন্ তীরে চলে যাবে, তার ঠিকানাই নেই। আমি বলি, তবু তার ভরসা আছে। সে ভরসা হচ্ছে স্বল্পতম ধর্ম্মের চূড়ান্ত রক্ষণ-শক্তি। গীতায় বলা হয়েছে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ, ধর্ম্মের এককণাও যদি খাঁটি হয়, তবে তা' মহৎ ভয় থেকে পরিত্রাণ করে। কত গণিকা ত' শহরের রঙ্গমঞ্চে কত রকমের অভিনয় ক'রে লোকরঞ্জনার্থ কত চারুকলার নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছে। এদের প্রত্যেককে দেখেই কি তোমার মনে দারুণ পাশবিক ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জাগে? না, তা জাগে না। এদের প্রত্যেককে দেখেই কি তোমার মনে অনবদম্য রিরংসার উৎপত্তি হয়? না, তা' হয় না! এরা বারবণিতা, কাঞ্চনমূল্যে এদের উপরে অধিকার স্থাপন করা যায়, এই কথা ভেবে কি সর্ব্বক্ষণ তার স্ত্রী-অঙ্গের কল্পিত ছবি তোমার মনে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠে? না, তা' উঠে না। এদের অনেকের মুখের পানে তাকিয়ে তোমার নিজের মায়ের স্নেহ কোমল স্নিগ্ধ দৃষ্টির

কথাও জেগে ওঠে। এই যে উঠে, এটাই তোমার মরুভূমির ওয়েসিস্। সবাই যাকে বারবণিতা ব'লে ভাবছে, তাকে যে নিমেষের জন্যও তুমি মা ব'লে ভাবতে পার্লে, এইটুকুই তোমার সেই স্বল্পধর্ম্ম, যা' তোমাকে মহৎ ভয় থেকে পরিত্রাণ দিতে সমর্থ। স্বল্পধর্ম্মে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাক্‌লে আস্তে আস্তে তা' মহদ্ধর্ম্মের কলেবর ধারণ করে। তখন সে মহৎ ভয়ের চেয়েও মহত্তর ভয় থেকে ত্রাণ দিতে পারে। তোমরা স্বল্পকালীন, স্বল্পপরিমাণ স্বল্পচেষ্টায়-অনুষ্ঠিত প্রকৃত ধর্ম্মের বিশাল, বিরাট, অভাবনীয় সম্ভাবনার কথা কখনো ভুলে যেও না। যজ্ঞ কত্তে হবে ব'লেই একেবারে রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞই চাই, এমন জেদের কোনো আবশ্যকতা নাই। দৈনিক দুমিনিট পাঁচ মিনিট ক'রে নীরবে জপযজ্ঞ কর্ল্লেও সেটা যজ্ঞই বটে, তবে বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্মকার্য্য নয়, সেটা অনাড়ম্বর স্বল্পধর্ম্ম। স্বল্পধর্ম্মে লগ্ন হ'য়ে থাকতে থাকতে বৃহদ্ধর্ম্ম, মহদ্ধর্ম্ম, নিঃসীম পরমধর্ম্ম সবই আপনা আপনি আয়ত্ত হবার পথে আসবে। সদ্ধর্ম্মের অল্পও ভাল। এই জন্যই বলি, যে যেই অবস্থায় আছ, পরিবেশের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য কিছুকেই গণনায় না এনে, নিজ নিজ শক্তি-সাধ্যানুযায়ী একটু একটু ক'রে হলেও ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে যাও। কাল যার দেহ-সম্ভোগ ক'রে নরকের পঙ্ক-পল্বলে ডুবেছ, আজ তাকে মা ভেবে তার কাছ থেকে দেহ এবং মনকে সরিয়ে আনার সাধ্য পশুর নাই, কিন্তু মানুষের আছে।

মানুষের জন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-চিন্তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ যে কত দিক দিয়ে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও জলচরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এই কথাটা মানুষ মনে রাখে না ব'লেই ত' তার বারংবার এত পদস্খলন। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ একমাত্র নিজের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা ভাবতে পারে না। উন্নত শ্রেণীর দুই একটা প্রাণী যাও বা একটু আধটু ভাবতে পারে, তাও তার এতই সীমাবদ্ধ যে, অদূর ভবিষ্যৎ ছাড়া সুদূর ভবিষ্যতের উপরে তার কোনো প্রভাব ধারণায় আনা যায় না। মানুষ অতীতকে চিন্তা ক'রে খুঁজে বের কত্তে পারে এবং পেরেছে, মানুষ ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিষয় ভেবে নক্ষত্রের বেগে তার নিত্য নূতন অনুসন্ধানের কাজে ছুটে চলেছে। সেই মানুষ একটুখানি ভোগ-বাসনার বন্ধনে বন্দী হ'য়ে, পঙ্গু হ'য়ে, খঞ্জ হ'য়ে বা অন্ধ হয়ে কাল কাটাবে, এটা সম্ভব নয়। এই জন্যই তোমাদের জন্য ধর্ম্ম, এই জন্যই তোমাদের জন্য ধর্ম্ম-চিন্তা।

ধর্ম্ম সনাতন ও শাশ্বত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, ধর্ম্ম আর পৌরোহিত্য-তন্ত্র, ধর্ম্ম আর গুরুবাদ, ধর্ম্ম আর অবতার-বাদ, ধর্ম্ম আর পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মের নামে গোপন ও প্রকাশ্য ব্যভিচার, ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নামে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের

উপরে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উৎপীড়ন ও অত্যাচার, ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নামে ব্যক্তিগত নরবলি বা সামূহিক হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি নিয়ে অনেক রকমের আলোচনার অবকাশ আছে। এই সকল বিষয় নিয়ে বিপক্ষে ও স্বপক্ষে শত শত সহস্র সহস্র বক্তা, লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতারা চিরকাল নানা কথা ব'লে এসেছেন, এবং চিরকাল ব'লে যাবেন। কিন্তু তাতে ধর্ম্মের আবশ্যকতা-বোধকে মানুষের মন থেকে উৎখাত ক'রে দেওয়া যাবে না। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী লোকদের মুণ্ডগুলি যদি বারংবার পরশুরামের ক্ষত্রিয়-নিধনের মতন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়াও হ'তে থাকে, তবু জগতে ধর্ম্মের প্রয়োজন থাক্‌বে এবং তার দরুণই ধর্ম্মের, ধর্ম্মবোধের, ধর্ম্মানুশীলনের অস্তিত্ব লুপ্ত করা যাবে না। এই জন্যই বলা হ'য়ে থাকে যে, ধর্ম্ম সনাতন বস্তু, ধর্ম্ম শাশ্বত।

ব্রহ্মচর্য্যই সত্য ধর্ম্মের মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সনাতন বা শাশ্বত কোন্ ধর্ম্ম? কোন ধর্ম্ম অনন্ত কাল বিরাজিত থাকবে? কোন্ ধর্ম্ম কিছুতেই বিলুপ্ত হবে না? সেই ধর্ম্ম আত্মশুদ্ধির ধর্ম্ম, নির্বিদ্বেষ পরোপকারের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপালনের ধর্ম্ম,—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বের মাঝখানেও পথ-প্রদর্শন ক'রে মানুষকে শান্তি, মৈত্রী, প্রীতি ও ঐক্যের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে

যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের মূল বনিয়াদ ব্রহ্মচর্য্যে। এই জন্যই আমি কোনও ধর্ম্মমতবিশেষের প্রশংসায় বা নিন্দায় সময় নষ্ট করি না। আমি বলি, যে যতটুকু পার, সংযমী হও, জিতেন্দ্রিয় হও, ব্রহ্মচারী হও। সংসারী বা সন্ন্যাসী, কুমারী বা বিবাহিতা, সধবা বা বিধবা, স্বাবলম্বী বা পরনির্ভর, দুর্ব্বল বা সবল, অর্থবান্ বা নির্ধন, বিদ্বান্ বা মূর্খ প্রত্যেকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টায় অবহিত হও। এই একটী নিষ্ঠাকে জীবনের মধ্যে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে তোমার জীবনে মহামহীরুহের শাখা-প্রশাখার মতন নিজ কল্যাণ ও জীবকল্যাণ স্বাভাবিক ভাবে এবং স্ফুটতম-রূপে বিকশিত ও বিস্তারিত হ'য়ে উঠবে।

অব্রহ্মচর্য্যে দেশ ও জাতির ক্ষতি, ব্রহ্মচর্য্যে দেশ ও জাতির লাভ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অত্যাধুনিক রুচির লোকেরা অবশ্যই বল্‌বেন,—ধ্যাত্তোর ব্রহ্মচর্য্য। ওতে কি হয়? অমুক মহাপণ্ডিত বেশ্যাবাড়ী যেতেন, কিন্তু চল্লিশটা ভাষায় বিদ্যার্জ্জন করেছিলেন, অব্রহ্মচর্য্যে তার কি ক্ষতি করেছে? অমুক বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মদও খেতেন, পরস্ত্রীও পোষণ কর্ত্তেন, কিন্তু নেতৃত্বে, দানে, বাগ্মিতায় পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন, অব্রহ্মচর্য্যে তার কি ক্ষতি হয়েছে? অমুক মহাপুরুষ পাঁচ লক্ষ শিষ্যের গুরু, তিনি কুমারী মেয়ে পেলেই কপালে সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়ে বিয়ে

ক'রে ফেলেন, বিবাহিতা স্ত্রীও হয়ত কয়েকটী আছে, অব্রহ্মচর্য্যে তার কি ক্ষতি করেছে? অমুক বিখ্যাত দার্শনিক নিজের স্ত্রীকেও দিয়েছেন স্বাধীনতা, নিজেও স্ত্রীর পরোয়া রাখেন নি, অবাধ যৌন-জীবন-যাপন করেও তিনি সারা পৃথিবীর যশ কুড়িয়েছেন নিজ চিন্তাপ্রণালীর বিশিষ্টতার দরুণ। অমুক মহাকবি কলকাতার নষ্টা নারীদের পল্লীতে ব'সে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রচনা করেন, অব্রহ্মচর্য্যে তার কবিত্ব ত' মলিন হয় নি! রেখে দাও তোমার ব্রহ্মচর্য্যের বুলি। ও ত' ভণ্ডামি মাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ, স্কচ, শিখ, পাঠান আর গুর্খা সৈন্যেরা দলে দলে ছুটে যায় রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট, পিছে পিছে থাকে নার্স-নামধারিণী নারীর দল, যাদের প্রকৃত কাজ গণিকা-বৃত্তি, বাইরের ভেক রুগ্নসেবিকার। সঙ্গে সঙ্গে থাকে দলে দলে সামরিক ডাক্তার, যারা সৈন্যদের গণোরিয়া-সিফিলিসের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর হ'য়ে ঔষধ দিচ্ছেন, মেথেলিন· ব্লু আর নিওস্যালভার্শান। কৈ, অব্রহ্মচর্য্যের দরুণ ত' যুদ্ধজয় আটকাল না! কোন্ দেশে ইংরেজরা গিয়ে এসব সৈন্যদলের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধজয় ক'রে নি, বল ত'!—যুক্তিগুলি শুন্‌লে মনে হবে, সত্যই ত'! ব্রহ্মচর্য্যের মতন এমন একটা প্রহসন আর কি হ'তে পারে? কিন্তু এত সব বলার পরেও দেখা যাবে যে, রাজা যযাতির মতন ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা সমগ্র পৃথিবীকে ডেকে তারস্বরে ব'লে বেড়াচ্ছেন,—ন জাতু কামঃ কামানাং

উপভোগেন শাম্যতি, কামের উপভোগের দ্বারা কামনার তৃপ্তি সাধন সম্ভব নয়, অতএব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। তোমার অব্রহ্মচর্য্যে যদি তোমার কোনও ক্ষতি নাও হয়, সমাজের ক্ষতি হয়, দেশের ক্ষতি হয়, জাতির ক্ষতি হয়। তোমার ব্রহ্মচর্য্য পালনে যদি তোমার কোনো লাভই নাও হয়, তবু তাতে দেশের, সমাজের বা জাতির যে ক্ষতি কিছুই হচ্ছে না, এটা কি কম কথা?

ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব, এযুক্তি অকাট্য নয়। ব্রহ্মচর্য্য অলাভজনক, এ যুক্তিও অকাট্য নয়। ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব কিনা এবং লাভজনক কিনা, তার পরীক্ষা একটু অধ্যবসায়ী হ'লেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা হ'য়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি অভ্যাসের দোষে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অক্ষম, তারও যদি অন্তরে এই বিষয়ে রুচি থাকে, তাহ'লে সে পরোক্ষ ভাবে সমাজের হিতসাধন ক'রে থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমায় যার বিশ্বাস আছে, সে নিজের অজ্ঞাতসারেই সমাজের পরম-কুশলের একজন সংরক্ষক। দেশের উন্নতিকল্পে, জাতির অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে যে-দিক দিয়েই যিনি যে আন্দোলন করুন না কেন, ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আস্থাশীলতা তাঁর আন্দোলনকে বল দেবে, স্থায়িত্ব দেবে, গভীরতা দেবে, ব্যাপকতা দেবে। ইন্দ্রিয়লালসাতুর ভোগলুব্ধ আন্দোলন-

কারীদের নিষ্ঠা হয় ক্ষণভঙ্গুর, বিচার-শক্তি হয় অসহিষ্ণু এবং চেষ্টা হয় হুজুগপ্রয়াসী। এই বিপদ থেকে দেশকে বাঁচাতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্যের জন্যই একটা ব্যাপক আন্দোলন দেশ-জুড়ে সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বক্তৃতা তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন দীর্ঘ বক্তৃতাও শুনিবার কালে একটী প্রাণী একটু ফুস্‌ফাস শব্দও করিলেন না বা স্থানত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন না।

রয়েল বেঙ্গল সার্কাস

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি স্থিতিস্থানে পৌঁছিয়া দেখেন যে, রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের ম্যানেজার মহাশয় প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি যদি তিন ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে সার্কাস-কোম্পানীর নিদারুণ ক্ষতি হয়। কারণ, সার্কাসের লোকেরা টিকিট কিনিয়াও সার্কাস-প্যাণ্ডেলে না প্রবেশ করিয়া বক্তৃতাস্থলেই ঘাসের উপরে বসিয়া যায়। ম্যানেজার মহাশয় আরও বলিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি যদি বিকাল ছয়টায় বক্তৃতারম্ভ না করিয়া সাড়ে পাঁচটায় আরম্ভ করেন, তবে তাহা আরও ভাল হয়।

অনেক আলোচনার পরে স্থির হইল যে, ফুটবল অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত পরামর্শান্তে

আগামী কল্যের সভার সময় প্রচার করিয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ত' এখানে কারো ক্ষতি কত্তে আসিনি, কিন্তু আমার অজানিতে কোনো দিন সিনেমার, কোনো দিন ফুটবলের, কোনো দিন বা সার্কাসের ক্ষতি হচ্ছে জেনে আমি বড়ই দুঃখ অনুভব কচ্ছি।

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—আমার জীবনে এরূপ দৃশ্য দেখার ঘটনা এই প্রথম। এমন কোনো বিখ্যাত বক্তা নেই, যিনি এই রংপুরে আসেন নি। কিন্তু সিনেমা, ফুটবল, সার্কাস সব-কিছুকে দাবিয়ে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষকে আকর্ষণ ক'রে রাখার মত বক্তৃতা কেউ কল্পনাও কত্তে পারে না। এ শক্তি আপনি কোথায় পেলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অত ক'রে আর বল্‌বেন না। জানেন না বুঝি, ঋষির পতন কামে, রাজার পতন ক্রোধে, ব্রাহ্মণের পতন লোভে, আর বক্তার পতন অহংকারে?

রংপুর

১৫ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪২

(৩১শে জুলাই, ১৯৩৫)

একজন স্থানীয় ভদ্রলোক আসিয়া নানা বিষয়ে নানা খুটিনাটি বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মনে হইল, সদিচ্ছাপ্রযুক্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণি সরল মনে অনেক কথাই বলিলেন। ঐতিহাসিক সত্য বিবরণ হিসাবে তন্মধ্যে কিছু অংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল। কত পরিপন্থী

অবস্থায় পুপুন্‌কীতে তাঁকে যে কাজ করিতে হইয়াছে, ইহা হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে।

পুপুন্‌কী আশ্রমে আত্মপরিচয় লাভ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন একটা দেশে আমার পুপুন্‌কী আশ্রমটী স্থাপিত হয়েছে, যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সাহসের, আর তার পরেই প্রয়োজন ধৈর্য্যের। সাহস কেন? প্রথমতঃ সাপ। এত খরিশ সাপ অন্য কোনো দেশে দেখিনি। খরিশ মানে গুখ্‌রা সাপ, যে সাপকে আমাদের দেশে বলি জাতি সাপ। ঘরে সাপ, বাইরে সাপ, শুতে সাপ, বেড়াতে সাপ। একদিন এ সাপ থাক্‌বে না, কিন্তু এখন ত' ভয়েরই কথা। তারপরে হচ্ছে ডাকাত। এক কথায় মাথা কেটে নেবার লোক অগুন্‌তি। তুচ্ছ স্বার্থের জন্য খুন ক'রে দিতে দ্বিধা নেই। কোনো স্বার্থ নেই, এমন ব্যাপারেও নরহত্যায় কুণ্ঠা নেই। হাটে বাজারে টাইংলা, মানে পরশু, বিক্রী হচ্ছে। কিনে নিয়ে তার ধার পরীক্ষার জন্য অপরিচিত পথিকের মুণ্ডচ্ছেদের ঘটনা এদেশে আছে। ধৈর্য্যের প্রয়োজন কেন? কোনো জিনিষ কিনেই আর কুলাতে পারি না। কালকে গ্লাসটা কিন্‌লাম, পরশু বাটিটা কিনেছি। হঠাৎ দুটাই হাওয়াতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কে নিল? নিশ্চয়ই চোরে নেয় নি। বলতে হবে, এসব হচ্ছে ভূতুড়ে কাণ্ড। আমরা সাধন-ভজন করি না, ধ্যান-তপস্যা করি না, করি শুধু গাঁইতি

কোদাল নিয়ে কাঁকরমাটির বক্ষোবিদারণ, আমাদের জিনিস-পত্র ভূতে নেবে না ত' কারটা নেবে? ভূতকে মানতেই হয়, কারণ তাকে কখনো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু একবার নিল, দুবার নিল, দশবার নিল, তখন কি করি? ভূতের উপরে রাগ ক'রে ত' আর মাটিতে ভাত খেতে পারি না। ভূতের উপরে রাগ ক'রে মাটির কলসী উল্টে দিতেও পারি না। সুতরাং আবার কিন্‌তে হ'ল থালা, বাটি, গ্লাস। লোটা আর কম্বল, দোয়াত আর কলম কতবার যে কিন্‌লাম আর খোয়ালাম, তার সীমাসংখ্যা নেই। একখানা কাপড় দু-টুকরা ক'রে পরি, সুতরাং মনে করি, এটার উপরে ভূতের উৎপাত হবে না। কিন্তু হায়, পরবার বস্ত্র, গায়ে দেবার কম্বল, নীচে পাতবার তোষক সবই হঠাৎ হঠাৎ উধাও হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামগুলি থেকে যারা আশ্রমে আসে, তারা ত' গরিব লোক, বিনা পয়সায় পেয়ে ঔষধ নিতে আসে, তারাই ভূত, এমন কথা মনে করাও পাপ। তবে জিনিষগুলি যায় কোথা? যেখানেই যায়, আবার কিন্‌তে হবে। এতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি নেই। কিন্তু যে ব্যাপারে ধৈর্য্য রাখা কঠিন, সেটী অন্যত্র। একশত চুয়াল্লিশটী কুমড়ার মাদা খুঁড়লুম। লালু মিঞা কাঁকর কেটে আড়াই মাস ধ'রে মাদাগুলির গর্ত্ত তৈরী কর্ম্ম নগদ দক্ষিণার বিনিময়ে। কাতরাসগড় গোশালা থেকে গোবর-সার কিনে এনে মাদা সাইট ক'রে নিয়ে বীজ বুনলুম। উৎকৃষ্ট সার ও নিরন্তর যত্ন দিতে দিতে একশত চুয়াল্লিশ মাদায় দুই শত

অষ্টাশিটী চমৎকার কুমড়া গাছের বোঁটায় বোঁটায় ফল এল। এক রাত্রে একটু বেশী ঘুমিয়েছিলুম, প্রাতে ঘুম থেকে উঠে দেখি, বৃত্রাসুরেরা এসে আমার এই নন্দন-কানন থেকে কমপক্ষে হাজার কুমড়া তুলে নিয়ে গেছে। গ্রামের লোকদের ডাক্‌লুম। তাঁরা বিশ্বাস কর্ল্লেন না। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ দেখালুম, বল্লেন,—আপনার রোগীরা কেউ এসেছিল অশক্ত অবস্থায়, তার গাড়ীর চাকা। তখন কুমড়া গাছের ভাঙ্গা বোঁটাগুলি গুণতে অনুরোধ কর্লুম। গোণা শুরু হ'লে দেখা গেল হাজার দেড়েক কুমড়াই ভূতে নিয়ে গেছে। সবাই কথাটা স্বীকার করলেন কিন্তু কোনো প্রতীকার হ'ল না। কোনো একটী লোকও বল্লেন না যে, আশ্রম যখন পরহিতার্থে, তখন আশ্রমের যাতে কেউ ক্ষতি না করে, এজন্য আমরা একটু প্রচার-কার্য্য কর্ব্ব। এসেছিলেন মানুষেরা দলে দলে আজব খবর শুনে, চলে গেলেন মানুষেরা অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের আশ্চর্য্যতর এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে। অবশ্য একটা সুফল সদ্যঃ সদ্যঃ আমি পেয়ে গেলাম এই যে, অবশিষ্ট কুমড়াগুলি তিন রাত্রির মধ্যেই ভূতের বাড়ী চলে গেল। বছর বছর গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে শাক-সব্জীর বীজ বিতরণ কচ্ছি, তারা কেউ একটু চেষ্টা কর্ল্ল না যে, এমন একটা কাণ্ড আর যাতে না হয়। সুতরাং ভেবে দেখ, ওখানে আশ্রম ক'রে কত ধৈর্য্যের আমার প্রয়োজন হয়েছে বা হবে। এদেশে চিনাবাদামের চাষ কেউ জানে না,

আমিই প্রথম ক'রে সফল হলাম, দৃষ্টান্ত দেখালাম। চিনাবাদাম আর শকরকন্দ আলুর ফসলে ঘর ভরা, এমন সময় একদিন রাত্রিকালে যাত্রাগান শুনে একদল লোক আশ্রমে অতিথি হ'য়ে রইল। সরল বিশ্বাসে তাদের জায়গা দিলুম। পরদিন ভোরে উঠে দেখি, কোথায় অথিথিরা, কোথায় বা চিনাবাদাম, কোথায় বা শকরকন্দ আলু! সব শূন্যে মিশে গেছে। মনের খেদে কথাটা আর গ্রামবাসীদের জানালামই না। কারণ, জানিয়ে ত' কোনো লাভ হবে না। জানিয়ে যে লাভ হয় না, এমন অভিজ্ঞতা আগেই একবার হ'য়ে গেছে। কৃষির সময়। বাগালেরা নিজ নিজ গরুর দল পাহারায় রাখে। কিন্তু শতাধিক গরু এনে সব আশ্রমের আবাদের উপরে চরাতে লাগল। বাধ্য হ'য়ে গরু তাড়াতে গেলাম। দলবদ্ধ হ'য়ে বাগালেরা আমাকে ঘিরে ফেল্‌ল ও অকথনীয় অপমান কর্ল্ল। এমন আর যাতে না হয়, তার জন্য গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গ্রামের এক নিম গাছের নীচে বস্‌লাম। দুঘণ্টা পার হ'য়ে গেল কিন্তু গ্রামের কোনো প্রভাবশালী লোক এসে একবার বাগালদের বল্‌ল না যে, এমন কাজ করা উচিত নয়। তাদেরই আমি বছরের পর বছর বিনামূল্যে ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি এবং যতকাল পারি দিয়ে যাব। সাত বছর ধরেই আশ্রমে তালবীজ এনে লাইন ক'রে লাগাচ্ছি। কি ক'রে যে ভূতেরা সব টের পায়। মাটিতে পোতা তালবীজকে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কখন যে তুলে নিয়ে ভূতের

দল খেয়ে শেষ করেছে, তা' ত' আজ পর্য্যন্ত ধরতেই পারিনি। তবু ঠিক করেছি, যতকাল জীবিত আছি, প্রতি বৎসর আম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল আমি গাছ যখন যেমন পারি, লাগিয়েই যাব এবং জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়েই যাব। বাধা পাচ্ছি ব'লেই একে ছেড়ে দেব না। এর আগে কত স্থানেই আমি আশ্রম করেছি আর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। আমার অভিক্ষা-ব্রতই আমাকে অধিকাংশ স্থান ত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য করেছে। কিন্তু পুপুন্‌কীর উপরে একটা মায়া পড়ে গেছে, এই জন্য যে, এখানকার লোক-বিরুদ্ধতায় আমি পরমেশ্বরকে নিয়ত আমার এত কাছে পাই যে, অন্য কোনও স্থানের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। চারিদিক থেকে সাহায্য, সহায়তা, অকপট প্রেম, স্নেহস্নিগ্ধতা, আনুগত্য এবং সহযোগিতা নিয়ে যদি মানুষেরা এখানে আসত, তাহ'লে আমি বোধ হয় আমাকে আর আমার পরমেশ্বরকে আমার এত কাছে কদাচ পেতাম না। এইখানকার দুঃখকষ্ট আমার কাছে আমার আত্মপরিচয় খুলে ধরেছে।

অভিক্ষা

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনের উপরে ভিত্তি ক'রে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব কিনা, এই বিষয়ে

সম্ভবতঃ কোনো পরীক্ষা কেউ করেন নি। এজন্যই আমার মনে হয়েছে যে, এর পরীক্ষাটা একবার হ'য়ে যাওয়া উচিত। লোকের উপকার যাঁরা কর্ব্বেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের যোগ্যতায় এবং নিজেদের পরিশ্রমের মহিমায় সঙ্গত ভাবে সদুপায়ে অর্থ অর্জ্জন ক'রে সেই অর্থ দ্বারা নানা সৎকার্য্য পদ্ধতিবদ্ধ-ভাবে কর্ব্বেন, এটা কোনো অন্যায় প্রস্তাব নয়। এরূপ প্রস্তাবে কারো বিরক্ত হওয়ার প্রয়োজনও নেই, অধিকারও নেই। একজন দুজন যদি এরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে তাতে আংশিক হ'লেও সাফল্য অর্জ্জন করেন, তবে তাঁদের দেখাদেখি আরও বহু শত সৎকর্ম্মী এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তে কর্ত্তে পারেন। সকল মানুষই গতানুগতিক পথে চলবে বা চলতে বাধ্য হবে, কেউ নূতন পথে চলবে না বা কাউকে নূতন পথ বের করার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে না, এটা কোনো কাজের কথাই নয়। আমরা যা' কচ্ছি, এটা নিতান্তই একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস। কিন্তু বড় বড় বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার ত' ছোট্ট এক একটা রসায়নাগারে বা বীক্ষণাগারেই হ'য়ে থাকে। ক্ষুদ্র, নগণ্য, তুচ্ছ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যদি কোনো সত্যের মূলসূত্রটী আবিষ্কৃত বা অনাবৃত হয়, তাহ'লে তার ভিত্তিতেই ত' ভবিষ্যতে বিরাট বিরাট যুগবিপ্লাবক আন্দোলনের জন্ম হবে। ভিক্ষা-সংগ্রহে আমার পরাঙ্মুখতাকে আপনারা আমার অভিমান, অহঙ্কার বা দর্প ব'লে ব্যাখ্যা করলে ভুল করবেন।

প্রলোভন হইতে দূরে থাক

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিরুদ্ধতা দেখ্‌লে তার ভয়ে পলায়ন না ক'রে জোর ক'রে নিজ কর্ত্তব্যে লেগে থাকাই প্রকৃত কর্ম্মীর পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু প্রলোভন দেখ্‌লে সেখানে দুঃসাহস করা উচিত নয়। অর্থের প্রলোভন, যশের প্রলোভন, রূপের প্রলোভন, ভোগের প্রলোভন যেখানে আছে, সেখান থেকে চেষ্টা ক'রে দূরে স'রে যাওয়াই শ্রেয়ঃ পন্থা। অনেকে বাহাদুরী ক'রে, প্রলোভনের মাঝেও যে তাঁরা অবিকারী থাক্‌তে পারেন, এইটা প্রমাণের আগ্রহ নিয়ে লেলিহান অগ্নি-শিখার মধ্যে ঝাঁপ দেন। জ্বালাময় অর্দ্ধদগ্ধ শরীরের অঙ্গার-রাশি অপসারণ কত্তে বাধ্য হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁরা বুঝতেও পারেন না যে, তাঁরা কত বড় ভুল করেছেন। হিতৈষী কেউ সদুপদেশ দিতে এলে তখন সেই মধুর উপদেশকে কালকূট ব'লে জ্ঞান হয় কিন্তু প্রলোভনের জালে আটক পড়ার পরে যখন হুঁশ্ ফিরে আসে, তখন আর আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না। এই জন্যই সাধু-সজ্জনেরা চিরকাল উপদেশ দিয়েছেন,—প্রলোভন হ'তে স'রে থাক, থাক শত যোজন দূরে।

অদ্য অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সম্মুখস্থ মাঠে শ্রীশ্রীবাবামণির ষষ্ঠ বক্তৃতা সুরু হইল।

এক দেহে তিন

বক্তৃতা সুরু হইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে একটী কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। গৈরিক-পরিহিত ত্রিদণ্ডধারী তুলসী-রুদ্রাক্ষ-ভদ্রাক্ষ-স্ফটিকাদির মালা-পরিহিত একজন পূর্ণ-বয়স্ক ভদ্রলোক জনতাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে একটী স্বপ্ন-বিবরণ বলিলেন। তিনি বলিলেন,—তিনি বিগত রজনীতে ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে জাগ্রত অবস্থায় আশ্চর্য্য একটী স্বপ্ন দেখিয়াছেন। একজন শুভ্রবস্ত্রধারী ভদ্রলোক বনের পথে হাঁটিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার মধ্যে মিশিয়া যাইব।" দেখিতে না দেখিতে দুইটী তনু মিলিয়া একটী তনু হইয়া গেল। শুভ্রবস্ত্রধারী বনের মধ্যে আরও কতক পথ অতিক্রম করিলে সহসা বৈকুণ্ঠ ধাম হইতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু আসিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার মধ্যে মিশিয়া যাইব।" দেখিতে না দেখিতে সেই দুইটী তনুও একত্র মিশিয়া গেল। শুভ্রবস্ত্রধারী অরণ্যের মধ্যে আরও অগ্রসর হইয়া চলিলে আচম্বিতে কৈলাস হইতে ত্রিশূলডম্বরুধারী মহাদেব আসিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন,—"আমি তোমার মধ্যে মিশিয়া যাইব।" দেখিতে না দেখিতে দুইটী তনু এক হইয়া গেল। এই তনুটী বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে শহরে আসিয়া প্রবেশ করিল। গৈরিক-পরিহিত ত্রিদণ্ডধারীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল এবং সকাল হইতে তিনি স্বপ্নদৃষ্ট

শুভ্রবস্ত্রধারীকে খুঁজিতে খুঁজিতে এই রংপুর শহরে আসিয়া বক্তৃতার মাঠে হাজির হইয়া সভাস্থলে বক্তাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন যে, ইনিই সেই পুরুষ, পর পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আসিয়া যাঁহার দেহের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন।

এই কথাগুলি বলিয়াই ভদ্রলোক দারুণ ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানা প্রবোধ বচনে তাঁহাকে শান্ত করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার ষষ্ঠ ভাষণ সুরু করিলেন। সভাপতিত্ব করিলেন রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমি সাধারণ মানুষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি সাধারণ মানুষ। নিতান্তই সাধারণ লোক আমি। আপনাদের প্রতি জনের মত আমি একেবারে আট-পৌরে। আমাকে নিয়ে কেউ যদি কোনো স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে সেই স্বপ্নের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই বা তার মধ্যে আমার কোনো কৃতিত্বও নেই। তবে অনুমান হচ্ছে এই যে, আমি নিজে অন্তরে অন্তরে যে সাধনা করি, যে সাধনার বিষয়ে আমি সভামঞ্চ থেকে কখনো প্রচার করি না, তার ভিতরে বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বের ও সত্যের যে স্বীকৃতি রয়েছে, ঐ কথাটুকুকেই রূপক ভাবে এই সাধক-দ্রষ্টা দেখেছেন বা স্বপ্নে উপলব্ধি করেছেন। শুধু ব্রহ্মা, শুধু বিষ্ণু, শুধু শিবই নন, তেত্রিশ কোটি দেবতা যে একত্র মিলে

একটী বপু হ'তে পারেন, এই অতীব প্রাচীন সত্যটিকে তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে দেখেছেন। পিপীলিকা থেকে ঐরাবত, মূষিক থেকে উচ্চৈঃশ্রবা, কৃমিকীট থেকে গরুড় বা জটায়ু, বালখিল্য থেকে কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ, নারী থেকে পুরুষ, শিশু থেকে বৃদ্ধ, সবাই যে একটী মাত্র আধারে যুক্ত হ'য়ে একটী মাত্র সত্তায় পরিণত হতে পারেন সাধুজীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সেই কথাটাই প্রমাণিত কচ্ছে।

ধর্ম্মের সমন্বয়ী মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় আর্য্য-জাতির যাবতীয় সাধনার একটী অত্যাশ্চর্য্য বিশেষত্ব এই যে, এতে একের ভিতরে বহুর এবং বহুর ভিতরে একের সমন্বয়কে আস্বাদন করা হয়েছে। এই জন্যই ভারতীয় ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে পরমতকে নির্য্যাতন করার পদ্ধতি অপেক্ষা পরমতে সহিষ্ণুতা অধিকতর প্রখর হয়েছে। দুচার স্থলে শোচনীয় ব্যতিক্রম দেখা গেলেও ভারতীয় সাধকদের জীবনের এইটাই একটী বিশেষ ভঙ্গী যে, যে যে-ভাবে নিজ নিজ ঈশ্বর-সাধনে রুচিমান্, তাকে সেই বিশেষ ভঙ্গীতেই নিজ নিজ সাধনা কত্তে দেওয়া যায়। এতে ধর্ম্মজগতের মধ্য থেকে একরোখা ভাবকে অপসারিত ক'রে তার পরিবর্ত্তে নানা বিচিত্রতার আমদানী করার পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। তার সামাজিক ফল ঐক্যহীনতা, সুতরাং ক্ষতিকর। কিন্তু তার মানবিক ফল

উদারতা, সুতরাং লাভজনক। সেই সব ভালমন্দের নিক্তিধরা বিচারে প্রবেশ ক'রে আমাদের সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একদা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ সমাজ-চিন্তা বা রাষ্ট্র-ভাবনার প্রতিষ্ঠা হয়ত অসম্ভব হবে না। সকল মতকে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখা যাদের অনুশীলন, তাদের পক্ষে সেই দিনটী হয়ত হবে একটী সুধন্য যুগ। এদেশে একমাত্র ব্রহ্মাকে নিয়েও এক সময়ে সম্প্রদায় হয়ত হয়েছিল। একমাত্র বিষ্ণুকে নিয়ে বা মহেশ্বরকে নিয়ে যে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা হ'তে পারে, বিগত হাজার খানিক বৎসরের ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম-নৈতিক ইতিহাস তার জাগ্রত জ্বলন্ত সাক্ষী। কিন্তু একই বপুতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সমান ভাবে সমুপস্থিত জেনে প্রত্যেকের প্রতি সমান নিরপেক্ষ ব্রহ্মবাদের অভ্যুদয় অসম্ভব নয়। সব মত সব পথই যে আচার ও আচরণের দিক্ দিয়ে এক হতে পারে, এমন অবাস্তব কল্পনা নিশ্চয়ই কেউ কত্তে সাহস পাবেন না কিন্তু সব মতের সব পথের সত্যকে একটী মতের মধ্যে একটী পথের মধ্যে আস্বাদন করার পরম সৌভাগ্য-সম্পন্ন মানুষেরা যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে এসে পৌছুচ্ছেন, এই বিষয়ে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। যেই ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য ক'রে মানুষে মানুষে কত ঘৃণা-বিদ্বেষের, কত মারামারি কাটাকাটির, কত কলহ-কচায়নের, কত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের, কত উৎপাত-উৎপীড়নের, কত চোখের জল আর

হাহাকারের চর্চ্চা হয়েছে, সেই ধর্ম্মই তার সর্ব্বসহ্য ক্ষমাশীলা মূর্ত্তি নিয়ে ত্রিদিব থেকে ত্রিভুবনে আবির্ভূত হবে, একথা মনে কত্তে অনেক কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্মই মানুষের বিপদের আশ্রয়, মহাত্রাসের প্রতিষেধ, সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের প্রতীকার। সেই ধর্ম্ম উদার হবে না, হয়ে থাক্‌বে সঙ্কীর্ণ ও অসহিষ্ণু, একথা ভাব্‌লে ধর্ম্মকেই অপমান করা হয়। এসব চিন্তার উন্মেষ হচ্ছে এবং হবেই হবে। আজকের ক্ষুদ্র ঘটনাটি তার ইঙ্গিত মাত্র।

অবতারের পর অবতার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা অনেক সময়ে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারি না, করি তার অপব্যাখ্যা। স্বপ্নে বা জাগ্রতে একজনের হাতে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম দর্শন ক'রে একথা ভাবতে পারি না যে, পরম-শক্তিমান্ পরমেশ্বর এই ব্যক্তির ভিতরে যেমন বিদ্যমান, দেহধারী প্রত্যেকের ভিতরে তিনি তেমন ভাবে নিজেকে এভাবে প্রকটিত কত্তে পারেন। আমরা ভেবে বসি, ইনি অবতার এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর। শুধু ভেবেই নিশ্চিন্ত হই না, তা' আবার কলকণ্ঠে প্রচার করি। এই প্রচারের প্রতি কেউ কর্ণপাত কত্তে অস্বীকার কর্ল্লে, তাকে পাষণ্ড ব'লে গাল দেই, তাকে নারকী ব'লে ঘৃণা করি। এভাবে দেশ অবতারের পর অবতারে ছেয়ে যাচ্ছে কিন্তু এত অবতারের আবির্ভাবের পরেও মানুষের চরিত্র পাতিত্যের

পম্বল থেকে উঠে এসে শুভ্র শুদ্ধতায় পৌছুচ্ছে না। আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টার এই ত্রুটিটুকু আমাদের কারো চোখে পড়ছে না। নবীনতর কোনও অবতারের প্রচারকালে নবীনের সমর্থকেরা প্রাচীন অবতারদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার খুব চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন কিন্তু প্রাচীন অবতারের ভক্তেরা নবীন অবতারের ভক্তদের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ, বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত আচরণ করেন। যেন, অবতার-বাদের ট্রেড্-লাইসেন্সটী একমাত্র তাঁদেরই অধিকারে থাকার কথা। কিন্তু সদর রাস্তার উপরে একজন যদি অনেক যুগ আগে থেকেই সরবতের দোকান দেবার লাইসেন্স পেয়ে থাকেন, তাহ'লে নবীন একজন সেই রাস্তার উপরে আর এক লেবেলের আর একটা সরবতের দোকান দেবার লাইসেন্সের অধিকার কেন আদায় কত্তে পারবেন না? এই ভাবে নানা বিচিত্র কলহের ও আপোষের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন অবতারে অবতারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে, আমরা অকপট সরলতায় তাঁদের নামে জয়ধ্বনিও দিচ্ছি, কিন্তু দেশটা, জাতিটা, সমাজটা উৎসন্নে যাবার যেই স্তরে ছিল, সেখান থেকে উঠে এক ইঞ্চিও উপরে আসছে না। এইগুলি হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা।

পবিত্র হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সমস্যার সমাধানের পথ হচ্ছে, প্রত্যেকটী মানবমনে এই ভাবটীকে জাগিয়ে দেওয়া

যে, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা তোমার ভিতরে আছেন, তোমার সাথে আছেন, চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি তোমার ঐ অসম্পূর্ণ আধারটার মধ্যেই তাঁর পরিপূর্ণ সম্পূর্ণতায় আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল। তাই তিনি তোমার মনে নিয়ত সংযম, পবিত্রতা, শুদ্ধতা, সরলতা আনয়নের কেবল উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পৃথিবীর যেখানে যে ধর্ম্মপ্রচারক নিজের ধর্ম্ম প্রচার কচ্ছেন, তাঁরই উপদেশ থেকে তুমি ঐ ঐ সম্পর্কে মূল্যবান বাণী সংগ্রহ ক'রে হৃদয়ের ফলকে গেঁথে রাখ, তার চর্চ্চা কর, তার আবাদ কর। যে যত অধিকতর পবিত্র থাকার চেষ্টা কর্ব্বে, তার ভিতরে পরমেশ্বরের মহিমা তত স্বচ্ছ ভাবে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে।—এই জন্যই আমি ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক, কোনও ধর্ম্মীয় মতবাদ-বিশেষের প্রচারক নহি।

অদ্য বক্তৃতা মাত্র একঘণ্টা কাল হইল। রায় বাহাদুর শরৎ বাবু আগন্তুক সাধুটীকে সমাদর করিয়া নিজ গৃহে নিয়া আসিলেন এবং রাত্রির আতিথ্য প্রদান করিলেন। সাধু রাত্রি যাপন করিলেন শ্রীশ্রীবাবামণির কুটীরের একাংশে।

কিন্তু শেষ রাত্রে দেখা গেল, সাধু অন্তর্হিত হইয়াছেন।

এই সাধুর বৃত্তান্ত রজনী-যোগেই লোকমুখে সমস্ত শহরময় প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। পরদিন বহু নরনারী তাঁহাকে এবং শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি ছিলেন মৌনী।

রংপুর
১৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪২
(২রা আগষ্ট, ১৯৩৫)

জপ, ধ্যান ও কীর্ত্তন

অদ্য প্রাতঃকালে একজন বৈষ্ণব করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন সুরু করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—হরিনামের জয় হোক্, কারণ হরিনাম জগন্মঙ্গল এক মহাবস্তু কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনের প্রথাটি প্রচলন করেছিলেনই ত' এই জন্য যে, নামকীর্ত্তনে কীর্ত্তনকারীর চিত্ত প্রেম-রসে যখন বিপ্লাবিত হবে, তেমনি আবার কীর্ত্তন-শ্রবণকারীরও মন-প্রাণ প্রেমপ্লাবনে মথিত হবে। কিন্তু তুমি যদি অতীব উচ্চ এবং উৎকট চীৎকার ক'রে নিজের গলাটী ভাঙ্গ আর ফুস্‌ফুস্ ফাটাও এবং সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনশ্রবণেচ্ছুর কর্ণপটহ বিদারণ ক'রে দাও, তবে অভীপ্সিত ফলটী লাভ করা হবে না। এজন্য আমার মনে হয় যে, উচ্চকীর্ত্তনও যতটা সম্ভব হৃদয়গ্রাহী ক'রেই গাওয়া বেশী লাভজনক। কীর্ত্তনের সঙ্গে জপ বা ধ্যানের কোনো বিরোধ নেই। কীর্ত্তন কত্তে কত্তে মন আস্তে আস্তে জপের অনুকূল স্বভাব লাভ ক'রে থাকে আর তার ফলে মন ধ্যানের সামর্থ্য অর্জ্জন করে। ধ্যান, জপ আর

কীর্ত্তন একটী প্রধান কাজেরই তিনটী উপাঙ্গ মাত্র। সেই প্রধান কার্য্যটি হচ্ছে, পরমপ্রেমময় পরমেশ্বরে মনোলয় বা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা স্থাপন। ঐটেই হচ্ছে প্রধানতম লক্ষ্য, এইগুলি হচ্ছে আবশ্যকীয় উপায়। কারো কারো পক্ষে উচ্চ কীর্ত্তনই ধ্যানাবেশ আসার পক্ষে অনুকূল হ'য়ে থাকে, কারো কারো পক্ষে আবার উপাংশু জপের ফলে ধ্যানাবেশ সহজ ব'লে মনে হয়। পরম প্রেমময়ের চরণের সাথে নিজেকে একেবারে নূপুর ক'রে বেঁধে দেওয়াটাই যেখানে আসল উদ্দেশ্য, সেখানে স্থল-বিশেষে উচ্চ-চীৎকার আবশ্যক বা অনাবশ্যক হ'তে পারে, পাত্রবিশেষে ধাবন-কুর্দ্দন-উল্লম্ফন আদি প্রয়োজনীয় বা অবান্তর হ'তে পারে। এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির মনোভঙ্গিমার, রুচির, অভ্যাসের বা অনুশীলনের পার্থক্যের দরুণ একজনের পক্ষে যেটী পরমরোচক ব'লে মনে হ'তে পারে, আর একজনের পক্ষে সেটী পরিহার্য্য ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে। উচ্চকীর্ত্তনে আগ্রহশীল অনেক সাধক যে আবার হঠাৎ দীর্ঘকালের জন্য মৌনী হ'য়ে যান, তার মধ্যেই এর প্রমাণ বা নিদর্শন পাবে। একই ব্যক্তির সাধন-জীবনের বিভিন্ন স্তরে বা বিভিন্ন ক্রমবিকাশে একটী বস্তু বা ব্যাপার এক সময়ে চূড়ান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে, অন্য সময়ে পরিহার্য্য বা ব্যতিক্রম হ'য়ে যায়। এই সব পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনাকে সুস্থ মনে ও সরল বিচারে মেনে

নিয়ে প্রত্যেকটী সাধন-ভঙ্গিমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা একটা মস্ত সৌভাগ্য। তোমার কীর্ত্তন আমার ভাল লেগেছে কিন্তু কাঠ-ফাটা আওয়াজটা কিন্তু প্রীতিপ্রদ নয়।

কীর্ত্তন কি ভাবে করণীয়

বৈষ্ণবটী বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কীর্ত্তন কি ভাবে কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কীর্ত্তন সুরু করার আগে বেশ ক'রে ভেবে নেবে যে, প্রাণের ভিতরে পরমপ্রেমের জন্য স্বার্থলেশহীন পবিত্র প্রেমের উদ্দীপনই তোমার কীর্ত্তন করার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ফলে তোমার মন চোরাপথে দশ দিকে যেতে না পেরে তোমার কণ্ঠস্বরের মধ্যেই বারংবার ঘুরে বেড়ানোতে তোমার পক্ষে প্রত্যাহার-যোগ সাধন বিনা ক্লেশে আপনা আপনি সহজ হয়ে যাচ্ছে। সেই কীর্ত্তন আর একটু উচ্চ গ্রামে আরোহণ কর্লে তোমার মধুর কণ্ঠ আরো দশ জনের উপরে সেই শুভক্রিয়াটুকু কর্ব্বার অবকাশ পাচ্ছে, তোমার নিজের কণ্ঠস্বর যে শুভক্রিয়াটুকু তোমার নিজের মনের উপরে করার সুযোগ পেয়েছে। এভাবে, যে কীর্ত্তন তোমার পরম-প্রেমের অভিসার, সেই কীর্ত্তনই আবার জগতের মঙ্গলবিধায়ক এক পবিত্র পরহিত-কর্ম্ম। এখানে আত্মহিত আর পরহিত পরস্পরের

সাথে এমন ভাবে সুমিশ্রিত হ'য়ে পড়েছে যে, তুমি পরমেশ্বরের প্রেমভিখারী হ'য়ে জগদ্বাসীর প্রতি এক পরম-প্রেমদাতা হ'য়ে যাচ্ছ। এই একটা অসাধারণ বিশেষত্ব উচ্চ কীর্ত্তনের আছে ব'লেই তার এত সমাদর, এত প্রশংসা। তারই জন্য কীর্ত্তনকে সুমধুর ক'রে পরিবেশনের চেষ্টাই সুসঙ্গত।

বৈষ্ণবটী মধুকণ্ঠে বেশ কতক্ষণ ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মমত-প্রচারে ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারে পার্থক্য

কিছু যুবক ও প্রৌঢ়ের সমাগম হইয়াছে। একজন একটী প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মমত-বিশেষের প্রচারে আর ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারে কর্ম্মের দিক দিয়ে আর কর্ম্মফলের দিক্ দিয়ে অনেক পার্থক্য আছে। ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকের এমন কোনও ঝোঁক থাকে না যে, তাঁর দলটী পুষ্ট হোক্। তিনি তাঁর বক্তব্য সকলের জন্য সমান আগ্রহে সমভাবে প্রচার কর্ত্তে পারেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের কাছেও তাঁর বক্তব্য বা উপদেশ অগ্রহনীয় হবার কথা নয়। কেউ তাঁর উপদেশ মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত না হ'লেও তাঁকে তর্কের বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক্তে খুব কমই হয়। ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দেশ-কাল-

পাত্র-অনুযায়ী প্রত্যেকের পক্ষেই কোনও না কোনও ভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে। এখানে ব্রহ্মচর্য্যোপদেশের সর্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বকালীনতা সুস্পষ্ট। কিন্তু ধর্ম্ম-মত-বিশেষ প্রচারে নামলে, প্রথমেই নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে শ্রোতাদের ভাল ভাবে অবহিত করিয়ে দিতে হয়। আমার মতটা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠই হ'য়ে থাকে, তাহ'লে অন্যান্যদের মত নিশ্চয়ই আমার মতটার তুলনায় কিছু নিকৃষ্ট হবে, এমন ইঙ্গিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসে যায়। অন্য মতাবলম্বীদের মনের উপরে এর ফলে আঘাত আসে। সেই আঘাতের প্রতিঘাত-রূপে আসে প্রতিবাদ বা প্রতিবাদি-সুলভ বিরুদ্ধাচরণ। তারপর আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র যুদ্ধ মহাসমরে পরিণত হয় এবং পরিণাম-ফল দাঁড়ায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রচণ্ড এবং স্থায়ী কলহ। নিজ নিজ ধর্ম্মমত-প্রচারে যাঁরা আগ্রহ-সহকারে পৃথিবীর বিশাল রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়েছেন, তাঁরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই একটী বিপজ্জনক সম্ভাবনার জালে আটকে গেছেন। এই জন্যই অনেক সিদ্ধ-সাধকেরা নিজেদের ধর্ম্মমত প্রচারের দিকে তেমন রোখ্ দেন না। তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে যাকে যা' দিয়ে সাহায্য কত্তে পারেন, সেইটুকু ক'রে যান। আমি তুচ্ছ একটী নগণ্য মানুষ, আমি ধ'রে নিয়েছি ব্রহ্মচর্য্যকে। যার জীবনে যে সমস্যা আছে, সে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের প্রতি একান্ত ভাবে অনুগত থাকবার চেষ্টা কত্তে কত্তে নিজের সমস্যা নিজের প্রজ্ঞাবলে মিটিয়ে নাও।

ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবৎ-সাধন

একটী প্রশ্ন উঠিল, শুধু ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারাই কি ঈশ্বর-সাধনের ফল মিলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু ভাত খেলেই কি পোলাও, পায়েস খাওয়ার সাধ মিটে? দুটী ভাতের জোগাড় থাকলে একদা পোলাও বা পায়েসের সম্ভাবনা থেকে যায়। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ দেহ এবং মনের যিনি অধিকারী, তাঁর পক্ষে ঈশ্বর-প্রেম, জীবপ্রীতি, সর্ব্বজনের সুখতরে আত্মবিসর্জ্জন, চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার ক'রে পরমেশ্বর-সাধনার পথে অগ্রগমন বা সর্ব্বলোক কুশলার্থে নিজ হাতে নিজ মুণ্ডচ্ছেদন ক'রে পরার্থপরতার মহত্তর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন,—এ সবই সম্ভব হ'তে পারে।

ব্রহ্মচর্য্য এক অত্যাবশ্যক বস্তু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব ধর্ম্মশাস্ত্রেই মুখ্যতঃ বা গৌণ ভাবে প্রাসঙ্গিক রূপে বা অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে এমন উপদেশ-সমূহ রয়েছে যা প্রকাশ্য ভাবে বা প্রচ্ছন্ন-রূপে ব্রহ্মচর্য্যেরই সমর্থক ইঙ্গিত। মানুষের মন যখন পরম সত্যকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখের লিপ্সা তার আপনা আপনি খর্ব্বিত হ'য়ে যায়। এটী অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এই থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্রহ্মচর্য্য এক অত্যাবশ্যক বস্তু।

কীর্ত্তন-শ্রবণ ও আয়ু

ইতিমধ্যে বৈষ্ণবটী কয়েকটা রাস্তা ঘুরিয়া পুনরায় এখানেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলে তিনি বলিলেন,—কীর্ত্তন সম্পর্কে আমি আরো দুচারটা কথা শুনতে চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শোনো বাবা। অন্য লোকে কীর্ত্তন কচ্ছে নিজের আয়ুঃক্ষয় ক'রে। অবশ্য তাঁর লক্ষ্য ঈশ্বর-প্রেম লাভ। আয়ুর চেয়ে ঈশ্বর-প্রেম অনেক বেশী দামী জিনিষ। কিন্তু আমি যে মন দিয়ে শুন্‌ছি, এতে কিন্তু আমার আয়ু বেড়ে যাচ্ছে। মন দিয়ে শুনছি, তার ফলে আমার ভিতরে অজ্ঞাতসারে এমন কতকগুলি শক্তি ও সামর্থ্যের সঞ্চার হচ্ছে, যাতে আমার আয়ু বর্দ্ধিত হ'য়ে যাচ্ছে। যদি কেউ দীর্ঘায়ু হ'তে চাও, তবে মন দিয়ে কীর্ত্তন শোন্‌বার অভ্যাসটী করো। যদি অন্যকে দীর্ঘায়ু কত্তে চাও, তাহ'লে তাকে মন দিয়ে কীর্ত্তন শুন্‌তে আগ্রহী ক'রো। ধ্যান করা, জপ করা আর মন দিয়ে কীর্ত্তন শোনা প্রায় সমপর্য্যায়ের মহৌষধ,—এই তিনটীতেই মানুষের আয়ুবাড়ে। তার একটী কারণ এই যে, এই তিনটীতেই মানুষের সংযমের শক্তি, কামাবেগ প্রশমনের শক্তি, কামকে দিব্যায়িত ক'রে ভগবৎ-প্রেমে রূপান্তরিত করবার শক্তি, সুতরাং মৃত্যুকে দূরান্তগত কর্ব্বার শক্তি বাড়ে।

লীলাকীর্ত্তন ও নামকীর্ত্তন

বৈষ্ণবটী আর একটী প্রশ্ন করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লীলাকীর্ত্তন ভাল, না নামকীর্ত্তন ভাল, এই বিষয়ে আমার উপদেশ নিয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না। কারণ, এই বিষয়ে আমি সঠিক-ভাবে তোমাকে কিছু বল্‌তে পার্‌ব না। অবতার বা মহাপুরুষ-রূপে খ্যাত মহতের জীবন-লীলা স্মরণে মনে যে একাগ্রতা আসে, আর পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কোনও নাম অফুরন্ত ভাবে জপনে বা কীর্ত্তনে মনে যে একাগ্রতা আসে, দুইটীর মধ্যে পার্থক্য একটা আছেই। ভক্ত-বিশেষের মনের গঠন অনুযায়ী এই দুইটীর একটী ঢংয়ের একাগ্রতা এক এক জনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হ'তে পারে। লীলাকীর্ত্তনে মন একটী লীলা থেকে অন্যতর লীলাতে ঘুরে বেড়ায়, নামকীর্ত্তনে মন একটী মাত্র তত্ত্বের ভিতরে নানা ভাবে প্রেমকে আস্বাদন করে। কোন্‌টী কার উপযোগী, তা' সে নিজে বেছে নেবে। এই বিষয়ে আমার পক্ষে সুনির্দ্দিষ্ট উপদেশ দান সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়।

খেয়াল-গায়ক ও লীলা-কীর্ত্তনকারী সাধক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তরূপে লোকসম্মান একবার পেয়ে গেলে অন্তরের আস্বাদনের চেয়ে লোকের চাটুবাক্যের দাম বেশী হ'য়ে পড়ে। যে কাজটী করার দরুণ তোমার

ভক্তখ্যাতি লাভ হ'ল, সেই কাজটী তোমার অন্তরঙ্গ আস্বাদনের অনুকূল না হ'লেও তুমি বারংবার তাই কর্ব্বে। এই দুর্ব্বলতা তোমার বা আমার মত সাধারণ ব্যক্তিদের প্রায়ই থাকে। এজন্যই সতর্ক থাকতে হয় যে, নিজেকে যেন কখনো নিজে ফাঁকি না দেই। একজন উচ্চাঙ্গের খেয়াল-গায়ক রাগ-রাগিণীর আলাপ ও তান-বিস্তার কর্ব্বার সময়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন করেন বা শ্রোতাদের আস্বাদন করান, একজন লীলাকীর্ত্তন-কারী তাঁর পদের মাধুর্য্য এবং আখরের বাহার আস্বাদন কত্তে কত্তে বা পরিবেশন কত্তে কত্তে কি সেই আস্বাদন পান বা সেই আস্বাদন পরিবেশন করেন? নিজে একাধারে এই দুইটী বিচিত্র শিল্পের পারঙ্গম সাধক না হ'লে এই তুলনাটা ঠিক ক'রে বোঝা বা তুলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা সত্য যে, যে যে ভাবেই অনুশীলন করুক না কেন, তার চরম ফল আনন্দ এবং পরম আনন্দই পরমেশ্বর। এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার ক'রো এবং নিজ সাধারণ বুদ্ধির সাহায্য নিয়েই নিজের রুচি-মতন পথে যতটা পার কেবল এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রো। এটা ভাল, ওটা মন্দ, এই কথার চেয়ে, যে পথটা ধরেছি, তার শেষ দেখে ছাড়ব, এই কথাটা বেশী ভাল।

অদ্য অপরাহ্নে এডোয়ার্ড মেমেরিয়াল হলের মাঠে শ্রীশ্রীবাবামণির সপ্তম বক্তৃতা হইল। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য কেন প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ নিজেকে শক্তিমান্ মনে করে এবং অন্যকে পরাজিত ক'রে নিজের শক্তির মহিমা বর্দ্ধনের চেষ্টাও করে। কিন্তু সে যতই শক্তিমান্ হোক্ না, সে অলৌকিকের উপরেও বিশ্বাস করে এবং নিজের উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য অলৌকিকের সাহায্য কামনাও করে। অনেকে বলেন, এই ভাবেতেই তার এক প্রকারের ধর্ম্মবোধের জাগরণ ঘটে এবং জীবনের নানা স্তরে সে অলৌকিকের শরণাপন্ন হ'য়ে নিজের মনকে করে নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার। অলৌকিকে বিশ্বাস রাখা নিজের মনকে নিশ্চিন্ত রাখার একটী চমৎকার উপায় হ'লেও, একটা জাতির ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ নিয়ে যেখানে কল্পনা, সেখানে সাধারণ আর অসাধারণ প্রত্যেকটী ব্যক্তিরই অলৌকিকত্বের মায়া-জাল থেকে মুক্ত থেকে আত্মগঠন এবং জাতিগঠন প্রয়োজন। একটা সমাজ, জাতি বা দেশ কখনো একদিনের সাধনায় উন্নতি-পথারূঢ় হয় না। তাকে সুদীর্ঘকাল ধীরপ্রযত্নে একলক্ষ্যে উন্নতি লাভের দুর্ব্বার অভীপ্সা নিয়ে দিনের পর দিন কেবলই আত্মগঠন ক'রে যেতে হয়। যাতে দেশের, জাতির বা সমাজের মানুষগুলির মনে কখনো হতাশা, অবসাদ বা দুর্ব্বলতা আসতে না পারে, তার জন্যই তাদের প্রত্যেককে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি একান্ত ভাবে আগ্রহী ক'রে তোলা প্রয়োজন। আত্ম-সংযম আত্মশক্তির

বিকাশে এবং বিস্তারে সাহায্য করে। আত্মশক্তির সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী ধারাবাহিক এবং অবিরাম প্রয়োগের দ্বারা অধঃপতিত দেশ বা জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। সাময়িক হুজুগ বা ক্ষণিকের আন্দোলন কিছু কিছু অলসের আলস্য, কিছু কিছু উদাসের ঔদাস্য, কিছু কিছু আত্মবিশ্বাস-বর্জ্জিতের ভীরুতা ক্ষণকালের জন্য দূর ক'রে দিতে পারে সত্য কিন্তু উৎসাহকে আমরণ জীবন্ত ক'রে ধ'রে রাখার শক্তি একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যেরই আছে। এই জন্যই আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে সমাদৃত করা প্রয়োজন।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য সাধনের উপায় হচ্ছে মনকে একমুখী করা। মনকে যত বিচিত্র দিকে বিক্ষিপ্ত হ'তে দেবে, ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের শক্তি তোমার তত কমে যাবে। ছোট কাজ, বড় কাজ, সব কাজের মধ্যেই মনকে এক-ভাবাবিষ্ট ক'রে রাখার অভ্যাসই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য সাধনের সব চেয়ে সহজ এবং সব চেয়ে কার্য্যকরী কৌশল। চারিদিকের পরিবেশ যদি প্রতিকূলও থাকে, তবু একাভিনিবেশের ফলে মন ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠ হবেই হবে। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু নাম-কীর্ত্তনের মাধ্যমে বহু জনের জীবনে এই ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিঞ্চিদধিক চার শো বছর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নদীয়ায় আবির্ভূত হ'য়ে যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের বন্যা

এনেছিলেন, তারও প্রত্যক্ষ ফল ব্রহ্মচর্য্যে গিয়ে পর্য্যবসিত হয়েছিল। স্পষ্ট ক'রে তিনি ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে কিছু না বল্লেও তাঁর জীবনের বিভিন্ন আচরণ ও শিষ্য-শাসন থেকে এটা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, ইষ্টে পরমা রতি সৃষ্টির দ্বারা তিনি প্রাকৃত মনোগতিকে নিবারিত করারই চেষ্টা করেছেন এবং তাও তাঁর এক সুমহতী অভীপ্সা ছিল। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ যে বিরাট কর্ম্মযোগ-সম্বর্দ্ধিত জনসেবাযজ্ঞের আয়োজন দিকে দিকে বিস্তারিত করেছেন, তাও মানুষের মনকে একাভিমুখী ক'রে ব্রহ্মচর্য্যে পরিনিষ্ঠিত করারই অনুকূলে। মন একমুখ হ'ল ত' ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার আর বাধা কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ব'লে উচ্চ চীৎকার করার যে ফল, তার শতগুণ শুভফল হবে তাতে, যাতে মনের সহস্রমুখিনী গতি একমুখিনী হবে। দেশোদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়ে নানা দিকে যে সহস্র সহস্র যুবক নানা অবিশ্বাস্য রকমের দুঃসাহসিক কার্য্য করে যাচ্ছে, যার জন্য তাদের অনেককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হতেও হচ্ছে, তাদের অনেকের মনের দিকে তাকালে দেখ্‌তে পাবে, কত একাভিমুখী তাদের মন, তাদের মনে বহু প্রকারের চিন্তা-ভাবনা নেই, তাদের প্রাণে বহু বহু অভিলাষ নেই, অভিলাষ মাত্র একটা,—অর্থাৎ যে ভাবে তারা দেশের কল্যাণ চায়, সেই পথটুকু মাত্র। এর ফলে তাদের ভিতরে আপনা আপনি ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে

গেছে। যে-কোনো ভাবে মনকে যদি একমুখ কত্তে পার, তাহ'লে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার সাফল্য-সম্পাদনের জন্য আর ভাবনার কিছু নেই। কে কোন্ পন্থা অবলম্বন ক'রে মনকে একমুখ, একাগ্র, একলক্ষ্য, নিবিড় ভাবে নিবিষ্ট ও সুস্থির কর্ব্বে, তদ্বিষয়ে তোমরা প্রত্যেকে স্বাধীন। আমি শুধু এইটুকু ব'লেই দায়মুক্ত যে, একবার মনটী যদি তোমার একমুখ হয়েছে, তাহ'লে জান্‌বে যে, ব্রহ্মচর্য্যের দশ আনা সিদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি মনঃসংযমের ও মানসিক একাগ্রতা-বর্দ্ধনের ছোটো ছোটো সাধারণ কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টায় বক্তৃতা সমাপন করিলেন।

রংপুর

১৮ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪২

(৩রা আগষ্ট, ১৯৩৫)

আসন-মুদ্রার উদ্দেশ্য

পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী অদ্য হইতে প্রাতঃকালে যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষাদানের ক্লাশ হইতেছে। নানা বয়সের ব্যক্তিরা আসন-মুদ্রা শিক্ষার্থে সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিপুল শারীরিক বল সংগ্রহ করা আসন-মুদ্রা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। এদের প্রধান উদ্দেশ্য

মনকে একাগ্র করার ক্ষমতা অর্জ্জন করা, পরন্তু উদ্দেশ্য দেহকে দীর্ঘকাল কর্ম্মক্ষম রাখার যোগ্যতা দান করা। সুতরাং হুজুগের ভাব নিয়ে কেউ কখনো আসন-মুদ্রার চর্চ্চা ক'রো না। দেহগঠন, জীবনগঠন, শরীরকে যাবতীয় সাত্ত্বিক কাজ করার যোগ্যতা প্রদান, এই কয়টী কথাকে মনে রেখে আসন-মুদ্রা কর্ব্বে।

অল্পই কর কিন্তু নিয়মিত কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসন-মুদ্রা অভ্যাস ক'রে যাওয়ার ভিতরে বিশেষ সার্থকতা নেই। মনটাকে একাগ্র করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং শরীরটাকে সংযত, সংহত, কর্ম্মক্ষম রাখার সঙ্কল্পে পনের বিশ মিনিট কাল আসন-মুদ্রার অভ্যাস প্রত্যহ ক'রে গেলেই কাজের কাজটুকু হ'য়ে যাবে। মনে রাখতে হবে যে, অভ্যাস করা চাই প্রত্যহ। তবে, সপ্তাহে একদিন বিরতি দেওয়া মন্দ নয়। অন্যান্য ব্যায়াম সম্পর্কে সপ্তাহে একদিন বিরতি দেওয়া একটা নিয়মও বটে। অল্পও যদি কর, তবু নিয়মিত-ভাবে কর, এইটাই বড় কথা।

আসনমুদ্রা-প্রদর্শনী ও সার্কাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসনমুদ্রা প্রদর্শনকে সার্কাস দেখানোর পর্য্যায়ে নিয়ে ফেলা উচিত নয়। আমি যে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণকালে অধিকাংশ বক্তৃতামঞ্চ হ'তেই আসন-

মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে এসেছি, সেটা সার্কাস দেখাবার জন্য নয়। যে, জিনিষটার প্রতি সকলের ছিল অবজ্ঞা বা অবহেলা অথবা যার সম্পর্কে জনসাধারণের ছিল পুঞ্জীভূত অজ্ঞতা, সেই বিষয় সম্পর্কে সকলকে একটু সজাগ ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই একাজ করেছি। সার্কাস দেখলে মানুষের বললাভের আগ্রহ জন্মে। আসন-মুদ্রার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু শারীরিক কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক একাগ্রতা লাভ।

প্রতিভার দুইটী রূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনে যদি কারো একাগ্রতার অভ্যাস আয়ত্ত হয়, তাহ'লে তার আর ভাবনার কিছু থাকে না। আমাদের একাগ্রতা নেই বলেই ত' আমরা পদে পদে পরাজিত হই, প্রতি ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হই। একাগ্রতা দেয় আত্মবিশ্বাস, একাগ্রতা দেয় কর্ম্মে নিষ্ঠা। তোমার বিপুল বুদ্ধি আছে, তার জন্যই তোমাকে প্রতিভাশালী ব'লে মানব না, তুমি তোমার বুদ্ধিকে নিষ্ঠার সঙ্গে যদি একটা কাজে সুদীর্ঘ প্রযত্নে লগ্ন ক'রে রাখতে পার, তবে সেই নিষ্ঠাও একটা প্রতিভা। নিত্যনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি কয় জনের থাকে? দীর্ঘকাল মনকে একাগ্র ক'রে একই কাজে দ্বিধাহীন চিত্তে লাগিয়ে রাখার ধৈর্য্যও মানুষের মধ্যে খুব কমই থাকে। কিন্তু ঐ অসাধারণী বুদ্ধি যেমন প্রতিভা নামে পূজিত হয়, এই অসাধারণী নিষ্ঠাও তেমন প্রতিভা নামে পূজা পাবার যোগ্য

বস্তু, এতে সন্দেহ নাই। প্রতিভার দ্বিবিধ রূপ। একটী নবোন্মেষশালিত্ব, অপরটী আত্যন্তিকী নিষ্ঠা।

অদ্য অপরাহ্নে এডোয়ার্ড মেমোরিয়ালের মাঠে শ্রীশ্রীবাবামণির অষ্টম বক্তৃতা হইল। জনতার আজ সীমা-সংখ্যা ছিল না। বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বেই কেহ কেহ চিরকুট দিয়া জানাইয়াছেন যেন, অলৌকিক ব্যাপার নিয়া কিছু বলা হয়।

লৌকিক ও অলৌকিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কাছে অলৌকিক কোনও সম্পদ নাই। নিতান্তই সাধারণ একটী লোক আমি লৌকিক ভাবেই এবং লৌকিক বলেই সব কাজ ক'রে যাচ্ছি। অলৌকিকের প্রতি মানুষের ঝোঁক বাড়িয়ে দিয়ে সমগ্র জাতিটাকে পরনির্ভর জড়পিণ্ডে পরিণত ক'রে দেওয়ার ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। আসুন আমরা প্রতি জনে নিজ নিজ লৌকিক জীবনকে কতটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারি, সেই দিকে লক্ষ্য দেই। আসুন আমরা আমাদের পরমেশ্বরদত্ত লৌকিক ও সাধারণ সামর্থ্যটুকুর চর্চ্চা ক'রে ক'রে তাকে কতটা নির্ম্মল, কতটা সুচারু, কতটা সার্থক ক'রে তুলতে পারি, তার জন্য আগ্রহী হই। আসুন আমরা আমাদের ভাঙ্গা-চুরা ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের মাঝেই বিশ্বেশ্বরের

বিশ্ববিস্তারিত বিরাট সিংহাসনের জন্য কতটুকু স্থানকে যোগ্য ক'রে তুলতে পারি, তার চেষ্টা দেখি। প্রতিটি মানুষের মনে যখন এই আকুতি জাগ্‌বে, তখন আমরা শত সহস্র লক্ষ কোটি জন মিলিত হয়ে একটা বিরাট চন্দ্রাতপে পরিণত হ'য়ে যাব, যার স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে ব্রহ্মাণ্ড-পতির প্রতিটি প্রজার হবে সুযোগ্য এবং সম্মানিত আসন আর যে দৃশ্য দেখে আমরা কোটি কোটি জন্মের জন্ম-মরণ-দুঃখ একটী নিমেষেই ভুলে যেতে সমর্থ হব। বিশ্বের যত জাতি, বিশ্বের যত ভাষা, বিশ্বের যত ধর্ম্ম, বিশ্বের যত মত ও পথ, বিশ্বের যত বিচিত্রতা ও বিশ্বের যত বহুমুখিতা, সব একত্র মিলে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যরসের সৃষ্টি ক'রে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে এই ব'লে আনন্দ দেবে যে, না, এতদিনে স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্য সার্থক হ'ল। লৌকিকেরা সবাই একত্র হ'তে পার্ল্লে যে বিচিত্র অলৌকিকতার সৃষ্টি হবে, কোনও অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার কদাচ তার সমকক্ষ হ'তে পারে না।

বিজয়েচ্ছু যৌবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের লৌকিক জীবনটা কি কম অলৌকিক? একটা বয়সে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে যৌবনকে উপলব্ধি করেছি বা কর্ব্ব। সেই ঘটনাটা নিতান্তই লৌকিক কিন্তু তাহা কি কম অলৌকিক?

যৌবনের স্বাভাবিক প্রকৃতি জয়েচ্ছা। কে আছে পুরুষ বা নারী, যৌবনে যে অপরকে জয় করার জন্য অদম্য কামনা অনুভব না করেছে? নারী খুঁজে বেড়িয়েছে পুরুষকে জয় করার ইচ্ছায়। পুরুষ খুঁজে বেড়িয়েছে নারীকে জয় করার ইচ্ছায়। পুরুষ যখন নারীকে জয় ক'রে মনে মনে আত্মগর্ব্ব অনুভব কচ্ছে,—"এই আমি নারীকে জয় করে ফেল্লাম", ঠিক তখনি তথাকথিতা বিজিতা নারীটী মনে মনে ভেবে যাচ্ছে,—"আমিই ত' পুরুষটীকে লৌহনিগড়ে আবদ্ধ কর্লাম। কি সাধ্য আছে তার যে নিজের মনের কাছে অস্বীকার করে যে, আমার কাছে তার পরাজয় হ'ল না?" নারী যখন পুরুষকে জয় ক'রে আত্মগর্ব্বে উদ্বেলিত হচ্ছে, ঠিক তখনি তথাকথিত বিজিত পুরুষটী মনে মনে ভেবে যাচ্ছে,—"এই নারী ব্যবহারে দেখাল যে সে-ই যেন আমাকে জোর ক'রে অধিকার কর্ল্ল, কিন্তু সে জানে না যে, জীবনের যেই পর্য্যায়ে সে যেখানেই যাক্ আর যে ভাবেই কাল-যাপন করুক, আমি যে একদা ক্ষণকালের জন্যও তার প্রভু ছিলাম, এই সত্য, সে প্রাণান্তেও ভুলে যেতে সমর্থ হবে না।" বিজয়েচ্ছু যৌবন জয়ের মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে এই ভাবে একের পর এক ক'রে নিত্য নূতন শৃঙ্খল পরিধান কচ্ছে করযুগে আর চরণযুগলে আর মনে মনে ভাব্‌ছে,—"আমিই জয়ী, আমিই জয়ী।" এর চেয়ে আশ্চর্য্যতর, অলৌকিকতর, অসামান্যতর আর কোনও ব্যাপার দেখবার আমাদের প্রয়োজন আছে কি?

যৌবনের সার্থকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যৌবনের বিজয়ের ইচ্ছাও আছে, ক্ষমতাও আছে কিন্তু সার্থকতাটুকু কোথায়? এই সার্থকতাটুকুই আজ আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের বিভিন্ন জনের মতামতের সহিত প্রাচীন ভারতীয় অনুরাগ-তত্ত্বের তুলনামূলক একটী সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন,—পরমেশ্বরে পরমা রতিই যৌবনবোধের পরম সার্থকতা। জীবনের প্রতিটি আস্বাদন-রুচি, আস্বাদন-রতি, আস্বাদন-সামর্থ্যকে পরমেশ্বর-প্রীত্যর্থে নিবেদন করার মধ্যেই যৌবনাগমের পরম সফলতা। যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধ করার কাজে বালির বাঁধ দিবার প্রয়াস প্রহসনে পরিণত হবে। বাঁধ দিতে হবে সুদৃঢ় গ্র্যানাইট পাথরের, মশলা হবে সিমেন্ট-বালি, চেষ্টা চলবে দিবারাত্রি, সমগ্র জলধারার অতিরিক্ত বেগটুকুকে প্রবাহিত ক'রে দিতে হবে জনকল্যাণমূলক নানা সৎকার্য্যের খাতে, আর সেই জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে অন্ধকারাচ্ছন্ন বসুন্ধরার প্রতিটি কুটীরে জ্বালিয়ে তুলতে হবে জ্ঞানের আলো।

অদ্যকার বক্তৃতা তিন ঘণ্টা কাল চলিল।

রংপুর
১৯শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৪২
(৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৫)

শক্তির উৎস

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত কক্স্‌বাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জ্ঞানই শক্তি। কেহ কিছু জানিলে না ত' শক্তি বাড়িবে কি করিয়া? বুদ্ধিই শক্তি। কাহাকেও কিছু বুঝাইলে না ত' শক্তি বাড়িবে কি করিয়া? ঐক্যই শক্তি। কেহ কাহারও সহিত মিলিলে না ত' শক্তি বাড়িবে কি করিয়া? চেষ্টাই শক্তি। সকলে মিলিয়া নিজ নিজ ঘরে বসিয়া রহিলে, কাজ কিছু করিলে না, শক্তি বাড়িবে কি করিয়া? সংগ্রামই শক্তির উৎস। বাধাবিঘ্ন দেখিয়া পিছাইয়া রহিলে,—শক্তি লাভ করিবে কি করিয়া? আত্মবিশ্বাসই শক্তির উৎস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে কল্পনাতীত জয় লাভের দ্বারা নিজের অন্তরের বিশ্বাসকে দৃঢ় ও সুপরীক্ষিত করিয়া লইলে না ত' পরবর্ত্তী সংগ্রাম-গুলিতে জয়ী হইবে কিসের প্রেরণায়? সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রবলই সর্ব্বশক্তির মহত্তম উৎস। সংযত হইলে না, মিতাচারী হইলে না, যথেচ্ছাচার বর্জ্জন করিলে না, চরিত্রখানাকে জীর্ণ-শীর্ণ ভাঙ্গা ভেলার মতন সমুদ্র-তরঙ্গের প্রতিটী উচ্ছ্বাসে কেবলই স্খলিত ও বিভ্রষ্ট হইতে দিলে, তুমি সাফল্য লাভ করিবে

কিসের মহিমায়?—এই কথাগুলি নিয়ত চিন্তা কর। এই কথাগুলির যথার্থ মূল্য বুঝিয়া লও। এই কথাগুলিকে তোমার জীবনব্যাপী ব্রতসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লও। বিশ্বালিঙ্গন-কারী প্রেম লইয়া স্বদেশকে ভালবাস আর সমগ্র দেশের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি প্রেম ও সুবিচার-বুদ্ধি লইয়া আত্মগঠন কর। জীবনের প্রতিটি নূতন প্রভাত তোমাকে নতুন শক্তির সন্ধান দিক, প্রতিটি নিশীথ তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বীর্য্যবান্ দেখিয়া বিদায় নিক্।"

শুনাও এবং করাও

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত নিকরাইল-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভাল যাহা শুনিয়াছ, তাহা সকলকে শোনাও। ভাল যাহা করিয়াছ, তাহা সকলকে দিয়া করাও। তোমার নিজ কাণে শোনা সৎকথা অন্যের প্রাণে যমুনা উজান বহাইতে সমর্থ হউক, তোমার নিজ হাতে করা সৎকর্ম্ম অন্যের জীবনে যুগান্তর আনয়নে সমর্থ হউক। শুন এবং শুনাও। কর এবং করাও। ভাল কথাই শোন, ভাল কাজই কর। মন্দ কথা শোনা হইতে বিরত হও, মন্দ কাজ করা হইতে শত যোজন দূরে থাক। নিজে সৎকথা শুনিয়া সকলকে শুনানো এক প্রশংসনীয় পুণ্যকর্ম্ম। নিজে সৎকর্ম্ম করিয়া তারপরে তাহাই আবার অন্যান্যকে দিয়া করানো মহত্তর পুণ্য জানিও। সবাই

আমরা সবাইকে ভাল কথা শুনিতে ভাল কাজ করিতে উৎসাহিত করিব, এইটী আমাদের প্রতিজনের চরিত্রের বিশেষত্ব হউক। সকলের কৃতিত্বের মধ্য দিয়া আমার কৃতিত্ব সার্থক হউক। একা একা সৎকথা শুনিয়া একা একা সৎকর্ম্ম করিয়া আনন্দের পূর্ণতা কোথায়? সে আনন্দ সীমাবদ্ধ বস্তু। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চলিয়াছে শত শত বীণার ঝঙ্কার, প্রতিটির তার এক সুরে বাঁধা, প্রতিটি বাজিছে একই তালে, একই রাগে, একই লক্ষ্যে, একই উচ্ছ্বাসে,—ভাবিতেও ত' আনন্দ লাগে। প্রচার যখন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে, তখনই তাহা নিন্দনীয়। প্রচার যখন বিশ্বজনের নির্ব্বিরোধ হিতসাধন-কল্পে, তখন তাহা মহনীয়।"

মন্দিরকে মন্দিরই রাখ

রাজশাহী জেলান্তর্গত পানানগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও সদনুষ্ঠানের জন্য নামমাত্র বা যৎ-সামান্য সহযোগ করিবার পরে অনেক সুযোগ-সন্ধানী লোক ঐ অনুষ্ঠানটীর বা অনুষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠানটীর উপরে অবাধ কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, আচরণ কাপট্যপূর্ণ এবং প্রচ্ছন্ন দম্ভ ইহাদের প্রায় প্রতিটি কর্ম্মচেষ্টার প্রেরয়িতা। এমন লোকদের সম্পর্কে যাহারা সাবধান হইয়া চলিতে পারে না, মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের পথে

তাহাদের বারংবার কণ্টকাহরণের ক্লেশ ভুগিতে হয়। কিন্তু সহজে বা প্রথমেই ইহাদের চিনিতে পারা যায় না বলিয়াই যত মুস্কিল। এই কারণে উপদেশ দিতে চাহি যে, ইহাদিগকে চিনিতে পারিবার পরে সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ অবিলম্বে সাবধান হইয়া যাইবার বিষয়ে যেন তৎপরতার কদাচ অভাব না ঘটে। সৎকার্য্যের আবেদন বা সদাদর্শের আহ্বান মানুষের মনকে যখন মাতাল করিয়া তোলে, তখন এই চরিত্রের লোকগুলি স্বাভাবিক কাজগুলিকে জটিল করিয়া দিয়া প্রকৃত লক্ষ্য হইতে কর্ম্মীদের মন ভিন্নতর বা ইতর পথে পরিচালিত করিয়া দেব-মন্দিরের চত্বরে পঙ্কিল খালের কর্দ্দম আমদানী করে। মন্দিরকে মন্দিরই রাখো, মেছো হাটায় পরিণত হইতে দিও না।"

জাগ্রত হও ও জাগাইয়া তোল

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত রায়-গোবিন্দপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বপ্নে আমাকে দেখিয়াছ, খুব আনন্দের কথা। আমি তোমাদের কিবা স্বপ্নে, কিবা জাগরণে নিত্য তোমাদের সাথী থাকিবার জন্য আগ্রহে আকুল। যাহা দেখিয়াছ, ঠিকই দেখিয়াছ। ঘুমন্ত পৃথিবীকে আমি জাগিতে কহিতেছি, তবু সকলে ঘুমাইয়াই আছে, এ দৃশ্য দেখিয়াছ। কিন্তু ইহাও ত' দেখিয়াছ যে, তুমি আমার ডাক শুনিয়াছ, শুনিয়া আমার

কাছে আসিয়াছ, আসিয়া আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ যে, ঘুমন্তদের জাগাইয়া তুলিবার জন্য তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। ইহাও ত' দেখিয়াছ যে, আমি বলিয়াছি, তোমার চেষ্টা বিফল হইবে না। আমি বলিয়াছি, আমার প্রতিটি সন্তান আমার নিকটে এক একটী অমূল্য নিধি, আমি তোমাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে নিখিল জগতের কুশলের জন্য আত্মোৎসর্গ প্রত্যাশা করি। আমি বলিয়াছি, আমাকে পূজা করিবার জন্য তোমাদের ব্যগ্র হইতে হইবে না, অনাদি অতীতে আমার পূজা আমি নিজেই সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি। তোমরা আমার পূজা কর বা আমাকে পূজা করিবার প্রথাকে প্রবর্ত্তন কর, ইহা আমি চাহি না। আমি চাহি, তোমরা প্রত্যেকে জগদ্বাসীর সর্ব্ববিধ কুশল সাধনের কাজে নিজেদিগকে নিয়োজিত কর। হুজুগের হট্টগোলে তোমরা ভুলিয়া যাইও না যে, আমার ভিতরে যেমন করিয়া অবিচ্ছেদ-ভাবে পরমেশ্বর তাঁর পূর্ণ প্রতিভায় বিরাজ করেন, তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে আমি ঠিক তেমনি আমার পূর্ণ প্রতিভায় বিরাজ করিতেছি। আমি তোমাদের কাছে পূজা চাহি না, আমি চাহি তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে আত্মসম্বিতের জাগরণ। আমার জীবনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রতিটি ঘটনা, বাণী ও ভাবনা দ্বারা আমি মাত্র এই একটী কথাই তোমাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেকে তোমরা জাগ্রত হও এবং যাবতীয় নিদ্রালস মানুষকে জাগাইয়া তোল।"

অনিন্দক হও

নোয়াখালী জেলান্তর্গত পরকোট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের অঞ্চলে সম্প্রতি পুণ্যধাম নবদ্বীপের অধিবাসী নিত্যানন্দ-বংশধর একজন গোস্বামী-প্রভু কৃষ্ণনামে দীক্ষাদান ব্যপদেশে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম। তোমরা তাঁহাকে তাঁহার পদোচিত মান্যতা ও মর্য্যাদা দান করিও। সজ্জনকে সম্মান করিলে নিজের ভিতরে বিমল আত্মপ্রসাদ জন্মে এবং তাহা সাধক-মাত্রকেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা ও প্রেরণা প্রদান করে। কিন্তু তোমরা কেহ কেহ তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যাতে অন্তরে অত্যন্ত আহত হইতেছ বলিয়া লিখিতেছ। ইহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কথা বলিবার স্বাধীনতা জগতে সকলেরই আছে, সুতরাং কৃষ্ণ-চরিত্র ব্যাখ্যার কালে কেহ যদি কংসসূদন শ্রীকৃষ্ণকে তারস্বরে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা জানায় যে, কলিযুগের কংস এই স্বরূপানন্দটীর মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য, হে মুরারি, তুমি কেন চক্রহস্তে অবিলম্বে অবতীর্ণ হইতেছ না, তবে তাহাতে আমি দোষ দেখি না। তোমরা কেহ কেহ আমার অনুরাগী, কেহ কেহ বা শিষ্য—এই কারণে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিতে যদি তোমাদের ভাল না লাগে, তাহা হইলে তোমরা বরং ঐ সকল ধর্ম্মচর্চ্চার আসর হইতে দূরে থাকিতে পার। তোমরা ভদ্রলোকের ভাগবত-পাঠ-রূপ পুণ্য কার্য্যের মধ্যে বিঘ্ন

উৎপাদন করিও না। কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিতে করিতে যদি এই ঘোর কলিযুগের এক মার্কামারা পাষণ্ড স্বরূপানন্দের কথা তাঁহাদের পুণ্য রসনায় আসিয়া যায়, তবে ত' আমি নিজেকে বরং কৃতকৃতার্থই মনে করিব। ভদ্রলোকের কথা বলিবার স্বাধীনতার উপরে তোমরা হস্তক্ষেপ করিবে কেন? তোমরা উহা শুনিবে না বলিয়া যদি পণ কর এবং দূরে সরিয়া যাও, তবে তোমাদের এই স্বাধীনতার উপরেই বা অন্য কাহার কি বলিবার অধিকার আছে? যিনি যাহা প্রচার করিতে চাহেন, তিনি তাহা নির্ব্বিবাদে করিয়া যাউন, তোমরা গভীর নিষ্ঠায় তোমাদের নিজেদের মতে ও পথে দৃঢ়তার সহিত লগ্ন হইয়া থাক। এমন সময় একদা নিশ্চয়ই আসিবে, যখন এই গোস্বামী প্রভু এই পাষণ্ডটার পদতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া নিজেই বলিবেন,—'আমি ভুল করিয়াছি।' * এই সকল তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া তোমরা মাথা ঘামাইও না বা সময় নষ্ট করিও না। তোমরা নিজেরা কোনও ধর্ম্মকে, কোনও ধর্ম্মমতকে, কোনও ধর্ম্মাচার্য্যকে, কোনও ধর্ম্মাবলম্বীকে তাহার ধর্ম্ম নিয়া নিন্দা করিবে না, এই পণ লইয়া চল। একাধারে তোমরা অনিন্দকও হও, অনিন্দিতও হও। অন্যায় ভাবে যদি কেহ তোমাদের নিন্দা করে, তবে জানিবে, উহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই অধিকাংশ স্থলে ভাল।"

* বহু বৎসর পরে এই ভবিষ্যদ্বাণী আগরতলা শহরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

মৃত্যু ও শোক

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বরাইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মৃত্যুর হাত হইতে কোনও প্রাণীর রক্ষা নাই। একবার যে জীবন পাইয়াছে, একদা তাহাকে জীবন দিতেও হইবে। ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। সুতরাং শোকার্ত্ত হওয়া আমাদের সাজে না। শোক করিয়া লাভও কিছু নাই। যে চলিয়া গেছে, তাহাকে প্রাণভরা প্রেম-সহকারে বিদায় দেওয়াই অত্যুত্তম। প্রার্থনা রাখিতে হইবে, তাহার বিগত দিনগুলির দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ, অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা যেন তাহার সহগামী না হয়। প্রার্থনা রখিতে হইবে, অনির্দ্দেশ্যের পথে এই অন্তিম যাত্রার কালে সে যেন আনন্দ, তৃপ্তি, সুখানুভূতি ও সন্তোষ লইয়া রওনা হইতে পারে। প্রার্থনা রাখিতে হইবে, সে যেন তাহার বর্ত্তমান জন্মের সুখ-দুঃখের প্রভাবের অধীনতা পরিহার করিয়া অনন্ত অমৃতময় আনন্দলোকের প্রতিক্রিয়াহীন অনির্ব্বচনীয় সুখরাশির অধিকারী হইতে পারে। কোনও কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এই জন্য যে, শোক করিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, হাহাকার করিয়া আমরা তাহার আত্মার কোনও হিত সাধন করিতে পারি না। তথাপি স্বভাবতই মানুষের মনে শোক জাগে। শোকের একমাত্র সার্থকতা এই যে, ইহা মানুষের মনকে বিনম্র করে, স্পর্দ্ধাহীন

করে, ঈশ্বরানুগত করে। শোক প্রদর্শন না করিলে লোকে নিষ্ঠুর বলিবে, ইহা নিতান্তই স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরই উক্তি। যাহার সহিত জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইলে, যাহাকে মরমের মরমী, দরদের দরদী বলিয়া দীর্ঘকাল একেবারে নিঃশ্বাস-বায়ুর মতন আপন করিয়া জানিলে, সে দেহটী ছাড়িয়া চিরতরে চলিয়া গেল, তথাপি অন্তরে শোকানুভূতি জাগিল না, এইরূপ অবস্থা এক হইতে পারে বদ্ধ পাগলের, নতুবা জীবন্মুক্ত পরমহংসের। অপরের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং তুমি আত্মীয়বিয়োগে অধীর হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে নিন্দা করিতে পারি না। তবে হিতবাণী এই শুনাইতে পারি যে, শোক করিয়া বাস্তব লাভ যখন কিছুই দেখা যাইতেছে না, তখন প্রজ্ঞাবলে শোককে অপনোদিত করিয়া পরলোক-প্রস্থিতের নিত্য মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা, আরাধনা এবং অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠান করিয়া যত দ্রুত সম্ভব মনকে শোকমুক্ত করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। ইহা সহানুভূতিবর্জ্জিত কোনও কঠোর-হৃদয় নিষ্ঠুরের মুখের কথা নহে, হিতকারী ও হিতকামী বান্ধবের বচন।"

ভারতবাসীর রাষ্ট্র-ভাবনা

ঢাকার অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভারতবাসীর রাষ্ট্রচিন্তা সাধারণতঃ রাজাকে ঘিরিয়া, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে। রাজানুগত্যকে আমরা

যতটা মজ্জাগত করিয়া নিতে পারিয়াছি, আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে দেশানুগত্যের তেমন দৃষ্টান্ত নাই বা খুবই অল্প। পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রাচীন তথ্য ঘাটিয়া প্রজাতন্ত্রের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বটে কিন্তু ভারতের একটা প্রজাতন্ত্রও কখনো সমুদ্রগুপ্তের, স্কন্দগুপ্তের, চন্দ্রগুপ্তের, অশোকের বা হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের মত বিরাট আকারের হইয়াছে কিনা সংশয়স্থল। গ্রীকজাতিও প্রজাতন্ত্র-পরায়ণ বলিয়া প্রথিত কিন্তু তাঁহারা প্রজাগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রাজ্য-শাসন করাইয়াছেন বলিয়াই হয়ত রোমের মতন বিরাট আয়তনের সাম্রাজ্য তাঁহাদের কদাচ হইতে পারে নাই। ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার প্রজাতন্ত্রী না হইয়া স্বৈরতন্ত্রী ছিলেন বলিয়াই হয়ত তাঁহার পক্ষে পৃথিবীর দুই তিনটী মহাদেশের অংশবিশেষ লইয়া বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রের ব্যাপারে চিন্তা করিতে গেলে এইরূপ এলোমেলো নানা চিন্তাই মনকে অধিকার করিতে পারে। বছর চৌদ্দ আগে মহামতি বিপিনচন্দ্র পাল ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে ডিমোক্র্যাটিক স্বরাজ বা গণতন্ত্রী স্বাধীনতার দাবীর পক্ষে ওকালতি করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্যক্তিপূজায় অনুরক্ত ভারতবাসী সেই প্রস্তাবকে স্পর্দ্ধা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল এবং এত বড় একজন অসাধারণ দূরদর্শী রাজনীতি-বিশারদকে জীবন্তে কবর দিয়া ফেলিয়াছিল। আমাদের রাষ্ট্রচিন্তায় সুস্পষ্ট

ধারণার কোনও স্থান নাই, কারণ আমরা প্রায় অনাদি অতীত হইতে যৎসামান্য গণতন্ত্রী চিন্তার সঙ্গে রাজতন্ত্রী চিন্তাকে অসাধারণ প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছি। ১৯০৫, ১৯০৮ বা ১৯১০ এর স্বাধীনতা-কামী বঙ্গীয় যুবকেরা এ সকল কথা ভাবিবার অবকাশ পান নাই কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান কালের খোঁজ-খবর কিছু কিছু পাইতে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারা মনে মনে ইহা ভাবিয়া প্রমাদ গণিতেছেন যে, সমগ্র জাতির ভিতরে আন্দোলন সুপ্রচারিত হইয়া থাকিলেও রাষ্ট্রচিন্তার স্বচ্ছতা কাহারো মানসিকতায় বা নয়নের রশ্মিরাশিতে নাই। ফলে একই সঙ্গে মুসলমানরা ভাবিতেছেন যে, এবার দিল্লীর তখ্‌ত-তাউসে আলাউদ্দিন খিলজী আসিয়া বসিবেন, সিংহোপাধিক শিখ সর্দ্দারেরা ভাবিতেছেন যে, আবার রণজিৎ সিংহের আবির্ভাব ঘটিবে এবং বিচ্ছিন্ন জাঠাগুলিকে একত্রীভূত করিয়া তিনি নূতন করিয়া এক শিখ-ভারত গঠন করিবেন, হিন্দুরা ভাবিতে সুরু করিয়াছেন যে, ছত্রপতি শিবাজীর পুনরাবির্ভাবই যাবতীয় সমস্যার একমাত্র মীমাংসা এবং এবার শিবাজী ভারতের অংশবিশেষ নিয়া রাজত্ব করিবেন না, করিবেন সমগ্র ভারতবর্ষ লইয়া। অপক্ষপাত দৃষ্টিতে যাঁহারা এই সকল বিভিন্ন-দিক্‌-সঞ্চারী মনগুলির দিকে তাকাইবেন, তাঁহাদের মনে স্বভাবতই এই ধারণা আসিবে যে, এক সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত

রাজতন্ত্র অপর সম্প্রদায়-সমূহের পক্ষে উৎপীড়ক ও অসহিষ্ণু যে হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া মানুষের রাষ্ট্রচিন্তা গণতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতী হইবে। কিন্তু জনগণের নাম করিয়া, জনগণের প্রতিনিধি সাজিয়া, জনগণের সেবক-রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া যাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবেন, তাঁহারা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তখনকার অবস্থাই বা কি হইবে, তাহার প্রতিকারই বা কি হইতে পারে, এ সকল কথা কয় জনের মনে উকি মারিতে সমর্থ হইতেছে? রাজতন্ত্র যখন বিপথচারী, তখন একটী মাত্র লোককে অপসারিত করিতে পারিলেই বেহাল নৌকা হয়ত সৎ কাণ্ডারী খুঁজিয়া পাইতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র যখন হইবে ব্যভিচারী, তখন কতজনকে অপসারিত করিবার পরে রাষ্ট্রনৌকা সবগুলি পাল তুলিয়া দিয়া তরঙ্গাকুল সমুদ্রের সহস্র ঢেউ কাটিয়া লক্ষ্য-পথে দিব্যি নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারিবে? এতগুলি কথা চিন্তা করিয়াই তোমাকে তোমার প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। তোমার প্রশ্ন নিয়া তুমি ভাবিতে থাক। একদিন সদুত্তর পাইয়া যাইবে। আমি শুধু ভাবিতেছি এই কথাটী যে, নির্লোভি চাণক্য যদি না চন্দ্রগুপ্তের প্রধান উপদেষ্টা হইতেন, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন? রাষ্ট্র-চিন্তার ভিত্তি যদি না সচ্চরিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে কোটি চিত্ত-মনোহারী কর্ম্মপ্রকল্পও জনগণের দেহে আর মনে শ্মশানাগ্নির সন্তাপ সৃষ্টি করে।

আমরা বরং দুই চারি জন জীবনে কোনও রাজনীতি নাই করিলাম কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই অর্থাৎ তোমার আমার ও প্রত্যেকের চরিত্র-নীতির দিকে তীব্রতর লক্ষ্য প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আমাকে আমার স্কুল-পাঠ্য-জীবনেও দেখিয়াছ। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইতেছ যে, আমার মতামত ও মনোভাব সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো দিক্ দিয়াই এককণাও বদলায় নাই। প্রকৃত সত্য অনন্ত কাল ধরিয়া অবিকৃত থাকে।"

পরের দুঃখ ও নিজের দুঃখ

ঢাকা জেলান্তর্গত মাতুয়াইল-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি আমি সকলেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ ও সমস্যা নিয়া বড়ই আকুল। আমরা কিন্তু একবারও ভাবি না যে, আমাদের প্রতি জনের চাইতেও অনেক বেশী দুঃখ, বেশী কষ্ট পাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক জগৎ জুড়িয়া হাহাকার করিতেছে। আমাদের দুঃখ যখন তাহাদের অপেক্ষা অল্প, তখন তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা পরের দুঃখের কথা একেবারেই ভাবি না বলিয়াই ত' আমাদের নিজেদের দুঃখ আর ঘোচে না।"

তীর্থ

খুলনা জেলান্তর্গত ফকিরহাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শুনিয়াছি, ইংল্যাণ্ডের ছেলেমেয়েদের পড়া শেষ হইয়া গেলে একবার কন্টিনেন্টে ঘুরিয়া আসার বাতিক আছে। কন্টিনেন্ট মানে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ইটালি, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ। এই ভ্রমণটা সখের ভ্রমণ কিন্তু শিক্ষামূলক। নানা দেশ ভ্রমণের দ্বারা মানুষের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বলব্ধ শিক্ষাকে পূর্ণতা প্রদান করে। আমাদের দেশের লোকেরা শিক্ষার জন্য বিদেশে ভ্রমণ কমই করে কিন্তু ধর্ম্মলাভের ব্যগ্রতায় তীর্থভ্রমণ করে। তীর্থ বলিয়াই সেই স্থানগুলি যে জন-মানব-বর্জ্জিত গহন অরণ্য বা দুস্তর মরুভূমিই হইবে, এমন নহে, সব তীর্থেই প্রচুর মানুষ বাস করে এবং নানা জনে নানা বিচিত্র জীবিকার পথ অনুসরণ করে। অতএব কেহ যদি খোলা চ'খ নিয়া তীর্থ ভ্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারাও তাহাদের নানাবিধ শিক্ষা লাভ হইতে পারে। এই জন্যই তোমার নানা তীর্থ ভ্রমণের আগ্রহ জন্মিয়াছে সংবাদে সুখী হইয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও, তাহাই তীর্থ, যাহা কোনও সিদ্ধ তাপসের তপোভূমি। যেখানে বসিয়া কেহ নিষ্কাম চিত্তে ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন বা

জীবকল্যাণব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানই তীর্থ। এই তাপস হিন্দু হইতে পারেন, মুসলমান হইতে পারেন, খ্রীষ্টান হইতে পারেন, ইহুদী বা বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ হইতে পারেন। তিনি কোন্ জাতের আর কোন্ ধর্ম্মের, ইহা আমার বিবেচ্য নহে, তিনি যে তপস্যাটুকু করিয়াছেন, আমার শ্রদ্ধা সেখানে।"

আসল কাজ ও নকল কাজ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত পূর্ব্বধইর গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাজের লোকের আবার ঠেকা আর বেঠেকা। হাজার বিপদের মধ্যেও তাঁহারা তাঁহাদের আসল কাজ অবিরামই করিয়া যাইতে থাকেন, প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে পারেন না। জীবসেবাই যাঁর কাজ, তিনি নিজের ঘরে আগুন দেখিয়াও পরের ঘরের আগুনটাকে আগে নিবাইবার জন্য জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকেন, কোনো বাধা, কোনো যুক্তি মানেন না। নাম-সেবা যাঁর কাজ, তিনি মল-মূত্র ত্যাগ করিবার সময়েও মনে মনে নাম জপিয়াই যাইতে থাকেন, থামেন না। জীবন-ভরা হাজার কাজের মাঝে কোনো কোনো কাজ আসল, কোনো কোনো কাজ নকল। নকল কাজ দুদিন পরের জন্য ফেলিয়া রাখা চলে কিন্তু আসল কাজকে ক্ষণকালের জন্যও অবহেলা করিবার উপায় নাই।"

বারংবার ভুল করিবে কেন

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত মহম্মদপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানুষ-মাত্রেই কখনো না কখনো কিছু না কিছু ভুল করিয়া থাকে। ইহার জন্য তাহাকে গঞ্জনা করিতে যাওয়া নিরর্থক। কিন্তু একই ভুল একটী মানুষ বারংবার করিবে কেন? নিরীহ প্রকৃতির মানুষ না বুঝিয়া ভুল করে। দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ বুঝিয়াও ভুল করে, একবার ভুল করিয়া তার জন্য অনুতপ্ত হয় না, ফলে বারংবার ভুল করে। ইহা কল্যাণকর নহে, ইহা সর্ব্বনাশের রাস্তাই পরিষ্কার করে। মানুষ ইন্দ্রিয়-ঘটিত ভুল করে কামের বশে। মানুষ চৌর্য্যজাতীয় ভুল করে লোভের বশে। মানুষ হঠকারিতা-প্রযুক্ত ভুল করে দম্ভের বশে। মানুষ হিংসামূলক ভুল করে ক্রোধের বশে। ভুল করিয়া অনুতপ্ত হইলে এবং এই অনুতাপ প্রকৃত হইলে মানুষ 'একাজ আর করিব না' বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সে তাহার ক্রোধকে, দম্ভকে, লোভকে ও কামকে করমুষ্টি-কবলিত করিবার জন্য সাধনায় ব্রতী হয়। খুঁজিয়া বাহির কর, কে তোমাকে বারংবার পাপকার্য্যে লিপ্ত করাইতেছে। কাম? না লোভ? না দম্ভ? না ক্রোধ? তাহাকে সতর্ক দৃষ্টিতে চিনিয়া লও এবং তাহাকে নিজের অধীন

করিবার চেষ্টা কর। অমুক কুমারীর অনভিজ্ঞ জীবনের মুকুলোচিত সরলতা তোমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। দোষটা কি তার সরলতার, না তোমার অভ্যন্তরস্থ দুরন্ত কামের? অমুক সধবার স্বামী দ্বারা নির্য্যাতন ও অবহেলা দর্শনে তুমি দয়াপ্রযুক্ত তাহার সমীপস্থ হইয়াছিলে। দোষটা কি তার, না তোমার? এই দয়া কি প্রকৃত দয়া? এই সহানুভূতি কি প্রকৃত সহানুভূতি? তোমার অন্তরের কাম ছদ্মবেশ পরিয়া তোমাকে কি বিপথ-চালিত করে নাই? একটা কাজই বারংবার করিতেছ এবং নিত্য নূতন ভাণ সৃষ্টি করিয়া সেই ভাণের আড়ালে নিজের ভোগাভিলাষকে লুকাইয়া রাখিয়া ঘনিষ্ঠতার পর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ। আসল প্রেরয়িতা তোমার কাম। এই কামকে তোমার দমন করিতে হইবে, তাহাকে নীতির বাঁধনে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে হইবে, যখন সাংসারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে যোগ্য পাত্রে তাহার ব্যবহার সঙ্গত হইবে, মাত্র তখন তাহাকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। কামকে যে জয় করিয়াছে, সে বিশ্বজয় করিয়াছে বলিতে হইবে। ইহাকে জয় করিবার সহায়তা করিবার জন্যই ত' নানা সমাজে নানা সামাজিক সদ্‌বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাকে জয় করিবার সহায়তা করিবার জন্যই ত' ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ নানা সদুপদেশ ও সদাচরণ তদ্ধর্ম্মানুসারীদিগের জন্য অবশ্য-পালনীয় করিয়া রাখিয়াছে। সকল ধর্ম্মমতের উপদেশ হয়ত ঠিক এক নহে কিন্তু সকল উপদেশেরই লক্ষ্য এক,—অর্থাৎ একটী

একটী করিয়া শত সহস্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা, যাহারা কামের ক্রীড়নক নহে, যাহারা ইন্দ্রিয়-লালসা-কিঙ্কর নহে, যাহারা কামজয়ী মহাপুরুষ। জগতে অনেক অনেক নরনারী নিজ নিজ জীবনে কামদমনের সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, একথা ধ্রুব সত্য।"

লঘু ও গুরু

বরিশাল জেলান্তর্গত ঝালকাঠি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লোকে যখন তোমাকে গুরুর মতন মান্য করিতে শুরু করিয়াছে, তখন তোমার এই বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, নিজের কোনও দুর্ব্বলতার দরুণ হঠাৎ লঘু না হইয়া যাও। লঘুর পক্ষে গুরু হওয়া সুকঠিন কিন্তু গুরুর পক্ষে লঘু হইয়া পড়া বড়ই সহজ। সতর্কতা হিসাবে তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, একাকিনী অবস্থার কোনও স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিবে না বা বাস করিবে না, স্ত্রীলোকের দ্বারা শরীর-মর্দ্দন, পদসেবা প্রভৃতি করাইবে না, এমন কোনও চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান করিবে না, যাহার ব্যাখ্যা কদর্য্য হইলে হইতে পারে, এমন কোনও ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি করিবে না, যাহা সকলের চক্ষে নির্দ্দোষ নহে। স্ত্রীলোক লইয়া এমন কোনও অপবাদ কদাচ সৃষ্ট হইতে দিবে না, যাহা তোমার পক্ষে বা তাহার পক্ষে অবমাননাকর এবং ক্ষতিকর। স্ত্রীলোকের গায়ে

হাত দিয়া কথা বলা, স্ত্রীলোকদের সহিত একাসনে উপবেশন করা, স্ত্রীলোক-বিশেষের প্রতি অতিরিক্ত আদর বা আকর্ষণ প্রকাশ করা তোমার পক্ষে নিদারুণ ভুল হইবে। সর্ব্বোপরি বড় কথা এই যে, যদি মানুষের মনে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহ, তাহা হইলে দেহকে এবং মনকে যুগপৎ নিষ্কলুষ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য মরণ-পণ করিয়া পথ চলিতে হইবে।"

গতকল্যের ন্যায় অদ্যও আসন-মুদ্রা শিক্ষাদানের ক্লাস চলিল এবং যাবৎকাল শ্রীশ্রীবাবামণি রংপুরে থাকিবেন, তাবৎকাল প্রত্যহ চলিতে থাকিবে বলিয়া প্রচারিত হইল।

সুধন্য দেশ

অপরাহ্ণে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল এর মাঠে শ্রীশ্রীবাবামণির নবম বক্তৃতা হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষকে নীচতা, হীনতা ও দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে টেনে তুলে নেওয়ার জন্য ব্যাপক সদুপায় জগতে যতগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তম্মধ্যে ভগবৎ-প্রেম আর স্বদেশ-প্রেম দুই দিকের বিচারে দুইটী শ্রেষ্ঠ উপায়। ভগবৎপ্রেম মানুষের ইহমুখতা নষ্ট করে, ফলে স্বার্থপরতা ও কামলালসা কমায়। স্বদেশপ্রেম মানুষের ব্যক্তি-স্বার্থ বোধকে খর্ব্ব করে এবং অফুরন্ত বীরভাবের উৎসমুখ খুলে দেয়, যার ফলে

সাময়িক ভাবে হ'লেও মন হীন চিন্তা, নীচ কার্য্য, কদর্য্য আসক্তি এবং অপকারক সংসর্গ থেকে রক্ষা পায়। এই কারণেই ভগবদ্-ভক্তেরা যেমন, স্বদেশ-প্রেমিকেরাও তেমন জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধার আসন পান। এটা তাঁদের প্রাপ্য ব'লেই পান। এঁরা যখন শ্রদ্ধিত, বন্দিত, পূজিত হন, তখন সাধারণ লোক এঁদের আদর্শের প্রতি ও জীবন-যাপনের রীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এঁদের মধ্যে সহজলভ্য সদ্‌গুণগুলিকে নিজ নিজ চিন্তায় ও আচরণে প্রতিফলিত কর্ব্বার চেষ্টা ক'রে থাকে। এর ফলে এক এক জন মহামনা ভগবৎ-প্রেমিক বা অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমিকের দৃষ্টান্তানুসরণকারী শত শত ছোট ছোট প্রেমিকের সৃষ্টি হয়। যে দেশে মহতের আবির্ভাবের ফলে ছোট ছোট মানুষেরা মহৎ হবার পথে দলে দলে পাদচারণা করে, সেই দেশ সত্যই সুধন্য।

ধর্ম্মের ঐহিকতা ও পারত্রিকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎ-প্রেমিকেরা অধিকাংশেই যে ইহজগতের দাবী ও প্রয়োজনের সম্পর্কে উদাসীন, এই বাস্তব সত্যটুকু কোনো কোনো ধর্ম্মাবলম্বীদের ঐহিক উন্নতির যে বাধা হয়েছে, একথা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। যে সব ধর্ম্ম পারত্রিক কুশলের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব অভ্যুদয়কে সমান তালে চালিয়ে যাবার প্রেরণা জুগিয়েছে, সেই সকল ধর্ম্মের উপদেশের মধ্যে তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের সুযোগ কম থাকলেও সেই সকল

ধর্ম্মের অবলম্বনকারীদের যে পৃথিবীতে নানা ভাবে শ্রীবৃদ্ধি বেড়ে চলেছে, একথাও অনেকেই স্বীকার কত্তে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু পার্থিব উন্নতির বা জাগতিক বিস্তারের ফলে এই পৃথিবীতে শান্তি ও মৈত্রী, জীবে জীবে প্রেমভাব এবং সর্ব্বজীবের অন্তরে ভয়হীনতা জেগেছে কিনা, এইটাও নিশ্চিতই একটা অনুসন্ধানের বিষয়। ধর্ম্ম যদি সম্প্রদায়-বিশেষকে পার্থিব জগতে সংখ্যাধিক্য বা সিংহাসন দান ক'রে থাকে, তবে সেটা সেই ধর্ম্মের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের কথা কিন্তু জগতের মানুষের মনে ধর্ম্ম যদি শান্তি, আশ্বাস, নির্ভরতা ও নিশ্চিন্ততা দিতে পেরে থাকে, তবে তা' হবে অধিকতর গৌরব। স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনা যদি ধর্ম্ম থেকে আসে, তা' হ'লে স্বদেশ-প্রেমেরও চূড়ান্ত ফল হওয়া উচিত সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রী এবং সর্ব্বজীবকে অভয়দান। ধর্ম্মের দানে ঐহিকতা থাকবে না, এটা যেমন একটী দুরন্ত সর্ত্ত, ধর্ম্ম মানুষের স্বদেশপ্রেম বাড়াবে না বা ধর্ম্ম ও স্বদেশপ্রেম পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ক'রে তবে বাড়বে, এটাও একটা দুরন্ত সর্ত্ত। এই সর্ত্ত কদাচ প্রতিপালিত হ'তে পারে না। কারণ, ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কুশল যার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যুগপৎ লব্ধ হতে পারে, মাত্র তারই নামকরণ হওয়া উচিত ধর্ম্ম ব'লে।

অন্তরের তৌলযন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্যেরা কোথায় কে কবে কি ভেবেছেন, তা' জানতে পারা নিশ্চয়ই

সৌভাগ্যের কথা কিন্তু আমাদের মত অজ্ঞ জনসাধারণ, যারা সকল ধর্ম্মাচার্য্যের সকল মতামত জানেন না বা বুঝতে পারেন না, তাঁদের এজন্য উদ্বিগ্ন হবার কারণ কিছু নেই। কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রত্যেকটা মানুষকে সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে নিজের হাতে ওজন ক'রে নেবার জন্য একটী ক'রে তৌলযন্ত্র দিয়ে দিয়েছেন। সেই যন্ত্রটী নিয়ত নিজের কাজ মনের অভ্যন্তরে বসে ক'রে যাচ্ছে। তার কাঁটার দিকে একটুখানি নজর রাখতে পারলেই আমাদের হ'ল। সর্ব্বশাস্ত্র পড়া কি সকলের পক্ষে সম্ভব? সকল ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশের সহিত পরিচিত হওয়া কি কারো পক্ষে সহজ? বিভিন্ন উপদেষ্টার উপদেশের মধ্যে যেখানে যেখানে গরমিল বা বিরোধ দেখা যায়, তার শঙ্কা-সমাধান জগতে কয় জনে কত্তে পারে? অতীত কালের সত্যদর্শীদের সব উপদেশ কি অবিকৃত ভাবে আমাদের যুগের লোকের কাছে এসে পৌছেছে? ভাবী কালের জ্ঞানীদের উপদেশগুলিই বা আমরা এত অগ্রিম কি ক'রে জান্‌তে পারব? এত সব অসুবিধা থাকার দরুণই স্বভাবতঃ আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে আমাদের মনের ভিতরে সযত্নে রক্ষিত সেই তৌল-যন্ত্রটীর প্রতি। যাতে এই তৌলযন্ত্রটী বিকৃত না হয়, ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, যাতে এই যন্ত্রটী থাকে অক্ষুণ্ণ ও অটুট, তারই জন্য আমাদের প্রাচীন আচার্য্যেরা উপদেশ করেছিলেন।—কৈশোরে কর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন, যৌবনে কর সাংসারিক জীবনে সেই অনুশীলনের সময়োচিত

সম্প্রসারণ, প্রৌঢ়ে কর সকল ক্ষয়ক্ষতির অনুপূরক সুতীব্র সাধন এবং বার্দ্ধক্যে কর নিজ জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রে অকাতরে বিতরণ।

চমৎকার

বক্তৃতা দুই ঘণ্টাকাল হইল। অন্যান্য দিনের তুলনায় অদ্যকার বক্তৃতা কাহারও কাহারও নিকটে একটু শুষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হইল কিন্তু শ্রোতারা প্রত্যেকে শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি শুনিলেন।

বক্তৃতাটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুর রাধারমণ মজুমদার, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট জ্ঞানী শ্রোতা একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—চমৎকার!

রংপুর

২০শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪২

(৫ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

প্রতিশ্রুতির অসারতা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ঘনিয়ারচর-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রতিশ্রুতি দান আর কর্ম্ম-সম্পাদন এই দুইটী জিনিষের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। কেহ কোনও

প্রতিশ্রুতি দিলেই তাহার ভিত্তিতে কালনেমির লঙ্কাভাগ করিতে বসিও না। কথায় বলে, না আঁচাইতে বিশ্বাস নাই। হাতের কড়ি গণিয়া কাজের এষ্টিমেইট করিও, যে অর্থ পরহস্তে রহিয়াছে, তাহাকে গণনায় আনিও না। অনেক বড় বড় কাজ জগতে পরের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপরে ভরসা করিয়া শুরু করার পরে অঙ্কুর না গজাইতেই নির্ম্মূল হইয়াছে। নানা স্থানে নানা সময়ে আশ্রম করিতে গিয়া আমি স্থানীয় লোকদের কাছ হইতে অনেক দামী দামী স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি কিন্তু কার্য্যকালে দেখিয়াছি যে, ঐগুলির কথা লোকে কয় দিন পরেই একেবারে ভুলিয়া যায়। পরমুখাপেক্ষা আমার নাই বলিয়াই ইহাতে আমার মনে কোনও ক্লেশের সৃষ্টি হয় নাই কিন্তু তোমাদের হইবে। যে পাখীটা হাতের মুঠার মধ্যে আছে, তাহা নিয়াই কল্পনাকে লাগিয়া থাকিতে দাও, যে পাখী এখনো বনে বিচরণ করিয়া, আকাশে উড়িয়া, এখানে সেখানে গান গাহিয়া বেড়াইতেছে, তাহার শরীরে কত মাংস আছে হিসাব করিয়া তার অনুপাতে মশলা বাটিতে বসিও না। কথায় বলে,—আপন হাত জগন্নাথ। লোকেরা প্রতিশ্রুতি দিতে যত পটু, প্রতিশ্রুতি পালনে তত পটু নহে। কি প্রয়োজন তোমার পরমুখপানে তাকাইবার? নিজের চরকায় যতটুকু সূতা কাটিতে পারিবে, সেই হিসাবেই তোমার কোমরের গামছাখানার মাপ ঠিক কর।"

আত্মপ্রচার ও আত্মাহঙ্কার

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত পাঁচগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আত্মপ্রচার যখন পরকল্যাণোদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয়, তখন তাহা করিতে দোষ নাই। কিন্তু কিসে যে পরকল্যাণ আর কিসে যে আত্মাহঙ্কার প্রকাশ হইবে বা হইবে না, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে হইলে অতীব সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির প্রয়োজন। এই কারণেই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য নিজেকে একান্ত ভাবে ঈশ্বরানুগত করিয়া কাজ করিয়া যাওয়া। ঈশ্বরানুগত ব্যক্তির আত্মপ্রচারও পরমেশ্বরেরই মহিমা প্রচারে পর্য্যবসিত হয়। দারোগা যদি নিজেকে চৌকিদার বলিয়া পরিচিত করে, তবে তাহাতে বিনয় হইলে হইতে পারে কিন্তু সত্যের যে অপলাপ ঘটে, ইহা নিঃসন্দেহ। আর, দারোগা নিজেকে দারোগা বলিয়া পরিচিত না করিলে চোরকে ধরিবার সময়ে কায়দা করিবে কি করিয়া? 'আমি দারোগা' একথা শুনিবামাত্র চোরের যে হৃৎকম্প হইবে, 'আমি একজন চৌকিদার' বলিলে কি চোরের তাহা হইবে? চোরকে ধরিতে হইলে তাহার মনে হৃৎকম্পের সৃষ্টি করা একটা অত্যাবশ্যকীয় কৌশল, যাহা দারোগার সত্য কথনের দ্বারা সহজে হইতে পারে। বিনয় বশতঃ সাধু-সজ্জন যদি নিজেকে চোর বা দুর্জ্জন বলিয়া বর্ণনা করেন, তবে তাহাতে বিনয় হইলে

হইতে পারে কিন্তু তাহাতে মিথ্যাচার ত' হয়ই, 'আমি যে কত বিনয়ী' এই ভাবের প্রচ্ছন্ন গর্ব্বেরও চর্চ্চা হইতে পারে। সুতরাং আত্মপ্রচার যখন তোমার কোনও মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের সহায়ক হইবে, তখন কেন তুমি আত্মপ্রচার করিবে না? হাতুড়ে ডাক্তার নিজেকে এম-বি বা এম-ডি বলিয়া প্রচার করিলে তাহা মিথ্যা এবং দণ্ডনীয় হয় কিন্তু এম-বি বা এম-ডি উপাধি যেই জন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্জ্জন করিয়াছে, সে বিনয় বশতঃ নিজেকে হাতুড়ে বলিয়া পরিচিত করিয়া চিকিৎসার্থীর মনে ধোকা কেন দিবে? তুমি নিজে জ্ঞান ও বিদ্যা যেই বিষয়ে যতটুকু আহরণ করিয়াছ, ততটুকুর স্বীকৃতি প্রয়োজন-স্থলে নিশ্চিতই করিতে পার। তাহাতে আত্মপ্রচার হইয়া গেল ত' কি ক্ষতি হইল? তবে, জ্ঞান-জলধি অগাধ, অপার ও অসীম। যে-ই যত শিখুক আর জানুক, তার চেয়েও বেশী শিক্ষিত ও বেশী জ্ঞানী হাজার হাজার লোক চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং অহঙ্কার থাকা ভাল নহে।"

প্রেম ও ত্যাগ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত শরিফপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার চিত্তের শুদ্ধতা তোমাকে দিয়া কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করাইয়াছে। তোমার প্রাণ জগদ্বাসীর প্রতি প্রেমে

ভরপুর হইলে তুমি তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। প্রেমই ধর্ম্মের মূল কথা, প্রেমই ধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয়। প্রেমহীন মানুষগুলি যখন বাহ্য-আড়ম্বরে মাতিয়া ওঠে, তখন অপরের মনে আহ্লাদ না জন্মিয়া জন্মে আতঙ্ক। যে যতটুকু পার, প্রেমিক হও। তাহা হইলেই ত্যাগ তোমার একটী স্বভাব-সম্পদে পরিণত হইবে।"

অবতার হইতে চাহি না

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত নবীয়াবাদ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এমন মানুষ গণ্ডায় গণ্ডায় কখনো মিলিবে না, যাহারা রোগ, শোক, অভাব, অনটন, দুঃখ ও দুর্দ্দশাকে অগ্রাহ্য করিয়া কোনও একটা সৎ ও পবিত্র আদর্শকে প্রচারের জন্য নিজ জীবিকার্জ্জনের জন্য আবশ্যকীয় সময়টুকু ছাড়া জীবনের বাকী সময়টা অক্লেশে দান করিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে অবতার বা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নররূপী প্রতিনিধি বলিয়া প্রচারের আন্দোলন উপস্থিত করিলে সেই আন্দোলনের অংশভাক্ হইবার জন্য অগণিত মানুষের আগ্রহাকুল আগমন প্রতিরুদ্ধ করা এদেশে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহার রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম্মীয় কারণ অথবা যুক্তি যাহাই হউক, ইহার পশ্চাৎপটে একটা

নিগূঢ় কারণ এই রহিয়াছে যে, বাস্তবতঃ জগতের প্রত্যেকটী মানুষের ভিতরেই ভগবৎ-সত্তা বিরাজমান। সেই সত্তাকে অনেকে আধারের অস্বচ্ছতার দরুণ প্রতিজনের ভিতরে দেখিতে পায় না বটে কিন্তু কোনও কোনও স্বচ্ছ, সুপবিত্র, শুচিতাবিমণ্ডিত, সুন্দর আধারে সেই সত্তাকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা নির্দ্দিষ্ট একটা আধারে তাহা দেখে, তাহারা কয়েক জনে দলবদ্ধ হইয়া গেলেই অবতার-বাদ প্রচার শুরু হইয়া যায় এবং সরলবিশ্বাসী নিরীহ মানুষেরা তাহাদের ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্যে ও রস-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় নব অবতারের পূজার জন্য অগ্র-পশ্চাৎ-বিবেচনা-শূন্য হইয়া ছুটিয়া যায়। অবতার-বাদ প্রচারের পিছনে বৈদান্তিক এই মূল সত্যটা রহিয়াছে যে, মানুষ-মাত্রেরই মধ্যে ভগবৎ-সত্তা বিরাজমান এবং ভগবৎ-সত্তা যেখানেই উপলব্ধ হউক, পূজা প্রদান সেখানেই স্বাভাবিক। এই তত্ত্বটা বুঝিবার অক্ষমতা হেতু এক অবতারের ভক্তেরা অন্য অবতারের আবির্ভাবকে প্রসন্ন নয়নে দেখিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতার হইতে পারিয়া থাকেন, তবে শ্রীচৈতন্যের অবতার হইতে দোষ নাই। কিন্তু এমন ঘটা বিচিত্র নহে যে, শ্রীচৈতন্যকে যখন অবতার বলিয়া প্রচার করা হইতেছিল, তখন কৃষ্ণভক্ত কেহ কেহ হয়ত আপত্তির উদ্ধত সুর চড়াইয়াছিলেন। শাক্ত বা বিষহরি-পূজকদের

বিরোধিতার ত' সাহিত্যিক প্রমাণ রহিয়া গিয়াছেই কিন্তু প্রাক্-চৈতন্য যুগের কৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বে কেহই যে আপত্তি তোলেন নাই, এমন কোনও অকাট্য প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত গবেষকদের হস্তগত হয় নাই। অবশ্য, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণপূজাকেই নবতর উদ্যমে, নবতর উৎসাহে, নবতর পরিবেশে, নবতর রূপায়নে ও নবতর দার্শনিকতার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া আপত্তি-কারক কেহ থাকিয়া থাকিলে তাহাদের স্বভাবতই অত্যন্ত ক্ষীণবল থাকিতে হইয়াছিল, একথা অনুমান করা যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রচার করা শুরু হইলে প্রথম সূত্রপাত হইতেই যে বৈষ্ণব-মতাবলম্বীরা ইহার বিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা ত' আমরা নিজেদের চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নিজেদের কর্ণে শুনিয়াছি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করার প্রয়াসের পশ্চাতে এমন সব সর্ব্বজনীন আবেদন ছিল এবং সেই প্রচার-শৈলী এতই আধুনিক যে, কিছু কিছু বৈষ্ণবের তরফ হইতে বাধা আসিলেও সর্ব্ব-সাধারণ সেই বাধার প্রতি নিজেদের আচরণের দ্বারা কোনও সমর্থন জানাইতে আগ্রহী হয় নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পরে যদি অন্য একজন কেহ ভক্তদের ধ্যানদৃষ্টির সমক্ষে অবতার বলিয়া প্রতিভাসিত হন, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তেরা একটী মাত্র প্রতিবাদ না তুলিয়াও সেই কথা মানিয়া নিতে

অন্তরের সায় পাইবেন কিনা, এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নহে। তার কিছু কাল পরে হয়ত আরও কেহ অবতার-রূপে প্রচারিত ও পূজিত হইবেন বা তাহার আয়োজন হইবে। কিন্তু প্রতিটি অবতার-খ্যাত মহাপুরুষেরই ভক্তসংখ্যা এই দেশের মাটিরই গুণে এত অগণিত হইবে যে, সাধারণ লোকের ভোটের জোরেই তাঁহারা তত্তৎ-কালে অবতার-রূপে জন-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবেন। ইহাই যখন আমাদের দেশের চিন্তাধারার trend বা ঢং, তখন অবতারবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তোমাদের লাভ কি হইবে? বরং প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার শিষ্য হইয়া তোমরা আমাকে কেহ অবতার বলিয়া প্রচার করিবে না, তোমাদিগকে আজীবন প্রচার করিয়া যাইতে হইবে আমার জীবনের আদর্শ। আমি বড় কাজ অনেক কিছু করি নাই কিন্তু ছোট কাজ এমন দুই একটী হয়ত কখনো করিয়াছি, যাহার মধ্যে আমার হাতের স্বাক্ষর তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। আমি বুকের মধ্যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া গুরুতর পীড়িত শরীরেও দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষকে তাহার নিজের উপযোগী সৎকথা-গুলি দিনের পর দিন শুনাইয়া যাইতেছি, কোথাও যে আমি টাকাকড়ি তুলিবার চেষ্টা করি নাই, কোথাও যে আমি মানুষের গলগ্রহ হইতে চাহি নাই, সর্ব্বত্র যে আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া যাইবার দাবীতে অপরের স্বাধীনতাকে পূর্ণ সম্মান ও আন্তরিক স্বীকৃতি দিয়া যাইতেছি,

ইহার মধ্যে কি তোমরা আমার নিজের হাতের স্বাক্ষর খুঁজিয়া পাইবে না? অবতারবাদ প্রচারের দ্বারা ধর্ম্মসঙ্ঘকে যে দ্রুত বিপুলায়তন করা সম্ভব, একথা এদেশে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, একথা এদেশে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মনে রাখিও, আমি যতকাল মানুষের স্মৃতিতে বাঁচিয়া থাকিব, তাহা যদি আমার মরদেহ বিনাশের পরে মাত্র পাঁচটী বৎসরও হয়, ততকাল কাহারো কাছে আমি অবতারের সম্মান, উপাধি, পূজা বা প্রতিষ্ঠা পাইতে আগ্রহী নহি।"

কাজই বড়

মানভূম জেলান্তর্গত পুঙ্কা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কবে আমি পুপুন্কী আশ্রমে ফিরিয়া যাইব, সেই তারিখটী যে তোমাদিগকে জানাইতে পারিতেছি না, তাহার একটী কারণ এই যে আমার ভ্রমণ-তালিকা এমন অনিশ্চিত এবং প্রতিটি সম্ভাব্য স্থানে আমার কর্ম্মসূচী এমন চলমান যে, সঠিক ভাবে কিছু জানানো অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আমার আশ্রম-আগমনের তারিখ ও স্থিতিকালের ব্যাপকতা জানাইবার পথে সব চেয়ে বড় অন্তরায় এই যে, আমি যখন আশ্রমে বাস করি, তখন আমি ভুবনবিখ্যাত বক্তা নহি, সমগ্র পৃথিবীর অজ্ঞাত একজন দারুণ পরিশ্রমী শ্রমজীবী। নানা দেশে ভ্রমণ-

কালে ভাষণ, সেই মনটাকে কণ্ঠদেশে আনিয়া, আশ্রমে বাসকালে কাজ করি মনটাকে হাতে, পায়ে, বাহুতে নিবদ্ধ করিয়া। তোমরা দলে দলে আশ্রমে আসিবে ত' গল্প শুনিতে কিন্তু আমার গল্প করিবার অবসর কোথায়? তোমাদের হাতের কাছে যদি কোদাল আনিয়া হাজির করি, তোমরা এক পা দুই পা করিয়া পশ্চাদপসরণ কর। অপরের শ্রমশীলতার দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখিয়া যদি তোমাদের মনে শ্রমের মহিমা না জাগ্রত হয় এবং সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য আলস্য বা বংশগত কৌলীন্য-বুদ্ধি গা-ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া না দিতে পার, তবে তোমাদের আশ্রমে আসিয়া হৈ চৈ আর হট্টগোল করিয়া যাওয়ার চেষ্টার মধ্যে সার্থকতা কি? বলিবে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে ত' ধান ক্ষেতে, বেগুণ ক্ষেতে, আলু ক্ষেতে যথেষ্ট শ্রমই কর। কিন্তু সেই শ্রম ত' স্বার্থপুষ্টির জন্য। পরার্থে শ্রমের দৃষ্টান্ত কোথায়? আমি ত' রাত্রি বেলায়ও গাইতি কোদাল নিয়া এক এক দিন এক এক গ্রামের রাস্তা মেরামত করিতে সদল-বলে যাই, তোমরা কি অন্ততঃ পক্ষে নিজের গ্রামেও সেই কাজটী করিয়া থাক? কর না। কর না এই জন্য যে, ঐ রাস্তা যে সকলের, তোমাদের নিজের একার নয়। যাহা করিবে, কেবল একা নিজেরই জন্য করিবে, ইহাই ত' তোমাদের আসল রোগ। পরের জন্য কিছু করিতে হইলেই তোমাদের গায়ে জ্বর আসে। কেমন, আমি ঠিক

কথাই বলিয়াছি কিনা, ইহা বল। যতদিন পরের জন্য সাগ্রহে সানন্দে সাহ্লাদে কাজ করিতে ব্যগ্রতা অনুভব না করিবে, ততদিন তোমাদের পক্ষে আশ্রমাদি পুণ্যপীঠস্থান দর্শনের অধিকারই জন্মিবে না জানিও। আশ্রমাদিতে দলে দলে দর্শনার্থীরা আসিয়া ভিড় করিয়া হৈ-চৈ করুক এবং আমাদের কাজের মনকে বৃথা বাক্যালাপে লিপ্ত করুক, ইহা আমি চাহি না। কাজই আমার কাছে বড়, কথা নয়।"

বিবাহের বাস্তব ব্যাখ্যা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত কালীকচ্ছ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুত্রকন্যার বিবাহ-দান শুধু তাহাদিগকে সংসারে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়াই নহে। ইহার আর একটী গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। বরের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে যে সকল সদ্গুণ ও সৎপ্রতিভার চর্চ্চা ঘটিয়াছিল, আর কনের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে যে সকল সদনুশীলন ও সৎপ্রয়াসের সমারোহ জন্মিয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যে সমষ্টিগত একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সকল সৎপ্রয়াসের সৎফলকে ভাবী কালের একটী অনাগত আধারের মধ্যে বিকশমান করিয়া তুলিবার ইহা একটী কৌশল। বিবাহ কথাটার মানেই হইতেছে অতীতের আয়ত্তীকৃত উৎকর্ষকে ভাবি-কালের মধ্যে সঞ্চারণ বা সঞ্চালন। লক্ষ যুগের অতীত একটা মানুষের মধ্যে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট

একটা রূপ পাইয়াছে। সেই রূপটুকুর যতটুকু দেখা যায়, তার কোটিগুণ রহিয়াছে প্রচ্ছন্ন। এই কথা প্রতিটি বর এবং প্রতিটি বধূ সম্পর্কে খাটে। জীবজন্তুরা এ কথা না জানিয়াই প্রকৃতির তাড়নায় মিলিত হয়। মানুষ এই কথা জানিবার পরে অতীতের এই প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য্য-রাশিকে নিজেদের সন্তান-সন্ততিতে প্রকটিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্য নিয়া মিলিত হইতে পারে। পশুপক্ষীরা অজানিতে ধীরে ধীরে বিশ্বের বিবর্ত্তনমুখিনী গতির সহায়ক হইতেছে। মানুষেরা জ্ঞানকৃত আচরণের দ্বারা ভবিষ্যতের দিব্য বিবর্ত্তনকে ত্বরান্বিত করিতে পারে। ইহারই নৈতিক স্বীকৃতির নাম বিবাহ। কথাগুলি দার্শনিকোচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু ইহাই বিবাহের বাস্তব সার্থকতা। শুধুই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি যদি কাম্য হইয়া থাকে, তবে বিবাহ ব্যতীতও ত' তাহা অসম্ভব নহে!

সংসারে শান্তির পথ

ঢাকা জেলান্তর্গত হাসনাবাদ নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকার পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারে অতি তুচ্ছ কারণকে অবলম্বন করিয়া অনেক অসাধারণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনেক সময়ে একেবারে অকারণেও তাহা ঘটিতে দেখা যায়। পতি তাহার পত্নীকে প্রবঞ্চিত করিয়া পরনারীতে প্রেম ঢালিতেছে, এরূপ ঘটনাও ঘটে আবার নারী তাহার স্বামীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া

পরপুরুষ-প্রীণন করিতেছে, এমনও ঘটে। কোথাও কোথাও ইহার কিছুই ঘটে না কিন্তু অবিশ্বাস্য রকমের উদ্ভট কারণের সূত্র ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে অকল্পনীয় অবিশ্বাস ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। সকল ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমাশীলতার সদ্ব্যবহার যতটা করা সম্ভব, তাহা করা উচিত।

"এগুলি হইল উপদেশের কথা। যাহারা নিজেরা ভুক্তভোগী নহেন, তাঁহারা অনায়াসে এইরূপ উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু যাহারা সন্দেহের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে, অবিশ্বাসের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের পক্ষে সহিষ্ণু থাকাও কঠিন, ক্ষমা করাও কঠিন। পুরুষ যদি নারীর কাছে সতীত্বের প্রত্যাশা সঙ্গত মনে করে, নারীই বা পুরুষের কাছে একপরায়ণতা প্রত্যাশা কেন করিবে না? নারী যদি পুরুষের কাছে এক-পরায়ণতা দাবী করিতে পারে, পুরুষ তাহা হইলে নারীর নিকটে সেই একটী জিনিষই কেন দাবী করিতে পারিবে না?

"ভারতীয় হিন্দু-নারী এবং সম্ভবতঃ অধিকাংশ মুসলমান-নারী পুরুষের পক্ষ হইতে এই নীতির গণ্ডী অতিক্রান্ত হইয়া গেলে তাহাকে যতটা সম্ভব সহিয়া নিবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে কিন্তু নারী যখনই এই নীতির গণ্ডী অতিক্রম চাহিয়াছে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কোনও পুরুষই বোধ হয় তাহা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে রাজি হয় নাই। অথচ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত

মানুষগুলি ভাবিতে শুরু করিয়াছে যে, নারীকে এবং পুরুষকে অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় নিজেদের জৈবিক আচরণে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং তাহার ফলে বিবাহ-রূপ সামাজিক সংস্কারটীর চরম পরিণতি কি ঘটিবে, তাহা নিয়া কাহারও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

"এমন একটা যুগসন্ধিক্ষণে তোমরা দুই চারিজন বিভিন্ন স্থানে ভাবা শুরু করিয়াছ যে, সাংসারিক জীবনে শান্তি কি করিয়া আনা যায়। আমি বলি, দাবীর ভাব যতকাল থাকিবে, ততকাল শান্তি আসিবে না। আমরা প্রতিজনে যে জগদ্বাসী প্রতিটি প্রাণীর নিকটে ঋণী, এই দেনার বোধ যখন প্রবল হইবে, তখন প্রত্যেকের প্রাণে শান্তি আসিবে। ভোগই জীবনের লক্ষ্য নহে, যদিও বিবাহিত জীবনের মধ্যে ভোগেরও একটা সম্মানিত স্থান আছে। যাহাদের যুগ-যুগান্তব্যাপী আত্মত্যাগের ফলে মানুষ ভোগসমর্থ দেহ ও ভোগভাবুক মন পাইয়াছে, সেই অনন্ত কোটি বিবর্ত্তনশীল জীবকুলের নিকটে যে অপরিশোধ্য ঋণ, তাহার স্বীকৃতির মধ্য দিয়াই আসিবে সংসারের শান্তি। এই ঋণ স্বীকারের সৎসাহস তাহার থাকা কঠিন, যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই।"

হঠাৎ-নেতৃত্ব

ঢাকা জেলান্তর্গত দেওভোগ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও অনুষ্ঠানই জগতে বিনা সংগঠনে সুচারু-রূপে সম্পাদিত হয় না। অতীব বৃহৎ এক যন্ত্রশালার উদ্বোধনের ব্যাপারে নাট, বল্টু হইতে শুরু করিয়া বড় বড় বিদ্যুদাধার পর্য্যন্ত যাবতীয় যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ আগে হিসাব করিয়া যোগাড় করিতে হয় এবং তারপরে যেটার সহিত যেটর বর্গ রহিয়াছে, সেটার সঙ্গে সেটাকে যুক্ত করিতে হয়। কত গ্রীজ ঢালিতে হয়, কত বেল্ট লাগাইতে হয়, কত যন্ত্রাংশকে মরিচা-মুক্ত করিতে হয়, কত যন্ত্রাংশ বদল করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কাজগুলির একটাতেও যাহার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ঘটিল না, যন্ত্রশালার উদ্বোধনের দিন যদি তেমন ব্যক্তিই আসিয়া হঠাৎ প্রধান পরিচালকের মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্ব ব্যাপারের তদারকি করিতে থাকেন আর যাহাকে যাহা খুশী হুকুম দিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই যন্ত্রশালার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্তরে কি কিছু বিপদের আশঙ্কা না করিয়া পারা যায়? হঠাৎ-নেতাদের নেতৃত্বে যখন দেশ চলিতে আরম্ভ করে, তখনকার অবস্থাও জানিবে অনেকটা এই প্রকার। হঠাৎ-নেতাদের নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রত্যেকেরই একটু সাবধান থাকা ভাল। দেশের জন্য কখনো কোনও কাজ করিলেন না অথচ কেবল বক্তৃতার দাপটে নেতা হইয়া গেলেন, এইরূপ ব্যক্তিরা অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে আসিয়া নেতৃত্বের মঞ্চ-প্রদীপের একেবারে সম্মুখের সারিতে বসিয়া গেলেন বলিয়া তাঁহাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী আমরা

সত্যই চলিতে পারি কিনা, এই কথাটী বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। কেহ সাম্প্রদায়িকতার ফিকির তুলিয়া, কেহ বা প্রাদেশিকতার ধূয়া ধরিয়া এমন ভাবে মানুষের মনকে পরিচালিত করিতে পারেন, যাহার পরিণাম হইতেছে আত্মনাশা সর্ব্বনাশা এবং পরস্পরে অবিশ্বাস।"

আর্ত্ত ভক্ত ও পুরুষকার ঃ ভগবানকে ডাকিবার প্রত্যক্ষ লাভ

দিনাজপুর জেলান্তর্গত কালামেঘ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

" মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে,— ভগবান্ বিপৎ-ত্রাণ কর, ঐশ্বর্য্য-লোভে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে,—ধনং দেহি, যশোলোভে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে,—যশো দেহি। একজন শুদ্ধ ভক্তির সাধক ইহাতে আপত্তি করিবেন। কারণ, ভগবানের কাছে চাহিবার বস্তু মাত্র একটী এবং তাহা হইতেছে ভগবানের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি, সর্ত্তহীন, চুক্তিহীন, লাভলোভ-হীন, অকৈতব এবং অকপট প্রেম। ভগবান্ সম্পর্কে মানুষের প্রয়োজনীয় মাত্র একটী জিনিষ, তাহা হইতেছে বিনিময়-বুদ্ধি-বর্জ্জিত পূর্ণানুগত্যযুক্ত সুবিমল প্রেম। সুতরাং দ্বিষো জহি— আমার শত্রুদের নাশ কর, এই প্রার্থনা নিয়া ভগবানের কাছে হাজির হইলে, কাজটা যে নিন্দনীয় হইবে, ইহাতে সংশয়ের

কিছু নাই। কিন্তু শুদ্ধ প্রেম মানুষের প্রকৃত কাম্য হইলেও যাহারা শুদ্ধ প্রেমের কাঙ্গাল হইবার মত উচ্চাধিকারী হয় নাই, তাহারা কি ভগবানকে ডাকিবার অভ্যাস ও সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? তাহাদের পক্ষে আর্ত্ত ভক্তিই আপাততঃ ভক্তির চরম। তাহারা বিপদ হইতেও ত্রাণ চাহিবে, দারিদ্র্য হইতেও মুক্তি চাহিবে, যশোহীন অপ্রতিষ্ঠিত জীবনের ভার বহনেও অস্বীকার করিবে এবং এই সকল অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য ভগবানের কাছেই প্রার্থনার পর প্রার্থনা জানাইবে। কারণ, ভগবান্ ছাড়া অগতির গতি আর কে আছে? স্বাভাবিক বলিয়াই ইহা তাহারা করিবে। এজন্য তাহাদিগকে নিন্দা করা বা উপহাসাস্পদ ভাবা আমি অন্যায় মনে করি। ভয় হউক, লোভ হউক, যে-কোনও কারণ বশতঃই হউক না কেন ভগবানকে তাহারা স্মরণ করিতেছে। ভগবৎ-স্মরণের স্বাভাবিক সুফল যাহা, তাহা হইতে ইহারা বঞ্চিত হইবে না। অবশ্য, কেহ যদি আমার দলে আসিতে চাহে, তবে তাহাকে আমি বলিব যে, ভগবানের কাছে নানা প্রার্থনার ফিরিস্তি দাখিল করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিও না, কারণ তোমার কখন কিসের প্রয়োজন, তাহা তোমা অপেক্ষা তিনি বেশী জানেন। সুতরাং সময়মত তোমাকে যখন যাহা দিবার, তিনি নিশ্চয়ই দিবেন। এই বিশ্বাসটী অন্তরে রাখিয়া তোমার যাবতীয় পার্থিব কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও। ক্রমওয়েল বলিয়াছিলেন,— Have faith in God but keep your powder dry, ঈশ্বরে

পূর্ণ বিশ্বাস রাখ কিন্তু বারুদ রাখ শুষ্ক, বারুদ ভিজিতে দিও না, কারণ তাঁর কাজ তিনি যথাসময়ে করিলেও তোমাকে প্রয়োজনকালে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিতেই হইবে। ভগবান্ আমার সকল প্রয়োজন মিটাইয়া দিতে সমর্থ এবং যোগ্য সময়ে তাহা করিবেনই কিন্তু আমার পার্থিব অভীষ্ট-সমূহ লাভ করিবার জন্য যে শ্রমটুকু সঙ্গত, তাহা হইতে বিরত থাকিলে আমার চলিবে না। আর্ত্ত ভক্তও ভক্ত কিন্তু ভগবানের দুয়ারে ধর্ণা দিয়াছ বলিয়া তুমি পরীক্ষার পড়া পড়িবে না বা নিয়মিত পড়াশুনা করিয়াও পরীক্ষার হলে ঢুকিবে না অথবা পরীক্ষার হলে প্রবেশ করিবার পরে খাতায় কিছুই না লিখিয়া শাদা খাতা জমা দিয়া ঘরে ফিরিবে, এমন কদাচ হইতে পারে না। প্রার্থনা যেমন করিতেছ সংগ্রামে জয় লাভ করিবার জন্য, জয় লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য তেমন কঠোর পরিশ্রম তোমাকে করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কালে সেই যোগ্যতার সুপ্রয়োগ সুনিপুণ ভাবে করিতে হইবে। ভগবানকে যে তুমি প্রয়োজনে ও নিষ্প্রয়োজনে ডাকিতেছ, ইহা দ্বারা তোমার দুঃখ-দুশ্চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে প্রশান্তি আসিতেছে,—ভগবানকে ডাকিবার ইহা প্রত্যক্ষ লাভ।"

জগন্মঙ্গলে চিন্তা-চেষ্টার সার্থকতা

যথাসময়ে আসন-মুদ্রা শিক্ষাদানের ক্লাস হইল। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধ্যান-জপই কর, আর আসন-মুদ্রাই কর, ডন-কুস্তিই কর আর ডাম্বেল-বারবেলই কর,

আহারই কর আর নিদ্রাই যাও, ভ্রমণই কর আর বিশ্রামই কর, আগে, পরে বা সমসম কালে এই কথাটী নিরন্তর মনে রাখবে যে, কিছুই তোমার একার কুশলের জন্য কচ্ছ না, কচ্ছ বিশ্বভুবনের সর্ব্বজনের মঙ্গলের জন্য। জীবনের প্রতিটি প্রয়াস ও অধ্যবসায়কে বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর কুশলমুখী রাখবার এই অনুশীলনটী তোমাকে দেবত্বের দিকে দেবে অগ্রগতি। জগতের মঙ্গল, বিশ্ববাসীর কল্যাণ, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রতিটি মানুষের অভ্যুদয় হবে তোমার যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম্মচেষ্টার প্রেরয়িতা। ছোট বা বড় যত কাজ কর, সব কাজের প্রকৃত সার্থকতা হবে এর দ্বারা।

প্রাচীন ভারতের সংসারী

অপরাহ্ণে যথাকালে এডোয়ার্ড মেমোরিয়ালের মাঠে শ্রীশ্রীবাবামণির দশম বক্তৃতা শুরু হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন ঋষিরা সন্তান কামনা কর্ত্তেন। প্রায় কেউই নিঃসন্তান থাকতে চাইতেন না। এর মানে এ নয় যে তাঁদের রিরংসা তাঁ' দিগকে নাকে দড়ি দিয়ে টানত। তাঁদের গার্হস্থ্য জীবন রমণেচ্ছাপরিতৃপ্তির জীবন ছিল না, সেই জীবন ছিল বংশানুক্রমে ক্রমবিকশিত দিব্যায়নের মধ্য দিয়ে মানব-জাতি রূপ species (প্রজাতি) টাকে একটা qualified peculiarity (সবিশেষ গুণ-সমন্বিত বৈশিষ্ট্য দান করার অনুশীলন-ক্ষেত্র। অর্থাৎ আধুনিক

সৌজাত্য-বিদ্যা-বিদেরা যে কাজটা ঘোড়া, গরু, কুকুর আদি জীব-জন্তুর উপরে ক'রে ক'রে নূতনতর অশ্ব, নূতনতর বৃষ বা গাভী, নূতনতর সারমেয় সৃষ্টি ক'রে মানুষের নানা প্রয়োজনের দাবীকে মিটাবার প্রশংসনীয় চেষ্টা কচ্ছেন, তাঁরা নিজ নিজ গার্হস্থ্য জীবনে সেই সুপ্রজনন-বিদ্যাকেই অনুশীলন ক'রে সাধারণ মানবজাতিকে আস্তে আস্তে এক মহনীয়-স্বভাব মহিমময় নূতন মানবজাতিতে রূপান্তর দেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংসার-ধর্ম্ম পালন কত্তে চেষ্টা কত্তেন।

দেবমানব-হিসাবে প্রজাতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারকে সুখের এবং আদর্শ-নিষ্ঠ কত্তে হ'লে প্রথমে চাই এই বিশ্বাস যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এমন কিছু মূল্যবান মূলবস্তু আমাদের এই দেহটার মধ্যে রেখে দিয়ে গেছেন, যার সম্প্রসারণের দ্বারা মানব-জাতির গৌরব-বৃদ্ধি হবে। তারপরেই চাই সেই চেষ্টা, যাতে পূর্ব্বপুরুষদের প্রদত্ত বাস্তব মূলধনগুলির অপব্যবহার না হ'য়ে তাদের সদ্ব্যবহার হ'তে পারে। তারপরেই আসে সেই বিশ্বাস যে, এই মূলধন বংশানুক্রমে লক্ষ লক্ষ বছর জুড়ে কেবলই সন্তানিত অর্থাৎ বিস্তারিত হ'তে পারে। এই বিশ্বাসের গভীরতা থেকে যে সন্তান-কামনা জন্মে, সে কামনা কাম-কলুষে লিপ্ত হয় না, সে কামনা কামজয়ী হয়। কামজয়ী সেই সন্তান-কামনা যখন অধিকাংশ দম্পতীর চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত

হয়, একটা জাতি প্রজাতি-হিসাবেই তখন দেবমানবতার পথ-পানে অগ্রসর হ'তে থাকে।

স্বদেশানুরাগের জন্মকথা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানবজাতির পৃথিবীব্যাপী বিস্তারের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন যে, মনুষ্যজাতি প্রধানতঃ এক যাযাবর জাতি, এক এক দেশে উৎপন্ন বা বিকশিত হ'য়ে খাদ্যাভাবের তাড়নায় বা গোষ্ঠী-কলহের উৎপাতে এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়েছে। যতকাল তারা একটা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘকালের জন্য উপনিবিষ্ট না হচ্ছে, ততকাল তাদের দৈশিক চেতনা বা দেশ-বিশেষের প্রতি অনুরাগ জন্মে নি। কিন্তু এক দেশের মধ্যে কয়েক পুরুষ একাদিক্রমে বাস করার পরে তাদের মনে দেশ-চেতনা জেগেছে এবং তখন তারা জন্মভূমিকে স্বদেশ ব'লে ভালবাসতে শুরু করেছে। সেই স্বদেশ কারো দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তখন তারা দলবদ্ধ হ'য়ে করেছে প্রতিরোধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানকে স্বর্গদায়ক ব'লে বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে। সেই স্বদেশ কখনো ছেড়ে আসতে হ'লে তাদের মনে গভীর বেদনার সঞ্চার হয়েছে এবং পরিত্যক্ত সেই স্বদেশের জন্য বহু শতাব্দী জুড়ে তাদের বুকে কান্না ফেটে পড়েছে। দেবগণের স্বর্গচ্যুতি ও তার পুনরুদ্ধারের

জন্য আপ্রাণ প্রয়াসের যে সকল কথা পুরাণে বর্ণিত আছে, তা' প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশ-বিতাড়িত বহিষ্কৃত অতি প্রাচীন মানুষ-গোষ্ঠীর করুণ আর্ত্তনাদের স্মৃতি ছাড়া হয়ত আর কিছুই নয়। মোট কথা, যাযাবরত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে জেগেছে এক সঙ্ঘবদ্ধ সাধনার রীতি, যার অন্যতর নাম হচ্ছে স্বদেশ-প্রীতি।

ভারতের স্বদেশ-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত উন্মেষ কখন হয়, সঠিক বলা শক্ত। বরং অনেক যুগ পূর্ব্ব থেকেই যে এদেশে রাজানুগত্য প্রবল, তার প্রমাণ বেশী আছে। এক রাজা অন্য রাজার দেশ বলপূর্ব্বক অধিকার ক'রে নিলে প্রজাদের মনে তার জন্য স্বদেশাভিমান আহত হ'লে বিক্ষোভের পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু শত শত খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে ও সমগ্র ভারতের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধের প্রমাণ বারংবার পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা অঙ্গ-রাজ্যের অধিবাসীরা অন্য এক সম্রাটের অধীনস্থ ভারতের অন্য এক প্রান্তস্থিত পুণ্যসলিলা নদীটির বা পুণ্যক্ষেত্র তীর্থটির কথা কখনো ভুলতে পারে নি। তাদের চখের সামনে "ত্রিভুবনং স্বদেশঃ" এই মহাবাক্য জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে নিরন্তর

জ্বলছিল ব'লেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে তাদের স্বদেশাভিমান আবদ্ধ হ'য়ে থাকৃত না। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্ম্মেনী আদি দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে এখানে একটা বিরাট পার্থক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

স্বদেশ-প্রীতি উন্নতির সহায়ক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার-রূপ মহামন্ত্র ভারতীয় আর্য্যদিগকে সব মত, সব পথ, সব নাম, সব মন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার বলবন্ত এক সামর্থ্য দিয়ে ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনাকে যেমন এক অসাধারণ বিশেষত্ব প্রদান করেছে, ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাষ্ট্রের ভিতরেও সর্ব্বভারতীয় এক শ্রদ্ধাবোধকে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী আদির নিত্য নামোচ্চারণ উপলক্ষে এবং সতীদেহের একান্ন পীঠে রূপান্তরের স্মৃতি-চারণ উপলক্ষ্যে চিরকাল জাগিয়ে রেখেছে। ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও একজন বাঙ্গালীর কাছে রাজপুতানা বা মহারাষ্ট্র বিদেশ নয়, একজন ওড়িয়ার পক্ষে কাশ্মীর বা আসাম বিদেশ নয়, একজন মাড়োয়ারীর পক্ষে বিহার বা মাদ্রাজ বিদেশ নয়, একজন কর্ণাটকির পক্ষে ইউ পি বা গুজরাট বিদেশ নয়, একজন পাঞ্জাবীর পক্ষে মধ্যপ্রদেশ বা বঙ্গদেশ বিদেশ নয়। এর ফলেই ভারতে এমন এক আশ্চর্য্য ধরণের সর্ব্বসহিষ্ণু স্বদেশ-প্রেমের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, যা' আয়র্ল্যাণ্ড

বা ফিনল্যাণ্ডে সম্ভব ছিল না, যা' ব্রিটেনে বা স্পেনে সম্ভব নয়। ঐ সব পাশ্চাত্য দেশে যদি এটা সম্ভব হ'ত, তাহ'লে ফ্রান্স আর ব্রিটেনে তিন শত বৎসর ধ'রে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে পারত কিনা সন্দেহ! ভারতের স্বদেশ-প্রেম সর্ব্বসহিষ্ণু ব'লেই নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ রাষ্ট্রের রাজার প্রতি অনুগত থেকেও ভারতের যে-কোনও প্রান্তের অধিবাসী অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে নিজেকে সমভাবে ভারতবাসী ব'লে অভিমান করতে পারত। এই পটভূমিকার মধ্যে ইংরেজ এসে সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র হওয়াতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কলহের দুঃস্বপ্ন দূর হয়েছে, যাতায়াতের পথ সুগম হয়েছে, এবং ইংরাজি শিক্ষার দৌলতে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান সহজতর হয়েছে। যদি পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান সংস্কৃত ভাষার একটা সহজ সংস্করণের মধ্য দিয়ে হ'তে পার্ত্ত, তাহ'লে ভারতের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে অপর প্রতিটি অঙ্গের সম্পর্ক আরও গভীরতর প্রেমরসে রসায়িত নিশ্চয়ই হত। কিন্তু তা' হ'তে পারে নাই। ইংরিজির মাধ্যমেই ভারতের এক প্রদেশ-বাসী অপর-প্রদেশবাসীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে শিক্ষা কচ্ছে। এর ফলে ভারতের স্বাভাবিক ও সর্ব্বসহিষ্ণু জাতীয়তাবোধটুকুর সঙ্গে বিদেশী patriotism (স্বদেশ-প্রীতি) এর নমুনাগুলি এসে আস্তে আস্তে নিজ নিজ যোগ্য স্থান গ্রহণ কচ্ছে। এই যে স্বদেশ-প্রীতি, এটাও মানব-জাতির উন্নতির পক্ষে এক পরম সহায়ক বস্তু।

স্বদেশ-প্রীতির মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি স্বদেশ-প্রীতির মনোনিয়ামিকা শক্তির এখানে প্রশংসা কর্চ্চি। স্বদেশ-প্রীতি দেয় নির্ভীকতা, দেয় কর্ম্মঠতা, দেয় আত্মনির্ভরের সাহস, দেয় স্বাবলম্বনী প্রবৃত্তি, দেয় অতীতের কলঙ্কিত ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত ক'রে ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টির প্রেরণা। কিন্তু স্বদেশ-প্রীতি সব চেয়ে বড় জিনিষ যেইটী দেয়, সেইটী হচ্ছে, বহু দিকে প্রধাবিত চঞ্চল মনকে একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে এনে কেন্দ্রীকৃত করার ক্ষমতা।

ভারতীয় স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্ব-প্রীতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতীয় স্বদেশ-প্রীতির সাধারণ ঢংটাই এই যে, সে বিশ্বের কুশলকে অস্বীকার করে না। বরং ভারতীয় স্বদেশ-প্রীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি মানবের প্রতি প্রীতি। যতদিন এই উচ্চ আদর্শ থেকে আমাদের মন ও চেষ্টা বিচ্যুত না হবে, ততদিন আমরা জগতে নিশ্চিতই অজেয় হ'য়ে থাকবার অধিকার হাতের মুঠোয় ধ'রে রাখতে সমর্থ হব।

বক্তৃতা তিন ঘণ্টাকাল হইল। এতদিনের বক্তৃতার মধ্যে আজিকার বক্তৃতার একটী অসাধারণ বিশেষত্ব এই দেখা গেল যে, বক্তৃতা শেষ হইবার পরেও শ্রোতারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাঠের মধ্যে নীরবে বসিয়াই রহিলেন।

রংপুর
২১শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪২
(৬ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

অদ্য আর প্রাতঃকালীন আসন-মুদ্রা শিক্ষাদানের ক্লাস হইল না। কারণ, অদ্য একদিনে তিনস্থানে তিনটি বক্তৃতা দিতে হইবে।

কৈশোরেই জীবনকে গড়িয়া লও

বেলা একটায় গভর্ণমেন্ট গার্লস্ হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবামণির একাদশ ভাষণটী হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিলাসের হিল্লোলে উড়ে বেড়াবার জন্য মনুষ্য-জন্ম নয়, জীবনকে পূর্ণ সার্থকতা দান করার জন্য মহত্তম ব্রতকে গ্রহণ কত্তে হয়। একাজ বাল্যেই শুরু কত্তে হয় এবং আমৃত্যু নিষ্ঠায় বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে হয়। যাতে তাতে না ঘটে ত্রুটি, তারই জন্য জীবনের প্রথম দিকের দিনগুলিকে সতর্ক ভাবে কাজে লাগাতে হয়। কুচিন্তা এবং কুকার্য্যের কুফল সম্পর্কে সজাগ থেকে দেহ্ এবং মনকে নিয়ত সচ্চিন্তায় আর সৎকার্য্যে লগ্ন ক'রে রাখতে হয়। এই চেষ্টার ভিতরে যাতে ত্রুটি বা শিথিলতা না প্রবেশ কত্তে পারে, তার জন্য সদুপদেশের আর সৎসঙ্গের প্রয়োজন। সৎ মানুষের সঙ্গও সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থের পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনা প্রভৃতিও সৎসঙ্গ। যে মানুষ এভাবে তার প্রথম জীবনটাকে গড়্‌বার সুযোগ পায় এবং সুযোগের

সদ্‌ব্যবহার করে, তার ভবিষ্যদ্-জীবনের উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে। অতএব নবোদ্‌ভিন্ন কাঁচা এই কৈশোরেই প্রতিজনে নিজ নিজ জীবন গঠন কর মায়েরা।

সদাচার, সম্প্রীতি ও সংস্বভাব সম্পর্কে বক্তৃতাটি পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল চলিল।

নারীর মহিমা

বিকাল সাড়ে তিনটায় শ্রীশ্রীবাবামণির দ্বাদশ ভাষণটী হইল টাউন হলে। সভায় একমাত্র মহিলারাই উপস্থিত ছিলেন। এত মহিলার সমাবেশ ইতঃপূর্ব্বে নাকি এই শহরে আর কোনও সভাস্থলে দেখা যায় নাই। পূর্ণ দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারী জাগরণ একটা কথার কথাই নয়, নারী-জাগরণ সত্য সত্যই একটা অসাধারণ সম্ভাবনায় পূর্ণ এক বিরাট ভবিষ্যৎ। আজও নারীরা নিজেদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক মানব-গোষ্ঠী ব'লে কল্পনা ক'রে পুরুষদের প্রায় পাছে পাছেই চলবার চেষ্টা কচ্ছেন কিন্তু এমন দিন খুব দূরে নয়, যে দিন নারীর হস্তধৃত আলোক-বর্ত্তিকায় ত্রিভুবনের অধিকাংশ পথ আলোকিত হবে এবং দলে দলে ভক্তিমান্ পুরুষেরা সেই আলোকে নিজ নিজ জীবনের পথ প্রত্যক্ষ ক'রে নির্ভয়ে লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হবেন। নারী যখন নিজ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা, তখন সে জগতের

মাতা, জগতের ধাত্রী, জগতের বলসঞ্চারিণী মহাশক্তি, জগদ্বাসীর সদ্বুদ্ধি, মেধা ও নিত্যস্মৃতি। নারীর এই মহিমার কথা নারী তখনই জান্‌তে সমর্থ হবে, যখন সে তার পার্থিব অসম্পূর্ণতাকে অনায়াসে অগ্রাহ্য ক'রে আত্মিক পরিপূর্ণতায় অচলপ্রতিষ্ঠ হবে।

অপরাহ্ণ সাত ঘটিকায় এডোয়ার্ড মেমোরিয়ালের মাঠে শ্রীশ্রীবাবামণির ত্রয়োদশ বক্তৃতাটি হইল। বক্তৃতা পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল চলিল। বক্তৃতার কোনও নোট পাওয়া যায় নাই। তবে বিভিন্ন জনের লিখিত পত্র হইতে জানা যায় যে, জনতা অন্যান্য দিনের চেয়েও অদ্য বেশী হইয়াছিল।

রংপুর

২২শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪২

(৭ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

অদ্যও দুইটী স্থানে ভাষণ আছে বলিয়া প্রাতের আসন-মুদ্রার ক্লাস না হইবারই আশঙ্কা ছিল কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি কিছু সময় ব্যাপিয়া সমাগত সকলকে যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষা দিলেন।

দ্বিপ্রহরান্তে টাউন হলে মহিলাদের সভায় শ্রীশ্রীবাবামণির চতুর্দ্দশ ভাষণটী হইল। পঞ্চদশ ভাষণটী হইল পুরুষ ও নারীদের বিমিশ্র সভায় এডোয়ার্ড মেমোরিয়ালের মাঠে।

প্রত্যেক স্থানেই জনতা পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা অধিক হইতেছিল।

এত বক্তৃতা কেন

একজন প্রশ্ন করিলেন,—একদিনে দুইটা তিনটা ক'রে বক্তৃতা দিচ্ছেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অল্প দিন মধ্যেই এখানে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে ব'লে। জানেন না, প্রদীপ নিবে যাবার আগে একটু বেশী উজ্জ্বল হয়।

রংপুর

২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২

(৮ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

আজ শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী রহিয়াছেন। সমাগত সজ্জনদের সহিতও লিখিয়া আলাপ করিতে বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু নানা অঞ্চল হইতে লিখিত পত্র-সমূহের উত্তর-দানে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

সকল পথই শ্রদ্ধেয়

ঢাকা ফরিদাবাদ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পৃথিবীর সমস্ত নরনারী আমারই মতানুসারে চলিবে, এমন জিদ বা গোঁড়ামি আমার নাই। যাহারা আমার মতে বা আমার পথে চলিবে না, তাহারাও যদি নিজ-পথ-পরিক্রমার কালে বিশ্বজনের কুশলের দিকে তাকাইয়া নিজ নিজ অধ্যবসায়কে পরিচালিত করে, তবে তাহাদের মতন আপন

আমার আর কেহ নাই। আমি যে কোথাও কোথাও কাহাকেও কাহাকেও আমার নিজ মত ও নিজ পথের বার্ত্তা শুনাইয়া থাকি, তাহা ত' মাত্র এই একটী মাত্র উদ্দেশ্যে যে, তাহারা জীবনের প্রতি কর্ম্মে, প্রতি বাক্যে প্রতি চিন্তায় জগৎকল্যাণমুখী হউক। বিশ্বজনের কুশল সাধনই বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ পূজা। সৃষ্টিকে ভালবাসিলাম না আর স্রষ্টাকে ভালবাসি বলিয়া কেবল বুক্‌নিই ছড়াইতে লাগিলাম, ইহা অনেক সময়ে আত্মপ্রতারণা, অনেক সময়ে ইহা নিদারুণ অন্ধতা। আমি চাহি ত্রিভুবনব্যাপী নিয়ত কল্যাণকর্ম্ম। আমার মতানুযায়ী না হইয়াও, অন্য মার্গাভিমুখী থাকিয়াও যদি কেহ এই কাজটী করে, তবে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কেন হইব না? সমগ্র জগৎকে সেবা করাই ত' আমার কর্ত্তব্য ছিল। আমি সমগ্র জগতের কাছে যদি পৌঁছিতে না পারিয়া থাকি, তবে জগতের অবশিষ্ট অংশের প্রতি যাঁহারা সেবাহস্ত প্রসারণ করিবেন, তাঁহারা ত' আমারই পরম বান্ধব। পরম-বান্ধবের সহিত মতান্তর ঘটিবে বলিয়াই কি মনান্তরও ঘটাইতে হইবে? আমি বলিব, না তাহার সুযোগ আমার নাই আর তাহার সার্থকতাও জগতে কিছুই নাই।"

স্বাবলম্বন

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চাপিতলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গলার ফাঁসী পায়ের শিকল,
নিজের বলেই কাটতে হবে,
সদাই যারা অবশ অবল
তাদের দুঃখ ঘুচবে কবে?

"বাহির হইতে কেহ আসিয়া তোমাদের দুর্দ্দশা-মোচন করিয়া দিল না বলিয়া কপাল থাপড়াইবার সার্থকতা কোথায়? কেহ আসিয়া তোমাদের সংগ্রামে সহযোগিতা দিল না বলিয়া অনুযোগ অভিযোগ কাহার বিরুদ্ধে করিবে? তোমাদের নিজেদের ভিতরে যে বিপুল সামর্থ্য লুক্কায়িত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা কর নাই বলিয়া বরং আফশোষ করিতে পার। অনুতাপ চরিত্রকে উজ্জ্বল করে কিন্তু অনুতাপই ত' যথেষ্ট নহে। অনুতাপ যদি বিবেককে জাগরিত করে এবং সেই জাগরণ যদি নিজের শক্তিকে নিজের কাজে লাগাইবার পক্ষে হয় সহায়ক, তবেই ত' অনুতাপ হিতকর হইল। হাতের শিকল, পায়ের বেড়ী, কোমরের দড়ি এবং গলার ফাঁস সবই তোমাকে নিজের চেষ্টায় ছিঁড়িতে হইবে। পরমুখাপেক্ষার ভাব পরিত্যাগ কর। জীবনের প্রতিটি কর্ম্মে স্বাবলম্বনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প কর। ছোট ছোট কাজে স্বাবলম্বনের অনুশীলন করিয়া এমন অভ্যাসকে আয়ত্ত কর, যাহা বড় কাজেও স্বাবলম্বনের দুঃসাহস তোমাকে নিয়ত যোগাইতে সমর্থ হইবে। স্বাবলম্বী প্রতিভার প্রকটন তোমাদের প্রতি জনের জীবনে

হউক। লক্ষ্য কি কর নাই যে, আমি তোমাদের জেলায় যে কয়টা আশ্রম করিলাম, রহিমপুর, মোচাগড়া, মেটংঘর, পূর্ব্বধৈর, তাহার একটাতেও আমি ভিক্ষা-সংগ্রহকে প্রচলন করি নাই? একদিন হয়ত এতগুলি আশ্রমের অধিকাংশই থাকিবে না, কিন্তু আমি যে অভিক্ষু, অযাচক, স্বাবলম্বী ছিলাম, এই স্মৃতিটা মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমি বহুবার বলিয়াছি, স্বাবলম্বনই শক্তিমানের পরিচয়-পত্র।"

সেবায় সেব্যই মুখ্য

মানভূম জেলান্তর্গত সতনপুর গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"রুটিন-মাফিক কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সমাজ-সেবা প্রায়শঃই নিক্তির ওজনে হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহারা রতি আর মাষা হিসাব করিয়া হিসাবের খাতা আর মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণী দেখিয়াই সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু নিজেদের সর্ব্বস্বের সমর্পণে যাঁহারা সমাজসেবা করেন, তাঁহাদের ত' নিক্তির ওজনে কাজ হইবার উপায় নাই। তাঁহাদের কাজ বেহিসাবীর সামিল। তাঁহাদের ইহাতে অসুবিধা যথেষ্ট হয় এবং এক হিসাবে কর্ত্তব্যের ত্রুটিও হয়। এই ধর, আমি এই সময়টাতে পুপুন্‌কী থাকিলে গোযান বোঝাই করিয়া নানা রকমের চারা বিতরণ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে নিয়া যাইতাম।

কিন্তু বেহিসাবীর কাজ আমাকে বর্দ্ধমানে আর রংপুরে ঠেলিয়া পাঠাইল। আমি যদি এই ভাবে বাহিরে ঘুরিতে বাধ্য না হইতাম, তাহা হইলে এখন আমাকে প্রতিদিন এক একটী নূতন গ্রামে গাছের চারা বিতরণের কাজে আত্মনিয়োগকারী-রূপে দেখিতে পাইতে। এ সেবাটা তোমাদের জেলার পাওনা ছিল, কারণ ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন থাকিলেও প্রয়োজন-বোধ তোমাদের নাই। তাই বৎসরের পর বৎসর আমাকে গায়ের জোরে এই কাজটী করিয়া যাইতে হইতেছে। তোমরা চাহ না, তবু দিতেছি। দিয়া আবার দেখিতেছি, গাছগুলি বাঁচাইয়া রাখিবার দিকে তোমাদের আগ্রহ নাই। অথচ প্রত্যেকটা চারা তৈরী করিতে আমাকে শ্রম করিতে হইয়াছে, অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং ব্যয়ের সেই অর্থ আমি ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করি নাই। ফলে, বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র যখন আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, তখন আমি সেই ডাক উপেক্ষায় ফিরাইয়া দিতে পারি না, ঐ জেলাটা ছাড়িয়া বাহিরের জগতে তখন প্রবেশ করি, তখন তাও করি কাজ কিছু করিবার জন্য। জীবন আমার উৎসর্গীকৃত, কিন্তু তাহা ত' একটা জন-পদ বা একটা রাজ্য, একটা দেশ বা একটা জাতির জন্য নহে, তাহা বিশ্বের জন্য। যেখানে সেবার সুযোগ পাইব, সেখানেই ত' আমাকে কাজ করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং

সেবা গ্রহণে অনিচ্ছুক উদাসীন অঞ্চলে মনের মত কাজ না থাকিলে সেবাগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী বাহিরের কোনও অঞ্চলে আসিয়া কাজ করিয়া যাওয়া ত' আমার সঙ্গতই বটে। তোমরা কয়েকজনে দেখা করিবার জন্য পুপুন্‌কী আশ্রমে গিয়া আমাকে না পাইয়া যেমন ব্যথিত হইয়াছ, আমার দর্শন পাইয়া, বচন শুনিয়া, সংসর্গে আসিয়া তেমন আবার বর্দ্ধমানের ও রংপুরের সহস্র সহস্র নরনারী উল্লসিত হইয়াছেন, উপকৃত বোধ করিতেছেন। সেবার পরিমাণের দিক দিয়া আমার ত্রুটি কিছুই হইল না কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তোমরা কয়েকজন যে কষ্ট করিয়া আশ্রমে আসিয়াছিলে এবং আর্থিক অনটনে জর্জ্জরিত একটী আশ্রমে কদন্ন-সেবনের ক্লেশ পাইলে, এই দিক দিয়া আমার ত্রুটি হইল। নিক্তির ওজনে আমার কাজ চলিলে দেখিতে পাইতে যে, 'ফেল কড়ি, মাখ তেল' নিয়মে তোমরা নিরূপিত আতিথ্য পাইতে এবং তোমাদের দানহস্ত প্রসারিত করিবার জন্যও আশ্রমবাসীরা অনেক রকমের বাগ্‌বাহুল্য বিস্তার করিয়া তোমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিত। ছোট কাজ, বড় কাজ, সব কাজই আমি করিতে চাহি এবং ভাল করিয়াই করিতে চাহি কিন্তু কখন কোন্ দেশে কতটুকু দিতে পারিব, তাহা ত' সম্পূর্ণই নির্ভর করিবে তাঁহাদের উপরে, যাঁহারা দয়া করিয়া আমার সেবাটুকু আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিবেন। সেবায় সেবক মুখ্য নহেন, সেব্যই মুখ্য।"

সহকর্ম্মী

পুপুন্‌কী আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীর নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম যাইতেছে শুনিয়া তোমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছ। আমার শ্রমলাঘবের জন্য একটী সহকর্ম্মী পাঠাইবে বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু সব সহকর্ম্মী কি সকল সময়ে প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে পারে? সঙ্গে থাকিলেই কি কেহ সহকর্ম্মী হইতে পারে? সহমর্ম্মী কি হইবার প্রয়োজন নাই? সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য যেই সুশিক্ষিত সমাজ-কর্ম্মীটি কিছুকাল হয় পুপুন্‌কী আশ্রমের আতিথ্যে বাস করিতেছে, তাহাকে আমার সঙ্গে কাজ করিবার জন্য পাঠান কি তোমাদের পক্ষে অনাতিথ্যের ব্যাপার হইবে না? তাহার যে স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যে, সে পুপুন্‌কীর ভাল জলবায়ুতে আসিয়া অবস্থান করিতেছে, এই কথাটী তোমরা বিস্মৃত হইবে কেন? সমাজ তাহার কাছে মূল্যবান্ সেবা এতকাল পাইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক সেবা প্রত্যাশা করে। তাহাকে আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ক্ষেত্রে শ্রমের অংশ নিবার জন্য প্রেরণ করা কি তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতা-প্রকাশ হইবে না? লিখিয়াছ, সে নিজেই আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই তাহার মহত্ত্ব। এজন্য আনন্দ অনুভব

করি, কিন্তু অন্য কাহারও সহিত মিলিয়া কাজ করা তাহার অভ্যাসে নাই। একদল লোক থাকে, যাহারা সত্যই অকপট কর্ম্মী কিন্তু নিজে একা একা যাহা করিতে পারিবে, তাহার অধিক করিতে রুচিসম্পন্ন নহে। ইহারা অন্যকে সঙ্গে লইয়া চলিলে অনেক অধিক কাজ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু অন্যের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সম্মান ও একলক্ষ্যতা সঞ্জনন করিয়া লইতে হয়, কোনও অজ্ঞাত কারণ বশতঃ তাহা করিতে ইহারা সমর্থ নয়। ফলে, ইহারা কাজে নামিয়া নিজেদিগকে ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মতন অসহায় মনে করে বা অপর সহকর্ম্মীদিগকে অকর্ম্মণ্য, অমানুষ জ্ঞান করে। হাতীর সহায়তা পাইলে ত' খুবই ভাল, একটী পিঁপড়ার সহায়তাকেও আমি অত্যন্ত দামী মনে করি। তবে, আমার মধ্যেও একটু ত্রুটি আছে। যে সহায়তাটুকু শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হয়, তাহা নিতান্ত নগণ্য হইলেও তাহাকে আমি অমূল্য বলিয়া বহুমানন করি। অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত সহায়তা ওজনে বা পরিমাণে অত্যধিক হইলেও তাহা গ্রহণে আমি কাতর হই। এই পত্র যদি সময়মত পাইয়া যাও, তাহা হইলে কথিত শ্রীমান্‌কে এখন আর পাঠাইও না। এই পত্র পাইবার আগেই যদি সে রওনা হইয়া গিয়া থাকে, তবে আমি অবশ্যই চেষ্টা করিব, তাকে কাজে আনিতে। সে চরিত্রবান্। চরিত্রবান্ ব্যক্তি যদি সুবক্তা হয়, তবে তাহার দ্বারা প্রচার সার্থক ভাবে চলিতে পারে। ময়মনসিংহ, সন্দ্বীপ

ও বরিশাল হইতে বারংবার ভ্রমণের আমন্ত্রণ পাইতেছি। শ্রীমানের নিজ মুখে তাহার বক্তব্য শুনিবার আগে আমি ঐ সকল প্রগ্রাম নির্দ্ধারণ করিব না। পথে পথে অন্যান্য ছোট ছোট বহু স্থানে কাজ করিয়া করিয়া আমাকে সন্দ্বীপ ও বরিশাল পৌঁছিতে হইবে। শরীরের উপরে যে ধকল যাইবে, তাহা বিবেচনায় সভামঞ্চে দাঁড়াইবার জন্য একজন সহ-বক্তা পাওয়া মন্দ কথা নহে। মাত্র এই কথাটুকু ভাবিয়াই তোমাদিগকে জোর করিয়া নিষেধ করিতে পারিতেছি না। দরিদ্র লোকগুলি সহজে সহকর্ম্মী পায় না। আমি দরিদ্র। সহকর্ম্মীদের খাওয়াইব কি? তাহাদের বেশভূষা বিছানা মশারি কিনিয়া দিবার টাকা কোথায় পাইব? আমার স্বাবলম্বন সম্পর্কিত গোঁড়ামির দরুন, মানুষের গাঁট হইতে টাকা খুলিয়া নিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও চেষ্টাই আমি করিতে রুচিসম্পন্ন নহি। আমার হাতে দেদার পয়সা আসিবে কি করিয়া? যাহার পয়সা নাই, তাহার সহিত সহকর্ম্মীরা কি অবস্থান করিবে শুধু ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য আর অর্দ্ধোদর ক্ষুধিত জীবন-যাপনের জন্য? এরূপ সাধারণত দেখা যায় না। তথাপি যে দুই একজন কর্ম্মী আমৃত্যু নিষ্ঠায় আমার সঙ্গে লাগিয়া থাকিবে, এই বিশ্বাস আছে। নিষ্ঠাবান্ দুই দশটা সহকর্ম্মী থাকিলেই যে ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া দেওয়া যায়, একথা আমি বিশ্বাস করি। অন্য যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা আমাকে অর্থ-সম্বলহীন সহায়সম্পদহীন

নিতান্তই পথের ফকীর দেখিলেও আমাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া যাইতে পারিবে না। তাহারা মুষ্টিমেয় হইতে পারে কিন্তু তাহারা জগতের নমস্য হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। জোর করিয়া কোনও কর্ম্মীকে আমার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিও না। প্রেম জাগে স্বভাব হইতে, কিলাইয়া কাঁঠাল পাকান যায় না, ঝালাইয়া গোলাপকে সুরভি করা যায় না।"

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রবঞ্চনা-রাহিত্য

নোয়াখালী জেলান্তর্গত চন্দ্রগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সম্প্রদায় আর জাতি নিয়া, ধর্ম্ম আর দেশীয়তা নিয়া কাহারও সহিত আমার বিভেদ ঘটিবার কারণ নাই। কারণ, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক, স্বাদেশিক বা জাতীয়তা-ঘটিত বিশেষত্বগুলি নিষ্ঠার সহিত বজায় রাখিয়াও পৃথিবীর সকল মানুষ একটী মাত্র পরিবার-ভুক্ত ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় প্রীতি সহকারে বাস্তব্য করিতে পারে, যদি মাত্র বিশ্বাস করে, ঈশ্বর আছেন, আমরা প্রত্যেকে পরমেশ্বরেরই সন্তান, আর যদি প্রতিজ্ঞা করে, আমরা কেহ একে অন্যকে প্রবঞ্চনা করিব না। অকপট ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং পর-প্রতারণা হইতে দূরে থাকা, মাত্র এই দুইটী জিনিষ পাইলেই পৃথিবীর সব লোক যুগপৎ সুখী হইতে পারে। জগতের দুঃখ বিদূরণের বিষয়ে যত

মহাপুরুষ, মহামানব বা মহাভাবুক ব্যক্তিরা যত কিছু চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মূলভিত্তি এই দুইটী। বুদ্ধদেব ঈশ্বরকে আনিয়া হাটে-বাজারে হাজির করেন নাই বটে, ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি একেবারে নিঃশব্দ রহিয়াছেন সত্য কিন্তু যে সকল সৎস্বভাব প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসীর ভিতরে ঈশ্বর-সাধনের ফলে আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা, সেই সকল সাধনেরই তিনি উপদেশ দিয়াছেন। আধুনিক মনীষীদের মধ্যে কার্লমার্ক্স্ এবং তদনুসরণকারীরা যদিও ঈশ্বরকে আবর্জ্জনা-স্তূপে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন, তথাপি প্রবঞ্চনা-বিরহিত সমাজ-ব্যবস্থাই যে জগতে শান্তি আনয়ন করিবে, এই কথা তারস্বরে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অথচ মজা এই যে, আইনের দ্বারা মানুষের স্বভাব-পরিবর্ত্তন ঘটান যায় না, ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস আসিলে মানব-চরিত্র হইতে প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি আপনা-আপনি তিরোহিত হয়।"

নামের মহিমা

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত বাহুবল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রেমভক্তি সহকারে অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামের সেবা করিয়া যাইতে থাক। নামের মহিমায় তোমার ভিতরে পরোপকারবৃত্তি, দেশহিতৈষণা এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সমদৃষ্টি ও ভালবাসা আসিয়া যাইবে। পরমেশ্বর নিজে প্রেমময় বলিয়াই তাঁহার

নাম এমন প্রেমমধুময় যে, নাম করিতে করিতে প্রেম আপনিই উপজাত হয়। আমরা সাধন করি না বলিয়াই এমন সুস্পষ্ট সত্যকেও ধরিতে পারি না, কেবল অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরি।"

নামের মধু

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত রাজনগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একবার পাপ করিলে পুনরায় পাপ করিতে ইচ্ছা করে। কারণ, কোনও আপাত-তৃপ্তিকর সুখাস্বাদের দিকে তাকাইয়াই ত' পাপটি করিয়াছিলে। একবার নাম করিলে হয়ত দ্বিতীয়বার নাম করিবার জন্য তেমন আগ্রহ আসিবে না, তবু নাম দ্বিতীয়বার করিবে, তৃতীয় বার করিবে, শতবার করিবে, সহস্রবার করিবে। লক্ষবার, কোটি বার, সংখ্যাতীতবার করিতে করিতে হঠাৎ একদিন কোন্ এক শুভ অবসরে নামের প্রকৃত রসময় স্বাদ পাইয়া যাইবে। একবার স্বাদ পাইলে ত' আর নাম ছাড়িতে পারিবে না, আজীবন, আমরণ নাম করিয়া আনন্দ-রস আহরণ করিতে থাকিবে। নাম-সাধনের সদুপদেশ যে একবার পাইয়া গিয়াছে, সে আর প্রাণান্তেও নামসেবা হইতে নিজেকে বিযুক্ত রাখে না। একবার ভ্রমবশে পাপ করিয়া বসিলে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প করিবে যে, কোনও অবস্থাতেই দ্বিতীয়বার আর তাহার অনুশীলন করা

হইবে না। অনেকে দায়ে পড়িয়া পাপ করে, ভয়ে পড়িয়া পাপ করে, লোভে পড়িয়া পাপ করে এবং অধিকাংশ লোকে অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত পাপ করে। দায়, ভয়, লোভ ও অজ্ঞানতা নাম করিতে করিতে কাটিয়া যাইতে পারে। অনেকের জীবনেই তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আছে।"

বিশ্বাস ও ঐক্যের বল

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত পাঁচবেরিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিশ্বাস দূর করিবে সংশয় ও সন্দেহ, ঐক্যবল দূর করিবে আতঙ্ক। ঐক্যবল-প্রবুদ্ধ হইয়া বিশ্বাসীরা কাজে নামিলে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আশ্চর্য্যজনক ঘটনাটি ঘটান সম্ভব। স্বল্প সময়কে স্বল্প ভাবিও না, ক্ষীণশক্তিকে ক্ষীণজ্ঞান করিও না। বিশ্বাসের বলে আর ঐক্যের মহিমায় সকল বৃহৎ কর্ত্তব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

অপালিত উপদেশ

বগুড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপদেশ চাহে কিন্তু পালন করে না, এইরূপ লোকের সংখ্যাই ত' জগতে সর্ব্বাধিক। তবে উপদেশও চাহে না,

পালনও করে না, এমন লোকদের চেয়ে ইহারা নিশ্চয়ই ভাল। ভাল বলিতেছি এই জন্য যে, যদিও তুমি আমার একটী অতীব মূল্যবান্ উপদেশ পালন করিলে না কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় মানুষের কি করা উচিত, তদ্বিষয়ে আমার ধারণাটা ত' শুনিয়া রাখিলে। ইহাতে তোমার জ্ঞান বর্দ্ধিত হইল। জ্ঞানই শক্তি। কোনও বিষয়ে কাহারও জ্ঞান বাড়িলে একদিন না একদিন কাহারও না কাহারও প্রয়োজনে এই জ্ঞানটুকু কাজে লাগিবে। তখন ইহার প্রকৃত মহিমা উপলব্ধ হইবে। এই জন্যই, কেহ অকারণে উপদেশ চাহিলেও আমরা অকৃপণ কণ্ঠে প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলিয়া দেই। মানুষকে যে-কোনও প্রকারে সহায়তা করাই তার সেবা। স্থলবিশেষে উপদেশ-দানও সেবাপদবাচ্য হয়।"

সুপালিত উপদেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি ঐ পত্রেই আরও লিখিলেন,—

"কিন্তু সুপালিত উপদেশ পালনকারীর অন্তরে দুর্ব্বার এক মহাশক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা শুধু একটী উপদেশ-রূপেই তাহার অন্তরে বিরাজ করে না, আরও শত সহস্র উপদেশের সার্থক জনক-রূপে তাহা অবস্থান করে। এ কথা যে কত সত্য, তাহা নিজ জীবনে উপদেশ-পালনকে রূপায়িত করিবার পূর্ব্বে শুধু জল্পনা বা কল্পনার দ্বারা তুমি বুঝিতে পারিবে না। এই কারণেই উপদেশ-পালক শিষ্য গুরুর নিকটে

কত যে আদরণীয়, বলিবার নহে। 'গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক'—এই কথাটি এই ক্ষেত্রে একটী অকাট্য সত্য। সুপালিত একটী মাত্র উপদেশ সহস্র সহস্র উপদেশের জনয়িতা হইয়াই নিশ্চিন্ত রহে না, প্রতিটি স্বতঃসঞ্জাত নবজাত উপদেশের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী এক প্রাণশক্তিকে সঞ্চারিত করে। ফলে, একটী উপদেশকে নিজ জীবনে জাগ্রত ও জীবন্ত করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল আবশ্যকীয় উপদেশের খনিটিকে তুমি তোমার অন্তরে প্রোথিত কর।"

উপদেষ্টার দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"সুতরাং বুঝিতেই পার, তোমরা যখন সমাজ-মধ্যে উপদেষ্টার গৌরবোজ্জ্বল আসন গ্রহণ করিবে, তখন তোমাদের উপরে কত বড় বড় সব দায়িত্ব আসিয়া বর্ত্তাইবে। উপদেশ দিতে হইবে এমন ভাবে, যাহাতে উপদিষ্ট ব্যক্তি পালনে উৎসাহ বোধ করে, যাহাতে সে মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিতে পারে যে, ইহা পালন করা সাধ্যাতীত ব্যাপার নহে, যাহাতে তাহার অন্তরে বিশ্বাস জাগে যে, উপদেষ্টা মহোদয় নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই উপদেশ দিতেছেন না। যকৃৎ বিকারে চিকিৎসক চিরতার জলের মতন তিক্ত বস্তু ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তির যদি এই বিশ্বাস

থাকে যে, ইহার পরিণাম অতীব শুভ এক নিরাময়, তাহা হইলে উপদেশ-পালনে আপাততঃ তাহার সঙ্কোচ থাকিলেও সে সত্য সত্যই তাহা পালন করিতে চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে। সামাজিক, ধার্ম্মিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে একজনকে উপদেশ দিতে গিয়া যদি উপদেষ্টা এমন উপদেশ দেন, যাহা মানবিক সত্য ও মানসিক স্থৈর্য্যকে লঙ্ঘন করিয়া অপরের অনিষ্ট করিতে মানুষকে প্ররোচনা দেয়, তাহা হইলে এমন উপদেষ্টাকে ইতিহাসই শুধু ধিক্কার দিবে না, ধিকৃত করিবে তাহার একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাও। উপদেশ-দাতার পবিত্র আসনে যাঁহারা বসিয়াছেন বা বসিবেন, তাঁহাদের দায়িত্ব শুধু বর্ত্তমান কালের প্রতিই নহে, ভবিষ্যতের প্রতিও।"

হুজুগে ত্যাগী হইতে নাই

নোয়াখালী জেলান্তর্গত সন্দ্বীপ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এখনও সেই ত্যাগের উদ্দীপনাটী দেশের যুবকদের মন হইতে লুপ্ত হয় নাই, দেশসেবার্থ বা সমাজকল্যাণের জন্য যে সুতীব্র প্রেরণা প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ত্যাগীর জীবন গ্রহণ করিলে মানুষের মধ্যে মহাসমাদরে বাস করা যাইবে, প্রধানতঃ ইহাই ত্যাগীর জীবন অবলম্বনের অনুকূলে এক অসাধারণ প্রলোভন স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু আমি ত' তোমাকে সেই

শান্তিময় স্নিগ্ধ জীবনটী আমার আশ্রমে দিতে পারিব না, যাহা অন্যত্র প্রত্যাশা করিতে পার। আমার আশ্রমে দারিদ্র্য-বরণ কর্ম্মের প্রথম সর্ত্ত। প্রত্যহ কি আহারীয় দিতে পারিব? পেট ভরিয়া কি খাইতে দিতে পারিব? ত্যাগী ব্যক্তিদের প্রতি অশেষ সম্মানসূচক ব্যবহার যাহারা নিশ্চয়ই করিবে, এমন প্রতিবেশ প্রভাব কি তোমাকে দিতে পারিব? কাজ করিতে করিতে তুমি যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন কি তোমাকে সহায়তা করিবার জন্য এমন সহকর্ম্মী দিতে পারিব, যে তোমার শ্রম, তোমার দুঃখ নিজের স্কন্ধে টানিয়া লইবে এবং তোমাকে যোগ্য বিশ্রাম দিতে সমর্থ হইবে? আশ্রমে বাস করিতে করিতে যখন দেশের জন্য, ঘরের জন্য প্রাণ কাঁদিবে, তখন কি আমি তোমাকে উপযুক্ত উপঢৌকনাদি সহ গৃহ-প্রত্যাগমনের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিব? সবগুলি প্রশ্নেরই হয়ত উত্তর হইবে নিষেধাত্মক। কারণ, আর্থিক দিক দিয়া আমার আশ্রমের মত অনিশ্চিত-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জগতে হয়ত আর একটীও নাই। এই জন্য বলিতেছি যে, তোমার ত্যাগের স্পৃহাকে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, ইহার মধ্যে কতটা রহিয়াছে হুজুগ আর কতটা হইতেছে অকৃত্রিম, আর, আমার মতন ভাগ্যহীন দরিদ্রের ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্যকে জড়াইয়া দিয়া তুমি লাভবান্ হইবে, না ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহাও ভাবিতে হইবে। হুজুগে ত্যাগী হইতে নাই।"

জীবনের প্রতি স্তরে স্বাবলম্বন প্রয়োজন

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেশের যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের মনে যখন ত্যাগ-বুদ্ধির প্রবল বন্যা আসে, মানিতে হইবে যে, তখন দেশের সুবর্ণ-যুগ চলিতেছে। প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ জাতির ইহাই প্রধান লক্ষণ যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ত্যাগবুদ্ধির প্রাচুর্য্য জন্মে এবং ত্যাগের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অনেক সাধারণ মানুষও অসাধারণ হইয়া পড়ে এবং অসাধ্য-সাধন-সমূহ করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত করে এবং দেশ ও জাতিকে করে গৌরবান্বিত। কিন্তু দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুতর অধঃপতন ঘটিলে সকলের অজ্ঞাতসারে মানুষের মনের সকল ত্যাগবুদ্ধি জল-বুদ্বুদের ন্যায় অভাব-সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। এই জন্যই আমি বলিয়া থাকি যে, সংসার ত্যাগ করিয়া তোমরা দলে দলে আসিয়া মঠ, মন্দির, আশ্রমগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে যদি গৃহস্থদের পক্ষে ভিক্ষামুষ্টি দিবার প্রয়োজন বাড়িয়া যায়, তবে তাহা হওয়া অপেক্ষা তোমাদের প্রতি জনের নিজ নিজ অঞ্চলে বসিয়া নানা শিল্প ও সদ্ব্যবসায়ের অনুশীলনের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক আয়ের মান বাড়াইবার চেষ্টার দ্বারা সমাজের

অধিকতর হিত সাধিত হইতে পারে। অবশ্য, এই কথার মধ্যে সদ্‌যুক্তি থাকিলেও গতানুগতিক সংস্কারগত শ্রদ্ধা দেশে ত্যাগী সন্ন্যাসী বৃদ্ধির অনুকূলেই যাইবে। কিন্তু এদেশ স্বাধীন নহে। এমন কোনও ব্যাপক দুর্ঘটনা পরাধীন দেশে যে-কোনও সময়ে ঘটিতে পারে, যখন কৃত্রিম খাদ্যাভাব প্রতিটি ত্যাগবুদ্ধি মানুষকে মাতা ও ভগিনীর সম্মান রক্ষার জন্য, পিতা ও ভ্রাতার মুখে একমুষ্টি কদন্ন দিবার জন্য অনভিপ্রেত জীবিকা গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে। এরূপ দুর্ঘটনা কখনো ঘটিলে ভাবী কালের মঠ-মন্দিরগুলিতে অতি সাধারণ সেবা-কার্য্য করিবার জন্যও প্রয়োজনীয় কর্ম্মী হয়ত পাওয়া যাইবে না। অনভিলষিত পথে ধাবিত হইতে বাধ্য হইবার ফলে কৈশোর ও যৌবন হয়ত ত্যাগের রুচিই চিরকালের মত হারাইয়া ফেলিবে। সেই সুদূর এক বিপত্তির সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইতেছে কি ব্যক্তিগত, কি সঙ্ঘগত, সকল রকমের জীবনকেই স্বাবলম্বনের উচ্চাসনে বসাইয়া তারপরে প্রতিটি কাজ করা। ১৯০৫ ইংরাজি সালে ঘরে ঘরে তাঁত বসাইয়া বাঙ্গালী স্বাবলম্বী হইতে চাহিয়াছিল। উপলক্ষ্যটা ছিল বিদেশী-বর্জ্জন। কিন্তু বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালী তাহার প্রাথমিক কর্ত্তব্য গেল ভুলিয়া। স্বাবলম্বী আর সে হইতে পারিল না। ফল কি তাহার ভাল হইয়াছে?"

পুরোহিতের প্রাপ্য প্রশংসা

বরিশাল জেলান্তর্গত হুলারহাট-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পৌরোহিত্য-তন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিব বলিয়া আস্ফালন করিলাম এবং কিছু কিছু পুরোহিতের অন্ন মারা যাইবার ব্যবস্থাও করিলাম কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, আমি নিজেই একটী জবরদস্ত পৌরোহিত্য-তন্ত্রের জন্ম দিয়াছি,—এরূপ ঘটনা বিরল নহে। বিশুদ্ধ বেদান্ত-মতে দীক্ষাদান করিয়া গুরুদেব প্রথমতঃ উচ্চাঙ্গের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত সমূহের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে শিষ্যকুলের উপরে অসামান্য প্রভাব প্রসারিত করিবার পরে আস্তে আস্তে অমুক প্রয়োজনে কালীপূজা, তমুক প্রয়োজনে ছিন্ন-মস্তা পূজা, আর একটী প্রথক্ প্রয়োজনে শীতলা পূজা এবং প্রয়োজন বশতঃ বা নিষ্প্রয়োজনে অনঙ্গ-দেবের পূজা করাইলেন বা করিলেন। ফলে যেই বহুবিধ প্রতীকের বা পুত্তলের উপাসনার দায় হইতে দীক্ষাদাতা তাহার শিষ্যকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, পুনরায় আস্তে আস্তে লোক-সংস্কারের সেই গড্ডলিকা-প্রবাহের বিচিত্র পঙ্কলেই তাহাকে নিক্ষেপ করিলেন। এক ঢিলে দুই পাখী মরিল। অর্থাৎ বৈদান্তিক তত্ত্বেরও জয়-জয়কার অব্যাহত রহিল, গ্রাম্য জীবনের চির-প্রচলিত সংস্কারগুলিরও সম্মান রক্ষিত হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এইরূপ আপোষ-রফার মতন ক্ষতিকর আর কিছুই নাই। যেই মতটা ধরিয়া চলিয়াছ, সেই মতটাতেই

লাগিয়া থাক। নিত্য নূতন মত চাখিয়া বেড়ানোর ভিতরে কৌতূহলের নিবৃত্তি থাকিতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক কুশলের এক কণাও নাই। অবশ্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে পুরোহিতদের প্রতি অকৃতজ্ঞ নহি। গ্রাম্য গোঁসাইরা এবং কুলপুরোহিতকুল অধিকাংশ হিন্দুকে নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষের চিন্তাধারার সহিত যুক্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিগত হাজার বৎসরের ইতিহাস ইহাই। সকল শ্রেণীর সকল অধিকারের সকল সাধন-পন্থার প্রচারকদের কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়া হিন্দু আজ বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব হইতে চ্যুত হইলেও, অতি প্রাচীন বৈদিক চিন্তাধারা যে তাহারা এতদিনেও হারাইয়া ফেলে নাই, তাহার জন্য উল্লিখিত গোঁসাই আর পুরোহিতগণকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রৌপ্য তাম্রাদি মিশ্রিত হইলেও এবং নানা ভেজালের উৎপাতে বিবর্ণ হইলেও তাঁহারা প্রাচীন ভারতের সোণাটুকুকে আমাদের হাতে পৌঁছাইয়া দিবার কাজটুকু নিশ্চয়ই করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা না করিলে আজ আমাদের স্মরণ করিবার সুযোগই থাকিত না যে, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য আদি মহর্ষিদেরই আমরা বংশধর। আফগানিস্থানে এই সকল গোঁসাই বা পুরোহিতরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবনের মুখে একজনেও টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই বলিয়াই আজ আফগানিস্থানে পতঞ্জলির বা পাণিনির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার মত প্রাণী কেহ নাই। অথচ, ঐ আফগানিস্থানই এই দুই অসামান্য আচার্য্যের জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমি। এই দৃষ্টান্তটীর

আলোকে গুরুগোঁসাই এবং পুরোহিতদিগকে বিচার করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। অনেক-কিছু বিমিশ্র ধাতুর সহিত তাঁহারা বৈদিক যুগের ব্রহ্ম-চেতনাকে মিশ্রিত করিয়া লইলেও আমাদের হাতে দিয়াছেন বলিয়াই আজ আমরা আমাদের প্রাচীন সত্তার গৌরব করিয়া জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারিতেছি।"

স্বামী ও স্ত্রীর মিলন

খুলনা জেলান্তর্গত মঘিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিল বা স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়া গেল, ইহা নিত্যকার ঘটনা নহে, এরূপ ঘটনা অতি অল্পই ঘটে। যে-ই যাহাকে ছাড়িয়া যাউক, সে মনে মনে নিশ্চয়ই তাহার একটা কারণ স্থির করিয়া তবে এমন সর্ব্বনাশা কাণ্ডটি করে। তাহার কারণ নির্ণয়ে অনেক সময়ে তথ্যের থাকে ভুল, বিচারের থাকে বিভ্রান্তি, এমন ঘটনাও ঘটে। প্রত্যেক সমাজ-কল্যাণকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এইরূপ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন দম্পতীকে পুনরায় মিলিত করাইয়া দিয়া তাহাদের সাংসারিক জীবনকে নির্ব্বিবাদে চলিতে দিবার সহায়তা করা। স্বামী তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করুক বা স্ত্রী তাহার স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাউক, এমন একটা দুর্ঘটনা যাহাতে কোনও দম্পতীর জীবনে না ঘটিতে পারে, এই জন্য সজাগ থাকা কর্ত্তব্য সমগ্র সমাজের প্রত্যেকটা লোকের। কারণ, স্বামী ও

স্ত্রীর জীবনের মধ্যে শান্তি না থাকিলে সমগ্র সমাজই অশান্তিতে ভরিয়া যায়। নারীর মনোমধ্যে সতীত্বের এক সংসংস্কার সৃষ্টি করিয়া অতীতের চিন্তাশীলেরা নারীকে সংসারের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা একদেশদর্শী হওয়াতে তাহার পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় নাই। পুরুষকে একনুপ করিবার চেষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন আছে। একদা হয়ত বিধিবদ্ধ আইন পাশ করিয়া পুরুষের একপরায়ণতাকে বাধ্যকর করা হইবে কিন্তু কি নারী, কি পুরুষ, প্রত্যেকে যদি চরিত্রের সাধনা না করে এবং আদর্শবাদী জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা না করে, তাহা হইলে জড় সভ্যতার উপাসক-উপাসিকারা কাহাকে কোন্ দিকে টানিয়া নিয়া গিয়া শকুনির মত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কোথাও যখন কোনও পরিবারে স্বামীতে আর স্ত্রীতে কলহ ও মনকষাকষি দেখি, তখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। একে অন্যকে ক্ষমা করিয়া, একে অন্যকে সহিয়া নিয়া, একে অপরের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিয়া স্বামী ও স্ত্রী সংসারকে অনায়াসে মধুময় করিতে পারে। সার্কাসওয়ালারা সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও ভল্লুককে পোষ মানাইতে পারেন, স্বামী পারিবে না স্ত্রীকে আর স্ত্রী পারিবে না স্বামীকে পোষ মানাইতে? তবে, উভয়ের চাহি স্বার্থত্যাগের বুদ্ধি। স্বার্থ যেখানে উগ্র, প্রেম সেখান হইতে শত যোজন দূরে থাকে। প্রেম যেখানে সত্য, স্বার্থত্যাগ সেখানে স্বতঃসিদ্ধ।"

রংপুর
২৪শে শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩৪২
(৯ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

প্রবীণের মশাল নবীনেরা নাও

ভোর বেলাই একটী যুবক আসিয়া দেখা করিয়াছে। সে কলেজ-ছাত্রাবাসে থাকে। তার কতকগুলি প্রশ্ন আছে। একটা একটা করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সবগুলি প্রশ্নের জবাব দিলেন। তারপরে বলিলেন,—একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রো, যার দিকে অনেরা লক্ষ্য দেয় না। একদল মহানুভব পুরুষ দেশ, সমাজ এবং জগতের সেবা কত্তে কত্তে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, জীর্ণ এবং গতায়ু হ'য়ে কালের যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করেন। আর, আমরা শুধু কাঁদি, শোকসভা করি, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে মনের বেদনা প্রকাশ করি যে, এই লোকটীর মহাপ্রয়াণে দেশের ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। কিন্তু কেউ আমরা একবারও একথা চিন্তা করি না যে, তাঁদের স্থান যোগ্য ভাবে অধিকার ক'রে নেবার মত কর্ম্মিদল যুবকদের মধ্য থেকেই সৃষ্ট হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রবীণদের ভূমিকায় যদি নবীনেরা প্রবেশ না ক'রে কেবল দূর থেকে প্রশংসাবর্ষণ বা হা-হুতাশ ক'রেই ক্ষান্ত হয়, তবে তাদের হস্তধৃত প্রদীপ ত' আর জ্বলবে না। তাঁদের হাতের মশাল ঠিক সময় মত তোমাদেরই হাতে নিতে হবে এবং যতটা তাঁরা পথ এগিয়ে

ছিলেন, তারপরের যাত্রাপথটুকু তোমাদেরই আনুত্য নিষ্ঠায় অতিক্রম ক'রে যাবার চেষ্টা কত্তে হবে। তাঁদের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের কীর্ত্তি লুপ্ত হ'য়ে যাবে, এ কখনো হ'তে দিতে পার না। অনেক ত্যাগ, অনেক সাধনা, অনেক কৃচ্ছ্র এবং অনেক অকুতোভয় দুঃসাহসের অনুশীলন ক'রে তাঁরা লক্ষ জনের দর্শনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হ'য়েছিলেন, তোমাদেরও তাই কত্তে হবে। তোমাদের দেহপতনের পরে আবার নূতন নূতন কর্ম্মীরা কি ক'রে আচম্বিতে আত্মপ্রকাশ কত্তে পারেন, তার দিকে লক্ষ্য রেখে তোমাদের কাজ কত্তে হবে। তুবড়ী-বাজিও যদি অবিরাম একটার পর একটা ক'রে কেবল জ্বলতেই থাকে, তবে তাতেও নিশার আঁধার দূর হয়ে যায়। তুমি যদি একটী মোমবাতির মতন জ্বলতে জ্বলতে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাও, তবে তোমার শেষ নিঃশ্বাসটী ত্যাগের আগেই আর একটী ভাল মোমবাতির পলতেতে দেয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার রয়েছে প্রয়োজন। হঠাৎ একটা মানুষ জন্মাল, নিজ প্রতিভায় ধরিত্রী আলোকিত ক'রে দিয়ে আবার হঠাৎ মরে গেল অন্ধকারের রাজত্বকে আর একবার নূতন ক'রে স্থায়ী হ'তে দেবার জন্য,—এটা কোনো দেশ বা জাতির পক্ষে সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়। একটী প্রদীপ্ত শিখা নিভবার অনেক আগেই দিকে দিকে দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশটী শিখার জ্বলে ওঠবার আয়োজন চাই। ব্যক্তিগত যশকে কাম্য ক'রে যাঁরা প্রদীপের মত জ্বলেন, তাঁদের চেয়ে

তাঁদেরকে দিয়ে দেশের প্রয়োজন বেশী, যাঁরা আরও বহু প্রদীপের আলো ধরিয়ে দিয়ে যাবার আগে কিছুতেই মরতে চান না। অবশ্য, কাজটা শুধু এক পক্ষেরই নয়, দায়টা দুই পক্ষেরই। যিনি নূতন প্রদীপে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তাঁরও যেমন, যাঁর আঁধারে আলোটা নূতন ক'রে জ্বলে উঠবে, তারও তেমন। ষাট-সত্তর-আশি বছর আগ থেকে সুরু ক'রে বাঙ্গালীর পক্ষে যুগটা কি আশ্চর্য্য স্বর্ণযুগ চলছে! এই যুগে এমন অনেক অনেক পুরুষ ও নারী বাঙ্গালী জাতিটার মধ্যে জন্মেছেন, যাঁদের দেখলে এক সঙ্গে নক্ষত্র-খচিত আকাশের সবগুলি গ্রহকে জ্যোতির্ম্ময় বর-বপুতে দেখলুম ব'লে আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করা চলে। কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি হিন্দু, বাঙ্গালীর ভিতরে এমন অনেক মহতের আবির্ভাব এই সময়টার মধ্যে হয়েছে, যাদের যে-কোনও একজন পৃথিবীর যে-কোনও অন্য দেশে জন্মালে, তার জন্য সেই দেশে ধন্য ধন্য রব পড়ে যেত। এতগুলি দিক্‌পাল পুরুষের জন্ম এই জাতিটার ভিতরে হওয়া সত্ত্বেও, নিশ্চয়ই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কত্তে হবে যে, ধারাবাহিক ভাবে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সত্যকে আবহমান কাল পর্য্যন্ত চালু রাখার স্বপ্ন এখনো সম্ভবতঃ কেউ দেখেন নি। অথচ এটাই আমাদের দরকার। কেউ বড় হ'তে চাইলে আমরা বাধা দেই, বড় হ'য়ে গেলে আমরা প্রশংসা-গুঞ্জন কত্তে থাকি, মরলোক থেকে চলে গেলে আমরা তাকে বেমালুম ভুলে যাই। বল, বর্ত্তমানে এইটাই আমাদের বিশেষত্ব কিনা?

নবীনের আবির্ভাবে বাধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নবীনেরা যে দলে দলে প্রবীণ নমস্যদের চরণ-চিহ্ন দেখে এগিয়ে আসতে প্রণোদিত হয় না, তার অবশ্য কতকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ আপাততঃ হচ্ছে অতি দ্রুত চিন্তাধারার বা ইডিওলজির পরিবর্ত্তন। আমরা ভারতবাসীরা ব'সে থাক্‌লেও সমস্ত পৃথিবীটা আমাদের মতন ব'সে নেই। তাদের মনে নিত্য নূতন অভাব-স্বভাবের আলোড়ন চল্‌ছে, তাদের হাতে নিত্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কলকাঠি নড়ছে। কথায় বলে,—"শয়তানের বিশ্রাম নেই।" হাসির কথা হ'লেও কথাটা সত্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শুধু শুধু ব'সে থাকতে পারে না। পৃথিবীর নানা দেশে যে সকল যুগান্তকারী চিন্তার চর্চ্চা হচ্চে, তার ছোঁয়াচ থেকে বা প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং নেতৃত্বের প্রতি নীত সাধারণের মনোভঙ্গীর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক সমস্যায় ক্লিষ্ট পিতামাতারা পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাদান করার ব্যাপারে দিনের পর দিন কেবলই পিছন হঠ্‌ছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা আরও হবে সঙ্গীন। যে সকল সদাশয় ব্যক্তি মানুষের দুঃখকষ্টে অভিভূত হ'য়ে নিয়মিত নিজেদের ভোগ-সম্ভোগের তালিকা ছেটে কেটে ছোট ক'রে নিয়ে দুঃখীর-দুঃখ বিদূরণের দিকে দিতেন মনোযোগ, ক্রমশঃ তাঁদের রুচি এবং সামর্থ্যের পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। অদূর ভবিষ্যতে তা' আরও ভয়ঙ্কর এক বীভৎস রূপ

নিলে নিতে পারে। সকলের সকল অভিযোগের প্রতীকারের আশা গিয়ে এখন পুঞ্জীভূত হচ্ছে এক স্বপ্নময় সম্ভাবনায়, যার নাম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। কিন্তু ত্যাগকে নয়, সংযমকে নয়, সর্ব্বজীবে প্রেমকে নয়, সুবিধাবাদকে করা হচ্ছে সংগ্রামের হাতিয়ার। এই অবস্থায় একটা প্রবীণ নেতা মারা গেলে, দশটা নবীন কর্ম্মী এসে তাঁর শূন্য স্থান পূরণে আত্মাহুতি দেবেই দেবে, একথা ভাবতে একটু কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন। বিরাট বিশাল নেতাদের মধ্যে চুলচেরা তর্কের কলহকে অবলম্বন ক'রে দেশ-জোড়া যুবকদের পারস্পরিক লাঠালাঠির বেশ কতকগুলি দৃষ্টান্ত ত' আমি নিজের চোখেই নানা স্থানে দেখেছি। এ অবস্থায় কি ক'রে ভরসা পাব বল ত' যে, বড়রা সরে গেলে ছোটরা সত্যই তাঁদের কাজ চালিয়ে নেবে! তবু নেতাদের স্বৈরাচারে বাধা দেবার মত জনমত দেশে এখনো জাগ্রত, কিন্তু যখন একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় দেশকে অস্থিমাংসে চর্ব্বণ করতে থাক্‌বে আর সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব হবে বলগাহীন নিরঙ্কুশ, তখন কি অগ্নিকুণ্ডে প্রদাহ্যমান রোম নগরীকে দেখে সম্রাট নিরো আনন্দে তাঁর বেহালা বাজিয়ে স্বরচিত সঙ্গীত-সুধা বিতরণ কত্তে প্রলুব্ধ হবেন না? তাই, আমি অন্য উপদেশের মধ্যে না গিয়ে নির্ব্বিচারে সকলকে উপদেশ দেই,—ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, ব্রহ্মচর্য্য পালন করাও। আজকে এই কথাটাই আমি তোমাদের কলেজে বল্‌ব।

দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলি ব'লে আমার বিরুদ্ধবাদী অসংখ্য। একদল হচ্ছেন সাহিত্যিক, যাঁরা মনে করেন যে, সাহিত্য রচনা কত্তে হ'লে তার ভিতরে যৌন দুর্গন্ধের সমাবেশ কত্তেই হবে, নইলে আর্ট হবে না। একদল হচ্ছেন স্বদেশসেবক, যাঁরা মনে করেন যে, সর্ব্ব ব্যাপারে নারী পুরুষের অবাধ অধিকার স্বীকার ক'রে না নিলে দেশের সেবা চালানো যাবে না। এদের হাতে ভালো ভালো সব যুক্তি আছে, যা' ব্রহ্মাস্ত্র বা বরুণাস্ত্র বা বায়ব্যাস্ত্রের মতই শাণিত। এসব তর্কের প্রত্যুত্তর দিয়ে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। আমার কথা এই যে, দারিদ্র্য হাজার চরণে ছুটে আস্‌ছে, তার পা মাত্র দুটী নয়। আমি রায় বাহাদুর শরৎ বাবুর বাড়ীতে বেশ কতক দিন ধ'রে বাস কচ্ছি, এমন দিন আস্‌বে, যে দিন এঁর চেয়ে দশগুণ স্বচ্ছল অবস্থার লোকও একটী অতিথিকে এক বেলা খাওয়ান অসাধ্য জ্ঞান কর্ব্বেন। আজ ত' আমি এক জায়গায় গেলে তিন, চার, পাঁচ থেকে দশ, পনের, বিশটা ক'রে দিন থেকে বক্তৃতা দেই, এমন দিন আসছে যে দিন শুধু গৃহস্থের ক্লেশ হবে ভেবে একদিনের বেশী থাক্‌তে সাহস পাব না। ইংরেজ দেশ থেকে সব সোণা রূপা বিলেতে চালান দিচ্ছে ব'লেই যে আমাদের দারিদ্র্য বাড়্‌ছে, তা' নয়, আমাদের দেশের মানুষের জন্মহার এমন দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে যে, বিদেশ থেকে কোটি

কোটি টন খাবার নিয়ে এলেও এতগুলি ক্ষুধার্ত্ত উদরের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। সাহিত্যিকরা বা স্বদেশ-সেবকেরা কয় জনে সেই প্রত্যাসন্ন দুর্ভিক্ষগুলির কথা চিন্তা কচ্ছেন? দেশের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করেই আমি ঘরে ঘরে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী বিতরণ ক'রে বেড়াচ্ছি, সাহিত্যিক বা স্বদেশ-সেবকদের কাজে বাধা দেবার জন্য নয়। তাঁরা নিজ নিজ অভিলষিত কাজ ক'রে অভীপ্সিত যশ এবং আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করুন, তাতে আমার বাধা দেবার কি প্রয়োজন?

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানের নিজস্ব কয়েকটা বিধান আছে, যা অবলম্বন ক'রে তিনি ধরণীর ভার হরণ করেন, অর্থাৎ জনসংখ্যার হ্রাস সম্পাদন করেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ এসব হচ্ছে সেই বিধান। অন্নাভাবক্লিষ্ট হ'লে রোগপ্রতিষেধিকা শক্তি হ্রাস পায় এবং সুযোগমতো মহামারী আসে। অন্নাভাবের আশঙ্কা দেখে চতুর লোকেরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খাদ্যসামগ্রী গোপনে গুদামজাত করে, এর ফলে দুর্ভিক্ষ আসে। দুর্ব্বল দেশকে আক্রমণ ক'রে সেই দেশের অধিবাসীদিগকে নির্ব্বিচারে হত্যা কত্তে পারলে লুণ্ঠন ক'রে প্রচুর ধন, রত্ন, খাদ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়,—এই লুব্ধতা থেকে যুদ্ধ আসে। তিনটারই ফল জনসংখ্যা হ্রাস, তিনটারই

উৎপত্তি অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশের দায়িত্বের দিক্ ছাড়া অন্য কোনও দিক দিয়ে কোনও জাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূলে কোনও সদ্‌যুক্তি নাই। সংযত ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হ'লে জাতির জনসংখ্যা কমে এবং মনোভাবের পবিত্রতার দিক্ দিয়ে জননকারী পিতামাতার নৈতিক উৎকর্ষ খুবই স্বচ্ছ হয় ব'লে সন্তান-সন্ততি শুভ সংস্কার নিয়ে জন্মে। এতে মানুষ জাতির ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমরা যে, "ব্রহ্মচর্য্য" "ব্রহ্মচর্য্য" ব'লে চীৎকার কচ্ছি, তা' সকলের ভালর জন্যই কচ্ছি। দেশের জনসংখ্যা যদি কখনো এতই বেড়ে যায় যে, মানুষের ঠেলাঠেলিতে রাস্তা দিয়ে চলা হয় অসম্ভব, মানুষের গুঁতাগুঁতিতে কোথাও ঘর বেঁধে নিরাপদে বাস করা শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় অবাস্তব কল্পনা, তা'হলে সমাজ-তাত্ত্বিকদিগকে পাতি দিতে হবে, যাতে মানুষ মানুষের মাংস খেলে দোষ না হয়, অবাধে ভ্রূণহত্যা কর্ম্মে পাপ না হয়, বিদেশীকে দিয়ে স্বদেশ আক্রমণ করালে দেশদ্রোহিতা না হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যা এমন সব সমস্যার সৃষ্টি কর্ব্বে, যার বিষয়ে আজ আমরা বিন্দুমাত্র কল্পনাও ক'রে উঠতে পাচ্ছি না।

অদ্য অপরাহ্ণ তিনটায় কারমাইকেল কলেজের হলে শ্রীশ্রীবাবামণির রংপুরের ষোড়শ ভাষণটী হইল।

চরিত্রবান্ মানুষ চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রবান্ মানুষ দেশের গৌরব, দেশের সম্পদ, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘনীয় বস্তু। যে নিজে চরিত্রবান্, সে অজ্ঞাতসারে অপর দশ জনকে চরিত্রবান্ হ'তে সাহায্য করে, প্রেরণা যোগায়। যে চরিত্রবান্, তার স্বভাব ও আচরণের মূলদেশে রয়েছে সংযম। সংযম মানে চিন্তাগত সংযম, বাক্‌সংযম, ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারগত সংযম, অর্থব্যয়াদির ব্যাপারে সংযম, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সংযম ও মনের উদ্বেগ, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতিকে আয়ত্ত রাখার প্রয়াসে দৃঢ়তা। কোনো মানুষ চরিত্রবান হ'লে সে তার অজ্ঞাতসারে দেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধিরও সহায়ক হ'য়ে থাকে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি স্বভাবতই মিতব্যয়ী হয়। মিতব্যয়ের প্রকৃত মানে এই যে, আমি আমার প্রয়োজনের অধিক অর্থ আমার বিভিন্ন ব্যক্তিগত সুখসম্পাদনের জন্য ব্যয় না কর্‌লে যে অর্থটা আমার বেঁচে যাবে, সেই অর্থ অন্যকে প্রতিপালনের সুযোগ দেবে। একজন হয়ত ইন্দ্রিয়-ঘটিত ব্যাপারে খুবই সাবধান কিন্তু নিজের মহত্ত্ব বা বাহাদুরী প্রকাশের জন্য বিড়ালের বিবাহে হাজার হাজার টাকা খরচ করেন, প্রথম মদ্যপান শিক্ষার তারিখটীকে স্মরণীয় কর্ব্বার জন্য সাত পালা খেমটা নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করেন। এমন ব্যক্তিকে আমি চরিত্রবান্ বল্‌ব না। কারণ, যে ধন অনায়াসে অন্য শত শত জনকে অন্নদানের হেতুভূত হ'তে পাও, তা

অমিতব্যয়িতার দরুণ অপব্যয়িত হ'য়ে বৃথা হ'য়ে গেল। একজনের ধন যখন দশ জনের পক্ষে হিতকর কাজে আসে, তখনি বল্‌ব যে ধনের সদ্ব্যবহার হচ্ছে। যে দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, যে দেশে গত দেড়শ দুশ বৎসর ধরে মানুষের আর্থিক অবস্থা ব্যাপক ভাবে কেবল অবনতির দিকেই যাচ্ছে, সেই দেশের প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য হচ্ছে ধনের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য চেষ্টিত হওয়া। পরাধীন দেশে ত' বটেই, স্বাধীন দেশেরও প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য এই দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা। কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে নয়, সর্ব্বসাধারণের বৃহত্তম সুখলাভ-সম্ভাবনা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে যাঁরা নিজ নিজ আর্থিক সম্পদের অপব্যবহার রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন, আমার মতে তাঁরাও চরিত্রবান্ মানুষ। দেশে চরিত্রবান্ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটুক, এটাই আমাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। খাঁটি লোক দুটী থাক্‌লে মহৎ কাজের পক্ষে সেটাও একটা বড় কথা। লক্ষ লক্ষ বাজে লোক কোন্ কাজে আস্‌বে? যেখানেই যাও, খাঁটি মানুষের মত যেও এবং খাঁটি মানুষকেই খুঁজো। ভেজাল দিয়ে প্রতারণা চলে, দেবপূজা চলে না। আমরা চাই দেশ, জাতি ও জগতের জন্য আত্মোৎসর্গকারী যথার্থ মানুষ। আমাদের প্রয়োজন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের দুর্ল্লভ মানুষকে সুলভ-রূপে পেতে। খোঁজে বেরিয়েছি মানুষের, একদল অকর্ম্মণ্য অপদার্থের খোঁজে আমরা বেরুই নি।

ডাঃ ডি এন্, মল্লিক

সভার সভাপতি-রূপে কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি, এন্, মল্লিক মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীবাবামণিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—দিনের পর দিন আপনি এই যে বীণার তারে ঝঙ্কার তুলে যাচ্ছেন, তার অনুরণন অনেকগুলি প্রাণেই দীর্ঘকাল বাজতে থাকবে, এতে আমার এক কণাও সন্দেহ নেই। এত নীরস বিষয় এমন সরস ক'রে কেউ যে বলতে পারে, একথা আমি আগে কখনো ধারণা কত্তে পারি নি। কি মধুর অথচ গম্ভীর আপনার কণ্ঠস্বর, কি সুন্দর বাচন-ভঙ্গী, কি অমৃতময় পরিবেশন, কি অনবদ্য আবেদন আর কি সুনির্ব্বাচিত বিষয়-বস্তু। আপনার একটা বক্তৃতার মাঝে এত সব মূল্যবান্ রেফারেন্স থাকে, যার সঙ্গে পরিচয় কত্তে হ'লে অন্য কাউকে ছয় মাস কাল গ্রন্থকীট হ'য়ে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পড়ে পড়ে পুঁথি পড়তে হত। একটা মাত্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার মধ্যে আপনি বিশ্বের বিভিন্নমুখী সমস্ত জ্ঞানকে এমন ভাবে সমাহৃত করেছেন দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্ময়াভিভূত। ভারতের প্রত্যেক স্কুলে, প্রত্যেক কলেজে, প্রত্যেক মঠে, প্রত্যেক মন্দিরে, প্রত্যেক মাঠে, প্রত্যেক ময়দানে আপনার কণ্ঠস্বর নিনাদিত হওয়া প্রয়োজন। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানের পর থেকে আমরা এই সকল অমূল্য উপদেশ তরুণ এবং কিশোরদিগকে শোনাবার জন্য যোগ্য লোকের বড়ই অভাব অনুভব কচ্ছিলাম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

সেনের তিরোধানের পরে এমন প্রভাবসম্পন্ন মধুকণ্ঠ ভাষণ আর কখনো শুনি নাই। আপনার কণ্ঠস্বরে আমরা আজ আশ্বস্ত বোধ কচ্ছি এই ভেবে যে শিবনাথের চরিত্র-চর্চ্চা, বিপিনচন্দ্রের বাগ্‌বিভূতি, অরবিন্দের স্বদেশ-প্রেম, বিবেকানন্দের বিশ্বালিঙ্গনকারী আত্মপ্রতিষ্ঠ মহত্ত্ব, কেশবচন্দ্রের মাধুর্য্য ও আত্মস্থতা এবং রামকৃষ্ণের সর্ব্বসমন্বয়ী সাধন-সিদ্ধির যেন একাধারে সমাবেশ আপনার মধ্যে স্বচক্ষে দেখে স্বকর্ণে শুনে কৃতার্থ হলাম।

অদ্যকার দ্বিতীয় বক্তৃতাটী অপরাহ্নে সাড়ে ছয় ঘটিকায় এডোয়ার্ড হলের মাঠে না হইয়া বৃষ্টির আশঙ্কায় হইল হলের ভিতরে। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল, বৃষ্টি আর হইল না, বরঞ্চ প্রচণ্ড গরম শুরু হইল। এই অবস্থাতেই শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার রংপুরের সপ্তদশ ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

ধ্যানময় ভারত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রাবণ মাস, তবু বৃষ্টি নাই, বড়ই গরম। শ্রোতারা ও শ্রোত্রীরা বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতায় সকলেই ক্লিষ্ট। অত্যধিক ভিড় সেই ক্লেশকে বহু গুণে করেছে প্রবর্দ্ধিত। কিন্তু একটী ম্যাজিক আছে, সেই ম্যাজিকটী সফল হ'লে কারো গায়ে থাক্‌বে না উত্তাপ, কারো মনে থাক্‌বে না ক্লান্তিকর অবসাদ। সেই ম্যাজিক্‌টীর নাম ধ্যান।

হিমালয় এখান থেকে অনেক দূরে নয়, সেই হিমালয়ের কিরীটদেশে শুভ্র তুষার তার আদিম শৈত্যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব কচ্ছে। আসুন, একবার ধ্যান করি সেই শৈত্যের। হাড়-কাঁপানো সেই শীত, প্রাণ শীতল করা সেই শীত, দীর্ঘকালের ব্যথা-বেদনার স্মৃতি-বিলোপকারী সেই শীত। বেশীক্ষণ নয়, ক্ষণকাল, মাত্র মিনিট পাঁচেক যদি আমরা সেই শীতের ধ্যানটুকু মনে মনে বেশ জমাই, তাহ'লেই আমাদের হলের উষ্ণতাটা ক'মে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমি কর্ব্ব বক্তৃতা, আপনারা কর্ব্বেন শ্রবণ, এই দুটী চিত্ত-বিক্ষেপকারী ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কি যুগপৎ ধ্যান চলে? আমি বলি, চলে। অভ্যাস থাকলেই চলে, অনুরাগ থাকলেই চলে। প্রকৃতই যাঁরা ধ্যানযোগী, তাঁরা অন্য কাজে দেহকে রত রেখেও মনকে ধ্যানে লাগিয়ে রাখ্‌তে পারেন। বেশ ত'! আমরা তাই একবার চেষ্টা ক'রে দেখি না! যেখানে একজনের চেষ্টায় একটা কাজ হয় না, সেখানে বহু জনের চেষ্টায় সে কাজে সংসিদ্ধি লাভ কত্তে দেখা যায়। এমনও হ'তে পারে যে, আমাদের এতগুলি লোকের মধ্যে মাত্র একটী দুটী লোকের হিমালয়ের তুষার-রাশির ধ্যান অন্য দশ জনের মনের মধ্যে এক বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কর্ব্বে এবং তার ফলে অন্য দশ জনের মনও ধ্যানে জমে যাবে। অতীত ভারতের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাই, পুরোহিত-বর্গের যজ্ঞীয় ব্যস্ততা, রাজরাজেশ্বরদের অশ্বমেধ আর রাজসূয়

যজ্ঞের হৈ-হল্লা বা তাণ্ডব, বৈশ্যদের অর্থার্জ্জনের জন্য নানা বস্তু উৎপাদনে ব্যস্ততা বা দেশে বিদেশে পণ্য-বিক্রয়-কেন্দ্র অনুসন্ধানের জন্য ছুটাছুটি, শূদ্রদের দলে দলে বর্ণশ্রেষ্ঠদের ঘরে দাসত্বের দায়-মোচনের জন্য অপরিসীম ও অন্তহীন শ্রম, যার কোনো চিত্রই মনকে একটা স্নিগ্ধ, শান্ত, সুস্থির অবস্থার মধ্যে পৌঁছে দেয় না। কিন্তু এইটুকুই ভারতবর্ষের সবটুকু অতীত ইতিহাস নয়। এ ছাড়াও ভারতের আর একটা ইতিহাস আছে, যে ইতিহাস হয়ত কাব্যে, শাস্ত্রে, ইতিবৃত্তে, কিম্বদন্তীতে বা গল্প-গাথায় তেমন ভাবে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু যেই ইতিহাসটীকে সত্য ক'রে তোলার জন্য রাজার ছেলে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে বনস্পতির ছায়াতলে বসে যান ধ্যানস্থ হ'য়ে, যে ইতিহাসটীকে সত্য ক'রে তোলার জন্য পরাক্রান্ত মহীপতির জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সহসা বৈরাগ্যের প্রবল বন্যায় অভিভূত হ'য়ে বলে বসেন,—"আমি রাজ্যসুখ চাই না, আমার লক্ষ্য পরম শান্তি, পরম তৃপ্তি আর পরম নিশ্চিন্ততা", যার ফলে বশিষ্ঠের মত জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠকে এসে বানচাল-হওয়া তরণীর হাল ধ'রে বলতে হয়,—"না বৎস, এই সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই তোমাকে ব্রহ্মলাভ কত্তে হবে, কর্ত্তব্য পরিহার করা চল্‌বে না।" সেই যে এক ধ্যানলোকের ভারতবর্ষ, তার বিবরণ পুঁথির পাতায় নাই, শিলালেখ-সমূহে হয়ত পাওয়া যাবে না, কিন্তু রয়ে গেছে ভারতবাসীর শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায়। যাগ নয়,

যজ্ঞ নয়, যুদ্ধ নয়, বিগ্রহ নয়, হত্যা নয়, বিদ্বেষ নয়, পরম শুভদের পরমসুন্দর প্রশান্তিস্নিগ্ধ চরণাশ্রয়ের একটী অব্যক্ত এবং অনির্ব্বচনীয় আকৃতি এই দেশটার আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, পাথরে, বনে, প্রান্তরে, বৃক্ষে জীব-জন্তুতে গণনাতীত কাল থেকে অনুস্যূত হয়ে আছে। সুতরাং আমাদের হিমালয়ের তুষার-স্তূপের ধ্যান বিফল হবে না, হ'তে পারে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণকাল মধ্যেই সমগ্র স্থানটীতে যেন শীতল ও সুস্নিগ্ধ বাতাস বহিতে লাগিল এবং শ্রোতারা বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া গেলেন। বক্তৃতা দেড় ঘণ্টা চলিল। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র লাহিড়ী নামীয় এক ভদ্রলোক বক্তৃতার প্রথমাংশের নোট রাখিয়াছিলেন কিন্তু শুনিতে শুনিতে তিনি এমনই তন্ময় হইয়া গেলেন যে, পরের অংশ আর নোট করা হইল না।

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি স্থিতিস্থানে আসিলেন।

প্রশ্ন ও প্রণাম করার সময়-গময়

ক্ষণকাল পরেই কয়েকজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শ্রীশ্রীবাবামণির স্থিতিস্থানে আসিলেন। বলিলেন,—কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাল সকাল সাড়ে সাতটায় আস্‌বেন। দেড় ঘণ্টা ভাষণ দেওয়ার পরে আবার কথাবার্ত্তা হিতকর নয়।

একজন অপর জনকে বলিলেন,—ভায়া হে, যা' শুনেছ, সারা রাত্রিতে তা' আগে হজম কর। তবে ত' কাল প্রশ্ন কর্ব্বে ? প্রশ্ন কত্তে চাইলেই করা যায় না, প্রশ্ন করার জন্য যোগ্যতাও অর্জ্জন করা চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগ্যতার কথা দূরে রাখুন। কারো কোনো বিষয়ে সংশয় জাগলে প্রশ্ন করার অধিকার আছে। তবে একাজে স্থান, কাল, পাত্র তিনটীই বিচার কত্তে হয়। জানবার যার ইচ্ছা, প্রশ্ন তিনি করবেন বৈ কি ? কিন্তু জেনেও জ্ঞানটাকে কোনো কাজে লাগালুম না, এমতাবস্থায় প্রশ্ন করার শ্রমটা বৃথা গেল। আবার সব সময়ই প্রশ্ন করা চলে না। আপনি টিকিট কেটেছেন ট্রেণে উঠ্‌বেন ব'লে, ট্রেণে ওঠার আগেই একজন ব'লে বস্‌ল, হো মশায়, প্রশ্ন করব। এটা ঠিক কাজ হ'ল না। প্রণাম করার মত ভাল কাজেই যদি সময়-গময়ের নিয়ম থাকে, তাহ'লে প্রশ্ন করার মত কাজেও নিশ্চয়ই তা' থাক্‌বে। আপনি মলমূত্র ত্যাগ কত্তে যাচ্ছেন বা ঐ কাজটী ক'রে এসেছেন, এখনো বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন বা প্রয়োজনীয় স্নানাদি করেন নি, এমন অবস্থায় একজন আপনাকে প্রণাম কত্তে এলে কি বল্‌বেন, হাঁ বাবা, বেশ করেছ, আরো এরকম করো ? নিশ্চয়ই তা' বল্‌বেন না।

(অষ্টাদশ খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ড-সংহিতা অষ্টাদশ খণ্ডের

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভব	১৮৬
অতীতের ভুল নিয়া মাথা ঘামাইও না	৭৯
অধ্যাত্মকর্ম্মে ভক্তি আর রাজনীতিতে ঐক্য	১৩১
অনন্ত জীবন ও অনন্ত সংগ্রাম	৭৫
অনিন্দক হও	২৮৪
অন্তরের তৌলযন্ত্র	২৯৯
অন্নের ফল পুষ্টি	১২২
অপালিত উপদেশ	৩৪১
অবতার হইতে চাহি না	৩০৫
অবতারের পর অবতার	২৫৭
অব্রহ্মচর্য্যে দেশ ও জাতির ক্ষতি	২৪১
অভিক্ষা	২৫০
অভিক্ষা ও অহঙ্কার	৭৪
অল্পই কর কিন্তু নিয়মিত কর	২৭৩
আচার্য্য শঙ্করের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা	২০৬
আত্মপ্রচার ও আত্মাহঙ্কার	৩০৩
আপদুদ্ধারের জন্য মানৎ করা	১১৬
আমার দৃষ্টিতে বিবাহ	১৫৭
আমার সাধের স্বপ্ন	৯৯
আমি সাধারণ মানুষ	১৮৩/২৫৪
আর্ত্তভক্ত ও পুরুষকার	৩১৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আসন-মুদ্রা প্রদর্শন ও সার্কাস	২৭৩
আসন-মুদ্রার উদ্দেশ্য	২৭২
আসল কাজ ও নকল কাজ	২৯৩
ইন্দ্রিয়-সুখভোগীর ব্রহ্মচর্য্য-সাধন	২০২
ইন্দ্রিয়-সুখের উর্দ্ধে থাকার অভীপ্সা ও স্বাভাবিক ব্যাপার	১৪২
ঈশ্বর-বিশ্বাস	১৭০
ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রবঞ্চনা-রাহিত্য	৩৩৮
ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণের মাহাত্ম্য	২০৪
ঈশ্বরের নামে ভণ্ডামী ও নাস্তিক্য	১৭১
উপদেষ্টার দায়িত্ব	৩৪৩
উপবীত প্রাচীনের অবদান	৪৫
এক দেহে তিন	২৫৩
একনিষ্ঠা স্বামীর জীবনে গৌরব	১৫৬
একেশ্বরবাদের শক্তি	১০২
এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল	২২৭
এত বক্তৃতা কেন	৩২৯
ওঙ্কার-উপাসনার নামে মানৎ	১১৭
কথার কবিতা নয়, কাজের কবিতা	৫৬
কন্যাদায়	১৫৮
কন্যাদায় উদ্ধারের মৌলিক উপায়	১৫৯
কর্ম্ম ও ঈশ্বর-সাধনা	১৭২
কাজই বড়	৩০৯
কাজ করি ভবিষ্যতের জন্য	১৮
কাজ ছোট স্কেলেই ধর	১৭৯
কামকে নিয়া ছেলেখেলা অনুচিত	১৮৯
কাম শুধু রিপুই নয়, সে শক্তিও	৪০
কীর্ত্তন কি ভাবে করণীয়	২৬২
কীর্ত্তন শ্রবণ ও আয়ু	২৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কৃতজ্ঞতা সর্ব্বধর্ম্মের মূল	৮৯
কৃষক, ছাত্র ও শিক্ষক	১৯১
কৈশোরেই জীবনকে গড়িয়া লও	৩২৬
কোন্ গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান করিব	৩৩
খেয়ালগায়ক ও লীলাকীর্ত্তনকারী সাধক	২৬৭
গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে	২১৬
গুরু, শিষ্য ও পরমেশ্বর	৩৬
গুরুর সাধন-সিদ্ধ মন্ত্রই শিষ্যকে প্রদেয়	৩৫
গোবরানন্দ গোস্বামী	৯২
চমৎকার	৩০১
চরিত্রবান্ মানুষ চাই	৩৬০
চলা বন্ধ করিও না	৮১
চোরের প্রতি কর্ত্তব্য	১৬৩
ছাত্র	৯৮
ছোট ছোট সংকর্ম্মীদের খোঁজ নাও	৬৩
জগন্মঙ্গলে চিন্তাচেষ্টার সার্থকতা	৩১৮
জপ ও ধ্যান	১৭৫
জপ, ধ্যান ও কীর্ত্তন	২৬০
জাগ্রত হও ও জাগাইয়া তোল	২৮২
জাতীয় জাগরণের লক্ষণ	৬৭
জাতীয় নবজাগরণ	১৪৪
জীব ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়া মতভেদ	১০৭
জীবন-কথা বলা সত্যই দুরূহ	১৩৭
জীবন দিয়া ছবি আঁকা	২২৪
জীবনের প্রতি স্তরে স্বাবলম্বন প্রয়োজন	৩৪৬
ঝড়ঝঞ্ঝা হইতে বাঁচিবার উপায়	১১৪
ডাঃ ডি, এন, মল্লিক	৩৬২
তপস্যা ও আধুনিক বিজ্ঞান	৬৯
তিব্বতী যোগ	১৮
তীর্থ	২৯২
ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য্য	১
দাম্পত্য জীবনে সংযম অসম্ভব নয়	৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দাম্পত্য সংযমে নারীর প্রস্তুতি	১২৪
দাম্পত্য সংযমে পুরুষের দৃঢ়তা	১২৪
দুঃখকে নির্ভয়ে বরণ কর	১৭১
দুগ্ধ দ্বারা চরণ-ধৌতি	৫৭
দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ও ব্রহ্মচর্য্য	৩৫৮
দেব-মানব হিসাবে প্রজাতি	৩২০
দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্য্য	৩৫৭
দেশোন্নতির মূল ত' পিতামাতার হাতে	১৬৬
ধর্ম্ম কিসে হয়	৯০
ধর্ম্মমত প্রচারে ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে পার্থক্য	২৬৩
ধর্ম্ম সনাতন ও শাশ্বত	২৩৯
ধর্ম্মের ঐহিকতা ও পারত্রিকতা	২৯৮
ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ সুফল ও সমবেত উপাসনা	২৩৪
ধর্ম্মের ব্যবসায়	২৭
ধর্ম্মের সমন্বয়ী মূর্ত্তি	২৫৫
ধার্ম্মিককে চিনিবার উপায়	২৩
ধ্যানময় ভারত	৩৬৩
নবীনের আবির্ভাবে বাধা	৩৫৫
নামের মধু	৩৪০
নামের মহিমা	৩৩৯
নারীর মহিমা	৩২৭
নিজেকে দীন ভাবিও না	১৬৯
নিজের কাছে ছোট হইও না	২৬
নিবিড় ঐক্য, মহৎ লক্ষ্য ও চরিত্র	৫৪
নিশ্চয়ই উদ্ধার আছে	১৬
নূতন বিপদ ডাকিয়া আনিও না	৪০
নেতার জীবনের দৃষ্টান্ত	৬০
নেতৃত্ব ও অহঙ্কার	৫৮
নেতৃত্ব ও নৈতিক চরিত্র	৫৯
নেতৃত্বের মূল	১১৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নৈমিষারণ্যের তপস্যা	৬৮
পঞ্চানন তর্করত্ন	৮৪
পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর	৮২
পবিত্র হও	২৫৮
পরের দুঃখ ও নিজের দুঃখ	২৯১
পরোপকার ও তাহার উপায়	৬২
পরোপকারের উপায় সৎ হওয়া চাই	৯৬
পরোপকারের দুইটী সর্ত্ত	৯৭
পিতৃমাতৃসেবায় উদাসীন থাকা পাপ	৪৯
পুণ্যবতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠা	১৬২
পুনঃ পুনঃ দীক্ষাগ্রহণ	৩৪
পুপুন্‌কী আশ্রমে আত্মপরিচয় লাভ	২৪৬
পুরোহিতের প্রাপ্য প্রশংসা	৩৪৮
পুলিশের প্রয়োজনীয়তা	১৬৫
প্রকৃত ধর্ম্ম ম্যাজিক-নিরপেক্ষ	২৩
প্রকৃত ধর্ম্মান্দোলন	২৪
প্রকৃত প্রীতির প্রয়োজন	১২৫
প্রকৃত মানুষ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে	৩০
প্রতিভার দুইটী রূপ	২৭৪
প্রতিশ্রুতির অসারতা	৩০১
প্রবীণের মশাল নবীনেরা নাও	৩৫২
প্রথম বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্য	২০৩
প্রমথনাথ তর্কভূষণ	৮৮
প্রয়োজন হইলে কাটিয়া পড়	৩৮
প্রলোভন হইতে দূরে থাক	২৫২
প্রশ্ন ও প্রণাম করার সময়-গময়	৩৬৬
প্রাচীন ভারতের সংসারী	৩১৯
প্রার্থনা ও নামজপ	১৭৪
প্রেম ও ত্যাগ	৩০৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ফুটবল এসোশিয়েশনের সেক্রেটারী	২২৮
বক্তৃতা বনাম সিনেমা	২৩০
বন্ধু চিনিবার উপায়	৬৪
বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিভাব ভাল	৭৮
বহুদেববাদের কারণ	১২৬
বহু বিবাহ	১৫১
বহুমন্ত্র পরিত্যাগ কর্ত্তব্য	৩৩
বাগ্মিতার উৎস ও সার্থকতা	২৩১
বাদ ও স্বাদ	১০৪
বারংবার ভুল করিবে কেন	২৯৪
বিজয়েচ্ছু যৌবন	২৭৬
বিজ্ঞাপন কেন	৭০
বিদ্বেষের ফলাফল	২৮
বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষণ-শৈলী	১০০
বিনামূল্যে বিতরণের ফলাফল	১০
বিবাহ	২১২
বিবাহিত জীবনে সুখী হইবার উপায়	১৫৪
বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য	১৪১
বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের কল্যাণ	১২৩
বিবাহিতের যৌন আচরণ	১৮৮
বিবাহে পাত্রপাত্রীর বয়সের পার্থক্য	৭৬
বিবাহিতের দায়িত্ব ও গুরুত্ব	৮০
বিবাহের পার্থিব উদ্দেশ্য	৮
বিবাহের বাস্তব ব্যাখ্যা	৩১১
বিস্ময়কর আবিষ্কার	১৮১
বিশ্বাস ও ঐক্যের বল	৩৪১
বৃক্ষরোপণ ও আরণ্যক	১১
ব্যভিচার, ধর্ষণ ও পুরুষ শিকার	২১৪
ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের আবশ্যকতা	২৪৩
ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র	২০১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্রহ্মচর্য্যই মনুষ্যত্বলাভের পন্থা	৩২
ব্রহ্মচর্য্যই সত্যধর্ম্মের মূল	২৪০
ব্রহ্মচর্য্য এক অত্যাবশ্যক বস্তু	২৬৫
ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবৎ-সাধন	২৬৫
ব্রহ্মচর্য্য কেন প্রয়োজন	২৬৯
ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহজ উপায়	২০১
ব্রহ্মচর্য্য সাধনের উপায়	২৭০
ব্রহ্মচর্য্যে দেশ ও জাতির লাভ	২৪১
ব্রহ্মচারী দর্শনেও লাভ	৩৩
ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর পরিচয়	৬৫
ভগবানকে ডাকিবার প্রত্যক্ষ লাভ	৩১৬
ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ব্রহ্মচর্য্য	১৯০
ভারতবাসীর রাষ্ট্রভাবনা	২৮৭
ভারতীয় জীবনের উপরে রামায়ণের মাহাত্ম্য	৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভারতীয় স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রীতি	৩২৫
ভারতের ব্রহ্মচর্য্য কল্পনার স্বপ্নাবেশ নয়	২২৬
ভারতের স্বদেশ-প্রেম	৩২২
মনকে বিশ্রাম দাও	২৩২
মনে, বনে ও কোণে	২৩৩
মনুষ্যজাতিরও স্বেচ্ছাকৃত ক্রমোন্নতি প্রয়োজন	১০২
মন্দিরকে মন্দিরই রাখ	২৮১
মানবমৈত্রী, স্বদেশ-প্রেম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস	১৪১
মানবসভ্যতার সার্থকতা	১১৫
মানুষপূজা, আড়ম্বর ও চিত্তশুদ্ধি	১৮৪
মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা	১০১
মানুষের মত মানুষ	৫০
মানুষের জন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মচিন্তা	২৩৯
মানুষের সভ্য হওয়ার ইতিহাস	৯৮

অষ্টাদশ খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মিলিয়া কাজ কর,কাজ করিয়া মিলিত হও	৫২
মৃত্যু ও শোক	২৮৬
মেয়েরা মহাশক্তি	১৬০
মোট কথা	১৬৩
মৌনকালে করণীয়	১১৩
ম্যাজিক ও ধর্ম্ম	২০
ম্যাজিকটাই ধর্ম্ম নয়	২১
যাহাদের অতীত নাই ও যাহাদের আছে	১৯৮
যুবকসমাজ ও ভ্রান্ত নেতৃত্ব	১৩৪
যে মেয়েরা বিবাহ করে না	১৬১
যোগশক্তি ও ম্যাজিক	১৯
যৌন জীবনের স্বচ্ছতা ও দেব-মানবের আবির্ভাব	২২০
যৌবনের সার্থকতা	২৭৮
রয়েলবেঙ্গল সার্কাস	২৪৪
রাম ও সীতার একপরায়ণতা	৪
রাম বল, বাঁচা গেল	৩৮
রায় বাহাদুর রাধারমণ	৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রায় বাহাদুর শরৎ বাবুর সেবাযত্ন	১১৮
রুগ্ন মনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ	৪১
রোগারোগ্যকল্পে ভগবানের নাম	১২১
লঘু ও গুরু	২৯৬
লীলাকীর্ত্তন ও নামকীর্ত্তন	২৬৭
লৌকিক ও অলৌকিক	২৭৫
শক্তির উৎস	২৭৯
শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্য	৫৫
শরীর ক্লান্ত	১২৯
শিবপার্ব্বতী সম্পর্কে গণ-মানস	৩
শিষ্য, গুরু ও পরমেশ্বর	৩৬
শুনাও এবং করাও	২৮০
শোভনা	১৮৬
শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব আহরণের উপায়	৭৬
সকল পথই শ্রদ্ধেয়	৩২৯
সৎকর্ম্ম	১৭৬
সৎকর্ম্মে অসৎ পন্থা	১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সংকর্ম্মের শুভফল আছেই	১৯৪	সুধন্য দেশ	২৯৭
সৎসঙ্গ ও সৎসমাজ	১৭৮	সুপালিত উপদেশ	৩৪৩
সদ্ধর্ম্মের অন্তও ভাল	২৩৬	সেবায় সেব্যই মুখ্য	৩৩২
সনাতনী পণ্ডিতগণের অন্ধতা ও নিষ্ক্রিয়তা	৮৬	স্বদেশপ্রীতি উন্নতির সহায়ক	৩২৩
সমাজের পরম সর্ব্বনাশকর শত্রু	১২	স্বদেশ প্রীতির মহিমা	৩২৫
সহকর্ম্মী	৩৩৫	স্বদেশানুরাগের জন্মকথা	৩২১
সংযম সম্পর্কে জনমত-সৃষ্টি	৮	স্বদেশের ইতিহাস প্রত্যেকেরই অবশ্যপাঠ্য	১৪৫
সংসারে শান্তির পথ	৩১২	স্বরূপানন্দ-চরিত্রে প্রকৃতির বৈপরীত্য	১৮০
সাধারণ ধর্ম্মীয় সংস্কার ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম	১১১	স্বাবলম্বন	৩৩০
সাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব	১৮৪	স্বামী ও স্ত্রীর মিলন	৩৫০
সামাজিক সম্প্রীতি ও মুমূর্ষু বিবেক	২১১	হঠাৎ দীক্ষা নেওয়া পাগলামী মাত্র	৩৬
সাম্প্রদায়িকতা ও শত্রুতা	৪৮	হঠাৎ নেতৃত্ব	৩১৪
		হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও স্বাদেশিকতা	১৪৬
		হিরন্ময়ী দেবী	১৯২
		হুজুগে ত্যাগী হইতে নাই	৩৪৪

অখণ্ড সংগীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।
ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক।।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগেই অমৃত, নহেক ভোগ।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩২৮' নং গান।

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পুর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

• মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

• মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥
ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিয়া অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥
কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব।
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥
নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥
আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥
সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী॥

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥
জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই।
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান ॥

---

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।


অখণ্ড
সংহিতা
বা
অষ্টাদশ
খণ্ড
উপদেশ
খণ্ড - সংহিতা
অষ্টাদশ খণ্ড
অখণ্ড
সংহিতা
বা
অষ্টাদশ
খণ্ড
স্বরূপানন্দ
দেবের
বাণী